বিপ্লবী যুগে যুগে

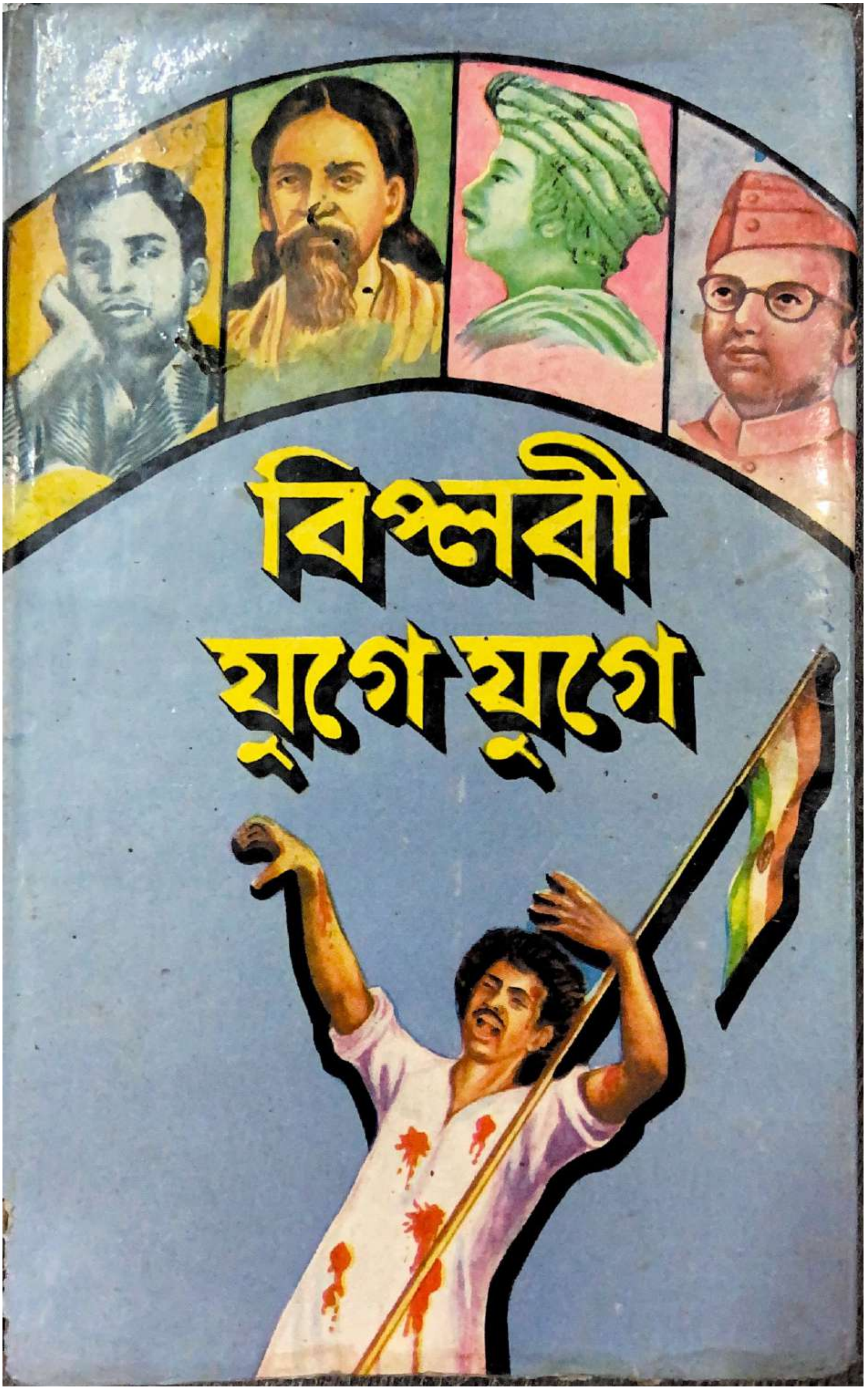

বিপ্লবী যুগে যুগে

শ্রীমতী অমিতা দেবী

কল্পনা সাহিত্য মন্দির
১৮, রজনী গুপ্ত রো
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
হরেন্দ্রনাথ রায়
১৮, রজনী গুপ্ত রো,
কলিকাতা-৯

শুভ রথ যাত্রা, ১৩৯৫

মূল্য—আঠারো টাকা মাত্র

জগদ্ধাত্রী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জ্যোতির্ময়ী পান
৩৭/১/২, কানেল ওয়েষ্ট রোড
কলিকাতা-৪

প্রকাশক :
হরেন্দ্রনাথ রায়
১৮, রজনী গুপ্ত রো,
কলিকাতা-৯

শুভ রথ যাত্রা, ১৩৯৫

[redacted]

মূল্য—আঠারো টাকা মাত্র

জগদ্ধাত্রী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জ্যোতির্ময়ী পান
৩৭/১/২, কানেল ওয়েষ্ট রোড
কলিকাতা-৪

এতে যা আছে

১। অরবিন্দ
২। নেতাজী
৩। সুকান্ত

* * *

৪। রাজা রামমোহন

বিপ্লবী যুগে যুগে

ডাঃ কমলশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে

তখন ভোর হয় হয়। প্রায় পাঁচটা।

পুলিশ ঘিরে ফেলেছে একটা বাড়ীর চতুর্দিক। ওরা গ্রেপ্তারের পরোয়ানা নিয়ে হাজির হয়েছে। এ তারই প্রস্তুতি পর্ব। এই পুলিস বাহিনী পরিচালনা করে এসেছে পুলিস সুশারিন্টেনডেন্ট মিঃ ক্রেগান আরও একজন ইংরাজ অফিসার —মিঃ ক্লার্ক। ওদের হায়েনা চোখ এখন থেকেই সতর্ক : যেন এই বাড়ী হতে কেউ বের হয়ে আসতে না পারে, পালিয়ে না যায়। সাধ্য কি বিটিশ পুলিস ব্যুহ ভেদ করে একটি মক্ষিকাও যেন উড়ে না পালায় এমন সতর্কতা ওদের।

কিন্তু কেন এই সতর্কতা? কাকে গ্রেপ্তার কোরবার জন্য ওদের এমন নিখুঁত ব্যুহ রচনা? কে সে?

আটচল্লিশ নম্বর গ্রে ষ্ট্রিটের বাড়ী।

গ্রেপ্তার করতে এসেছে বৃটিশ পুলিসবাহিনী এই বাড়ীরই বিশেষ একজনকে।

এবার পুলিস বাহিনীর একটা অংশ এগিয়ে চলে বাড়ীটার উদ্দেশ্যে।

দাদা, ওঠো, বাড়ীতে পুলিস এসেছে।

ভগিনীর আহ্বান শোনা গেল দাদার উদ্দেশ্যে। দাদা তখন বোধহয় ঘুমুচ্ছেন আর ঘুমোবেনই বা কেন? এমন কাক-ডাকা-ভোরে ঘুম থেকে ওঠার প্রয়োজনীয়তাই বা কি? পুলিসবাহিনী যে হঠাৎ তার উপর এত সদয় হয়ে উঠবে রাত কেটে ফর্সা হওয়ার আগেই হাজির হবে সে কথা ভাববেন বা কেমন করে?

বোনের ডাকে ঘুম ভেঙে গেছে তখন দাদার।

ব্যাপারটা কি জানতে চাইলেন?

কিন্তু ব্যাপার আর জানা হল না। ভাল করে সব কিছু তখনও জানাই হয়নি, ঘুমের আমেজটা কাটিয়ে নিতেও তো কয়েকটা মুহূর্তের প্রয়োজন—অথচ সে সময় তিনি পেলেন না। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল পুলিসবাহিনীর সেই খণ্ডাংশ বাড়ীর ভিতরে।

এগিয়ে এলো মিঃ ক্লার্ক।

ঘরের চারিদিকে একবার তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে পড়েছে সে। একী দৈন্য দশা! অবিশ্বাস্য।

ঘরের মেঝেয় শুধুমাত্র একটা মাদুর পেতে একটা লোক শুয়ে রয়েছে। এই লোকটিকেই কি আজ গ্রেপ্তার করতে এসেছে?

একটা সন্দেহ, একটা দ্বিধা জাগে মিঃ ক্লার্কের মনে। অথচ এখানে অভিযান চালনা করার আগেই সে তো নিশ্চিত খবর পেয়েছে তাদেরই গোয়েন্দা দপ্তর হতে যার বিরুদ্ধে এমন সশস্ত্র অভিযান চালাবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সে লোকটি এই আটচল্লিশ নম্বর বাড়িতেই আছে! তবে কি এ অন্য কেউ? তার মন সন্দেহ দোলায় তখন দোদুল্যমান।

সন্দেহ নিরসনের আশায় জিজ্ঞেস করল বাধ্য হয়েই শেষ পর্যন্ত মিঃ ক্লার্ক।
আমি অরবিন্দ ঘোষকে খুঁজছি।

আমি অরবিন্দ ঘোষ।
চমকে উঠল পুলিস অফিসার।

এ কোন অবিশ্বাস্য কথা? এ-ই অরবিন্দ ঘোষ।

দেখলে মনে একবারও সন্দেহ জাগে না যে দীর্ঘ নয় বছর ইনিই কাটিয়ে এসেছেন বিলেতে। চাল চলনে, খানা-পিনায় যিনি পুরোপুরি সাহেব, যিনি ভালো করে বাংলা বলতে পারেন না পর্যন্ত তার এই দৈন্যদশা—মিঃ ক্লার্কের কল্পনারও বাইরে। ঘরে বিছানা-বালিশ নেই তক্তপোশ তো দূরের কথা।

কৃচ্ছ্রসাধনার একটা স্পষ্ট স্বাক্ষর সেই ঘরের সর্বত্র।

অরবিন্দের দিকে তাকিয়ে রইল মিঃ ক্লার্ক তারপর বলল, I am ashamd you.

নিরুত্তর অরবিন্দ। মুখে হাসি। ভোগ বিরতির মূল্য বোঝার সাধ্য তোমার নেই বৃটিশ কর্মচারী।

এমন ঘরে থানা তল্লাসি চালানো সময়ের অপব্যয় মাত্র।

তবু কর্তব্য করতে হবে।

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল পুলিশবাহিনী।

শুরু হল সার্চ।

কিন্তু কোথায় কি ?

কোন আপত্তিকর জিনিস কোথাও নেই। তবু সতর্ক দৃষ্টি নিয়েই ওরা শুরু করল থানা তল্লাসি। সব জিনিস খুটিয়ে পরীক্ষা করার একটা প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। অন্ততঃ বৃটিশ পুলিসের এই রকমই একটা বিশ্বাস।

হঠাৎ নজর পড়ল একজন পুলিসের। একতাড়া কাগজ। ওগুলো কি ? নিশ্চয়ই বিপ্লবীদের কাছে লেখা চিঠিপত্র ছাড়া অন্য কিছু নয়। ওগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ওগুলো তচ্‌নচ্‌ করে ফেলল পুলিস বাহিনী।

কিন্তু হায়রে মূঢ়! ওগুলো অরবিন্দের লেখা কবিতার পাণ্ডুলিপি মাত্র।

সেগুলোই তোমার স্পর্দ্ধা ভরে ছড়ালে, ছিটালে; সঙ্গেও নিয়ে গেলে।

অপদার্থতার পরিচয় তোমরা আর কি দেবে বৃটিশ পুলিস ?

সার্চ চলেছে পুরো দমে। এ-ঘর ও-ঘর। এখানে সেখানে সর্বত্র।

অরবিন্দের ঘর থেকে পাওয়া গেল একটা কাগজের বাক্সে মাটি।

ওটা কী ?

চমকে উঠেছে মিঃ ক্লার্ক। তাহলে এই বস্তুর সন্ধান পাওয়ার জন্যই কি তাদের এমন থানা তল্লাসি চালানো ? যেন জোরদার হয়ে ওঠে অরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

সরাসরি জিজ্ঞেস করে মিঃ ক্লার্ক অরবিন্দকে।

এগুলো কি বোমার মশলা ?

তার চেয়েও মারাত্মক !

আতঙ্কিত মিঃ ক্লার্ক। আঁতকে উঠে একটু নিম্ন স্বরেই আবার জানতে চায়, কী ?

দক্ষিণেশ্বরের মাটি !

দক্ষিণেশ্বরের মাটি ? তাকে বোমার চেয়ে মারাত্মক বলার মানে ?

অরবিন্দ হাসলেন।

হ্যাঁ, দক্ষিণেশ্বরেরই মাটি—রামকৃষ্ণ পরমহংসের চরণ-ছোঁয়া মাটি। এতো সাধারণ মাটি নয়—এ যে পবিত্র তীর্থ-রেণু। আর বোমার চেয়ে মারাত্মক তো নিশ্চয়ই। দক্ষিণেশ্বরের প্রতি ধূলিকণাই এক একটি বোমা।

মিঃ ক্লার্ক এবার নিশ্চিন্ত। তাহলে ওগুলো তেমন মারাত্মক নয়।

আবার হাসলেন অরবিন্দ মিঃ ক্লার্কের এমন নিশ্চিন্ততা দেখে।

তাই প্রশ্ন করলেন, তা সব চেয়ে বড় বোমাটার নাম শোনেন নি?

অবাক মিঃ ক্লার্ক। কৈ তার তো তেমন কিছু মনে পড়ছে না।

সে বোমাটার নামই স্বামী বিবেকানন্দ। স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলেন অরবিন্দ।

পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট মিঃ ক্রেগান এবার হুকুম দিলেন। আসামীর হাতে হাত-কড়া ও কোমরে দড়ি পরাও।

তা-ই হল।

অরবিন্দের হাতে হাত কড়ি কোমরে দড়ি পরানো হল।

অরবিন্দ কিন্তু নির্বিকার এ ব্যাপারে।

সাধারণ আসামীর ঊর্দ্ধে' অরবিন্দকে স্থান দিতে পারছেন না ক্রেগান।

আর তারপর?

তারপর তোমরা সব আসামীর ক্ষেত্রে যা করে থাক।

বিচার।

বিচারের নামে প্রহসন।

অত্যাচারে আর উৎপীড়নে জবানবন্দী নেওয়ার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা।

দোষী প্রমাণ করতে পার আর না পার—রায় তোমাদেরই অনুকূলেই। অনুকূলে তো হবেই। আসলে বিচারকও তো তোমাদেরই নির্দিষ্ট, রায়ও তোমাদের নির্দ্ধ'রিত।

তাই যখন তোমরা দেখলে ওঠা মে কমিশনারের সামনে অরবিন্দ কোন কারণেই কোন কথা বলতে চাইলেন, তখন তোমরা ৫ই মে ম্যাজিস্ট্রেট থর্ণ হিলের এজলাসে নিয়ে এলে অরবিন্দকে।

সেখানে থেকে আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে।

কী চমৎকার বিচার ব্যবস্থা তোমাদের।

বিচার হল না, রায় দেওয়া হলো তোমাদেরই পক্ষে—তোমাদের ইচ্ছামত. তোমাদের নির্দেশ অনুযায়ী।

নির্জন কারাবাসের ব্যবস্থা হল অরবিন্দের জন্য।

কিন্তু এতো কারাবাস নয়—এ যে নবজন্মের সূতিকাগার।

অরবিন্দের জীবনে কারাগারের অভিসম্পাতের তীব্র জ্বালা নিয়ে এল না, এও আশীর্বাদের অমৃত ধারা নিয়ে।

অরবিন্দ ঘোষ শুধু বিপ্লবী নন—তিনি ঋষি! ঋষি অরবিন্দ।

১৮৭২ সালে পনেরই আগষ্ট।

জন্মগ্রহণ করলেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। জন্ম কোলকাতারই একটি অখ্যাত পল্লীতে।

পিতা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ। মাতা স্বর্ণলতা দেবী।

কোন্নগরের ঘোষ পরিবার সর্বজন বিদিত।

এই সর্বজন পরিচিত, সর্বজন বিদিত বিখ্যাত ঘোষ বংশেরই ছেলে কৃষ্ণধন ঘোষ।

তখন আমরা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। ধর্ম ধর্ম করেই সমাজপতিরা ব্যাস্ত, অথচ ধর্মের নামে প্রকারান্তরে তারা যে অধর্মাচরণকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন দিনের পর দিন তা সেকালীন নীতিবাগীশদের বোধেরও বাইরে ছিল। তা না হলে সাগর পারে গেলে হিন্দু ধর্মচ্যুতি ঘটে শব ব্যবচ্ছেদ ধর্ম একেবারে পণ্ড—এমন ভ্রান্ত বিশ্বাস সেই সমাজপতিদের মাথায় ভূত হয়ে চেপে বসবেই বা কেন। কেনই বা চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নরত ছাত্রেরা তাদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াবে ?

সমাজপতি আর নীতিবাগীশদের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করেই কৃষ্ণধন ঘোষ কালাপানি পাড়ি দিলেন। উদ্দেশ্য চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ। অতএব কুসংস্কার আচছন্ন হিন্দুসমাজ তার দিকে ভ্রূকুটি হানল কিনা, সমাজপতিরা তাদের স্বার্থসৃষ্ট বিধি নিষেধ আর শাসন অনুশাসনের জালে তাকে ঘিরে ফেলল কিনা তাতে তার বয়েই গেল। ওসব তোয়াক্কা করেন না তিনি। তাছাড়া মনে মনে ভাবতেন বিদেশ থেকে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে ফিরলে সমাজপতিরা কি আর তাকে ঠেলতে পারবে ?

তাই অযথা আর চিন্তা করে লাভ নেই।

তিনি বলতে গেলেন।

এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়াশুনা করলেন। অবশেষে সসম্মান এম, ডি, উপাধি নিয়ে ফিরে এলেন দেশে।

কিন্তু একী শুনছেন তিনি ?

অবাক মানলেন কৃষ্ণধন ঘোষ।

সমাজপতিদের স্পষ্ট বক্তব্য :

কৃষ্ণধনের জাত গেছে। ম্লেচ্ছদেশে এতকাল পড়াশুনা করার পরেও কি আর হিন্দুত্ব তিলমাত্র বজায় থাকে---না থাকা সম্ভব ?

অতএব বিধান দিলেন সমাজপতিরা।

কৃষ্ণধনের প্রায়শ্চিত্ত করা আশু প্রয়োজন।

সমস্ত অন্তরাত্মা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল কৃষ্ণধনের।

না, প্রায়শ্চিত্ত তিনি করবেন না। তিনি এমন কোন অপরাধ করেন নি যে আজ প্রায়শ্চিত্ত করার প্রশ্ন উঠতে পারে ?

জাত কি এতই ঠুন্‌কো ! যে জাতের নামে এমন বজ্জাতি তিনি মেনে নেবেন সাগর পার হলেই যদি জাত যায় তবে সে জাত যাওয়াই ভাল।

ভিত্তিহীন অভিযোগ আমি মানি না—মানব না। সমাজপতিদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন কৃষ্ণধন ঘোষ।

সুতরাং সমাজপতিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ছাড়া উপায়ন্তরও নেই। তাই মুখোমুখি ওদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্যই মনে প্রাণে প্রস্তুত হলেন ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ !

সমাজপতির বিষদৃষ্টিতে পড়লেন কৃষ্ণধন।

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লের দল দোর্দণ্ড প্রতাপে হুঙ্কার ছাড়লেন।

কৃষ্ণধন বিধর্মী, ম্লেচ্ছ,—ঘোষ বংশের কলঙ্ক ! তাকে আজ হতে আমরা একঘরে করলাম।

নিরুপায় গ্রামবাসী।

বলির পাঁঠা ওরা—সমাজপতিদের হাড়কাঠে সবসময় যেন গলা পাতাই আছে অতএব কোন দ্বিধা নয়। সমর্থন জানাতেই হবে।

ঠিক—ঠিক।

কৃষ্ণধন বুঝলেন আর কোন্নগরের উপর মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করতে তার মন সাঁয় দিল না।

পৈতৃক গ্রাম কোন্নগর ছেড়ে যেতেই হবে।

যখন একবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বিরোধিতার তখন মাথা নীচু করে সেখানে বিরোধিতার সঙ্গে আপোসে রফা করা অযৌক্তিক।

অতএব চল কোলকাতা।

নামমাত্র মূল্যে বাড়ীঘর বিক্রী করে সেলাম জানালেন নিজ গ্রামকে। চলে এলেন কোলকাতায়। এ-ই ভাল হল।

অন্ততঃ সমাজপতিদের রাগ বাড়িয়ে শাসন তো আর নেই।

কিন্তু বিচিত্র মানুষ এই খ্যাতনামা সিভিল সার্জন ডাঃ ঘোষ।

পোশাকে, পরিচ্ছদে, চলন-বলনে, আচার-আচরণে, খানা-পিনায় পুরো দস্তুর সাহেব হয়েও অধিকাংশ সরকারী কর্মচারীদের মত মাতৃভূমির অধিবাসীদের প্রতি উন্নাসিক তিনি নন। বরং ভালবাসতেন জন্মভূমিকে, ভালবাসতেন স্বদেশের দরিদ্র অধিবাসীদের। ওদের দুঃখ মোচন করাই তো ছিল তাঁর জীবনের একটা বিরাট ব্রত।

পিতার এই সদগুন অরবিন্দ পেলেন উত্তরাধিকারারসূত্রেই যেন।

অরবিন্দ কৃষ্ণধন ঘোষের তৃতীয় পুত্র।

জ্যেষ্ঠ বিনয় ভূষণ, দ্বিতীয় পুত্র মনোমোহন, আর কনিষ্ঠ বারীন্দ্র কুমার।

আর চার ভায়ের একটি মাত্র বোন সরোজিনী।

ডাঃ ঘোষের বিশ্বাস, ইংরাজদের স্কুল ছাড়া প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব নয়।

শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা আহরণই তো আর শিক্ষার্জনের মাপ কাঠি নয়। সময়-নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা-নিষ্ঠা, আচরণ, পরিচ্ছন্নতা এগুলোও তো শিক্ষণীয়—তা না হলে শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

অতএব ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দান ব্যাপারে কৃষ্ণধন ঘোষ বরাবরই ইউরোপীয়ান স্কুলই পছন্দ করতেন।

বিনয় ভূষণ ও মনোমোহন দার্জিলিং এর লরেটো কনভেন্ট স্কুলের ছাত্র। অরবিন্দের বয়স তখন মাত্র পাঁচ।

তা হোক ! তবু স্থির সঙ্কল্প নিলেন ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ তাকেও ঐ লরেটো কনভেন্ট স্কুলেই ভর্তি করে দেবেন ।

অবশেষে একদিন বিনয় ভূষণ মনোমোহন দুই দাদার সঙ্গে অরবিন্দ এলেন ঐ স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্যে ! ভর্তি হলেনও ।

কিন্তু একী !

সেইসব ইউরোপীয়ান ছাত্র ও অধ্যাপকরাই যারা ভারতীয়দের নেটিভ ভেবে অবজ্ঞা মেশানো করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তারাই কিন্তু আজ বিস্ময় বিমুগ্ধ অরবিন্দের মেধার পরিচয় পেয়ে। অরবিন্দের প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য ও স্বভাবের মাধুর্য দেখে আজ আর তাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার জো নেই ।

বিজাতীয় আবেষ্টনা ।

কিন্তু তাতে অরবিন্দের কি আসে যায় ! এ আবেষ্টনীর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে তাকে খুব বেশী বেগ পেতে হল না। সম্পূর্ণ বিজাতীয় পরিবেশেও অরবিন্দ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলেন আপন সৌরভে।

তবু এদেশে ছেলেদের ইউরোপীয়ান কায়দায় শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্যতা লক্ষ্য করে তৃপ্ত হতে পারলেন না ডাঃ ঘোষ ।

বিলেত যাওয়ার সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত নিলেন ।

সাত বছরের অরবিন্দ, বিনয় ভূষণ, মনোমোহনকে সঙ্গে নিয়ে সপরিবারে বিলেত যাত্রা করলেন ডাঃ কৃষ্ণধন ।

জাহাজ তখনও লক্ষ্যে পৌঁছায়নি ।

জন্ম হল জাহাজেই—উত্তাল সমুদ্রের বুকেই কনিষ্ঠ পুত্র বারীন্দ্রকুমারের ।

হয়তো ভগবানের এ অভিপ্রেত ।

তাই জন্মলগ্নের উর্ত্তালতা, উদ্দামতা যা ছিল সাগরের বুকে—সেই উত্তালতা, উদ্দামতই তো শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হল বারীন্দ্র কুমারের জীবন। বারীন্দ্র কুমারের বিপ্লবী জীবন এ ছাড়া আর কি ?

পৌঁছালেন ইংলণ্ডে কৃষ্ণধন ঘোষ সপরিবারে ।

স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের লেখাপড়া ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেই দেশে ফিরলেন ডাঃ ঘোষ। তার কি ইংলণ্ডে পড়ে থাকলে চলে ? চিকিৎসার মাধ্যমে যে

সেবাব্রত উদ্‌যাপন তিনি করেছেন তা মাঝপথে স্তব্ধ করে দেওয়া যায় না। দেওয়া সম্ভব নয়।

দিন কাটে।

স্ত্রী স্বর্ণলতা দেবী চঞ্চল হয়ে উঠলেন দেশে ফিরে আসার জন্য। শিশুপুত্র বারিন্দ্র কুমার আর মেয়ে সরোজিনীকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ফিরে এলেনও।

আর ওরা তিনজন ?

বিনয় ভূষণ, মনোমোহন আর অরবিন্দ ?

থেকে গেলেন বিলেতেই। ম্যাঞ্চেষ্টারে ড ইড পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। বিলেতে থেকেই লেখাপড়া শিখতে হবে তাদের।

এই ড ইড পরিবারের সঙ্গে ডাঃ ঘোষের ছিল প্রীতি মধুর সম্পর্ক। সেই বাড়ীতে থেকেই ওরা তিনভাই লেখাপড়া চালিয়ে যেতে লাগলেন।

অরবিন্দ ভর্তি হলেন ম্যাঞ্চেষ্টার গ্রামার স্কুলে।

দেখতে দেখতে পাঁচ পাঁচটা বছর কেটে গেল।

শিখে নিলেন ইংরাজী, আয়ত্ব করলেন ফরাসী ভাষা। চেষ্টার কেষ্ট মেলে। তাই চেষ্টা করেই অরবিন্দ আরও দুটি ভাষা অল্পবয়সেই আয়ত্ব করলেন—ইতালীয় ভাষা আর জার্মান ভাষা।

কিন্তু বেশী দিন আর ম্যাঞ্চেষ্টারে থাকা হল না।

ড ইড পরিবারের সকলেই চলে গেলেন ম্যাঞ্চেষ্টার ছেড়ে অষ্ট্রেলিয়ায়। অতএব ম্যাঞ্চেষ্টারের শান্তি ও আনন্দের হাট ভেঙ্গে গেল।

তা ছাড়া আর কি ?

অরবিন্দ এই পরিবারেরই আত্মীয় অক্রয়েড পরিবারে এত বেশী যাওয়া আসা করতেন যে তার তো তখন নতুন নামকরণ হয়েছিল——অরবিন্দ অক্রয়েড ঘোষ।

আজ যখন ম্যাঞ্চেষ্টারে পরিচিত জন কেউ রইল না তখন কেনই বা বৃথা পড়ে থাকা ম্যাঞ্চেষ্টারে।

একরকম বাধ্য হয়েই তারা চলে এলেন ম্যাঞ্চেষ্টার ছেড়ে লণ্ডনে।

এবার আর ম্যাঞ্চেষ্টার গ্রামার স্কুল নয়—এবারে লণ্ডনের সেন্টপলস্ স্কুল।

কিন্তু প্রতিভা আর সুমধুর চরিত্র গুণ কি আর স্থান ভেদে পরিবর্তিত হয় ?

অরবিন্দের অতুলনীয় প্রতিভা মুগ্ধ কোরল এখানেও সকলকেই—তার চরিত্র ও মাধুর্যই টেনে আনল তার কাছাকাছি, পাশাপাশি।

সেন্ট পলসেও পাঁচটা বছর কাটল।

সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায়। বৃত্তিও পেলেন। যার মূল্য চল্লিশ পাউণ্ড। একী কম কথা!

তারপর কলেজ।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কিংস কলেজে ভর্তি হলেন অরবিন্দ।

দু'দুটো বছর কেটে গেল দেখতে দেখতে।

এবারেও সম্মান—এবারেও কৃতিত্ব।

ট্রাইপস পেলেন অরবিন্দ।

খবর যথা সময়েই পৌঁছাল কৃষ্ণধনের কাছে।

পুত্র গৌরবে পিতার মুখ উজ্জ্বল। তাছাড়া অরবিন্দ যে তার বড় আদরের।

চিঠি লিখলেন অরবিন্দকে:

আমার ইচ্ছা তুমি সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও।

কৃষ্ণধন স্বপ্ন দেখেন, তার অরবিন্দ আই, সি, এস, পাশ করেছে। একটা জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসেছে।

পিতার চিঠি পেয়ে মনস্থির করে ফেললেন অরবিন্দ।

আই, সি, এস, পড়বেন তিনি।

পরীক্ষার প্রস্তুতি পর্ব শুরু হল এবার!

এল আঠার শ' নব্বই সাল।

অরবিন্দের বয়স তখন মাত্র আঠারো।

আই, সি, এস, পরীক্ষায় বসলেন আঠারো বছরের ভারতীয় তরুণ অরবিন্দ ঘোষ।

পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল যথা সময়ে।

অরবিন্দ ঘোষ চতুর্থ স্থান অধিকার করলেন আই, সি এস, পরীক্ষায়। গ্রীক ও ল্যাটিনে তিনি পেলেন রেকর্ড মার্ক।

সেদিনই বুঝতে পেরেছিল ব্রিটিশ শাসক, ভারতীয় তরুণ অরবিন্দ কী অসাধারণ প্রতিভারই না অধিকারী!

ভারত গৌরব অরবিন্দ।

বিদেশীরা সেদিন বুঝেছিল, যাদের নেটিভ, কালা আদমী ভেবে এতকাল অবজ্ঞার চোখে তাকাচ্ছিল তারাও ওরা নতিস্বীকার করেছিল সেদিন প্রতিভাধর অরবিন্দের কাছে।

কিন্তু একী হল! বিদেশী ভাষা শিখতে গিয়ে তিনি যে নিজের মাতৃভাষা প্রায় ভুলে গেলেন! ইংরাজী ভাষায় ল্যাটিন ভাষায়, গ্রীক ভাষায়, ফারসী ভাষায় যিনি পণ্ডিত হয়ে উঠলেন তিনি কিনা তার মাতৃভাষায় অত্যন্ত কাঁচা। এ কল্পনারও বাইরে। কিন্তু এমনই হয়। ছোট্ট বয়স হতে একটা ভিন্ন পরিবেশে এসে মাতৃভাষা চর্চার সুযোগ আর এল কৈ?

ড ইড পরিবারের অভিভাবকত্বের মধ্যেই হোক বা বন্ধুবান্ধব-ছাত্রমহলেই হোক সর্বত্রই তো বিদেশী ভাষার চর্চা—বিদেশী ভাষার অনুশীলন। একেবারে প্রারম্ভেও দার্জিলিং-এর লরেটো স্কুল।

সুতরাং নতুন করে মাতৃভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসতে গিয়ে—কিছু কিছু বাংলা ভাষা শিখলেনও।

কিন্তু আপাততঃ ঐ পর্যন্ত!

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য লাভ করলেন অরবিন্দ।

কিন্তু এখনও অনেক বাকী।

এই ডিগ্রী পেতে হলে তাঁকে অন্ততঃ দু'বছর শিক্ষানবিস থাকতে হবে। আর তারপর? তারপর শেষ পরীক্ষা—ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা।

শিক্ষানবিশ রইলেন অরবিন্দ। শেষও হল দুটো বছর কালের অগ্রগতিতে।

কিন্তু বিচিত্র মনের গতি। কখন সে গতি বদল হয় কে বলতে পারে?

অরবিন্দের কানেও বোধহয় তখন দিনরাত গুঞ্জিত হচ্ছিল একটি কথাই।

অনহংবাদী হয়ে দেশ সেবা। ইংরাজের গোলাম হয়ে জীবন কাটানোর জন্য তার জন্ম নয়। পরধীন দেশমাতার আহ্বান শুনেছেন, শুনেছেন পরাধীন দেশমাতার আর্তক্রন্দন। মায়ের এ অশ্রুমোচনের দায় যে তারও। তাকেও নিতে হবে এ দায়িত্ব।

পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিন।

পথে বের হয়েছেন অরবিন্দ।

পথ আর ফুরোয় না। চলার শক্তিও যেন তার নেই।

শুধু মনে মনে ভাবছেন ক্রমাগত, অনহংবাদী হয়ে দেশসেবা।

উত্তীর্ণ হয়ে গেল নির্দ্ধারিত সময়।

ঘোড়ায়-চড়া পরীক্ষা দেওয়ার নির্দিষ্ট স্থানে আর হাজির হতে পারলেন না অরবিন্দ আই. সি. এস. পরীক্ষায় ফোর্থ হওয়া সত্ত্বেও ঘোড়ায়-চড়া পরীক্ষায় হাজির হতে না পারায় অরবিন্দের ফলাফল নাকচ হয়ে গেল।

তা হোক।

দুঃখ নেই অরবিন্দের সেজন্য।

শুধুমাত্র পিতার ইচছাটুকু পূরণ করার জন্যই তো তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষায় বসেছিলেন, কিন্তু যখন সাফল্য একেবারে দ্বারে এসে পৌছাল তখনই ভয় পেলেন তিনি, তাহলে কি তিনি ঢালাও সুখ, কার্পেট বিছানো জীবন, দোর্দণ্ডপ্রতাপ, নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের বিনিময়ে একটি পরজাতির গোলাম বনবেন? না, তা হয় না হতে পারে না। তিনি জানতেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে হয়তো মোহ মুক্তি সময় সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়াবে, তাছাড়া পিতার ইচছার বাইরে প্রতিবাদ যদি জানাতে না পারেন? অতএব সব চেয়ে ভাল কথা, পরীক্ষায় হাজিরা তিনি দেবেন না।

তিনি যে শুনেছেন অলৌকিক শক্তির আহ্বান!

দেশে তোমার কাছে এ-ই দাবি করে অরবিন্দ।

নাই বা হলেন আই. সি. এস।

দুঃখের সাধনা করতে তো ভয় নেই অরবিন্দের। নেই কোন দ্বিধা।

কেনই বা থাকবে? কখনও ভাগ্য বিড়ম্বনায়, কখনও বা স্বেচছায় তাকে তো ঘর করতে হয়েছে দুঃখের সঙ্গে। দুঃখের কাছে হার মেনে তো পরাণ কভু হারাবে না।

বিলেতে থাকতেই হয়েছে দুঃখের সঙ্গে ঘর করার হাতেখড়ি।

ডাঃ কৃষ্ণধন চিরকালই উদাসীন। অতএব হয়তো বা টাকা পাঠাবার কথা আর তার মনেই নেই। তাছাড়া টাকা পাঠালেই সব সময় সময়

মতো টাকা পৌঁছাবে তেমন গ্যারান্টিও তো ছিল না। তাই টাকা পয়সা সময় মতো পেতেন না বিনয়ভূষণ মনোমোহন বা অরবিন্দ। এখনো বা এমনো হয়েছে ছেলেদের টাকা পাঠবার জন্য সঙ্কল্প নেওয়ার পর আর সে টাকা তিনি পাঠাতে পারলেন না। হয়তো বা দুঃখের ফিরিস্তি নিয়ে হাজির হয়েছে পরিচিত-অপরিচিত কেউ। তার দুঃখের কথা শুনতে শুনতে অভিভূত কৃষ্ণধন তখন বেমালুম ভুলে গেছেন—ছেলের রক্ষিত টাকাগুলোই তিনি তুলে দিয়েছেন তার হাতে। তারপর যখন তার মনে পড়েছে এ টাকা ছেলেদের পাঠাবার জন্যেই রেখেছিলেন তখন ভেবেছেন :

কুচপরোয়া নেই। কয়েকদিনের মধ্যেই টাকা হাতে এসে পড়বে ছেলেদের পাঠিয়ে দেবো।

কিন্তু সেই কয়েকদিন এল অনেক দেরী করে।

তারপর তিনি টাকা পাঠালেন—সেই টাকা বিলেতে পৌঁছে ছেলেদের হাতে পৌঁছাতেও হয়ে গেল অনেক দেরী।

ছেলেদের একমাত্র ভরসা ঋণ অথবা উপোস।

কিন্তু বিদেশ-বিভুঁয়ে কি আর সব সময় ঋণ মেলে না মেলা সম্ভব ?

অরবিন্দ কিন্তু ওসব দিকে খেয়াল করলেন না।

খাওয়া হয়েছে কি হয়নি সে কথা সব সময় মনে করবার জন্য তার বয়েই গেছে। পাঠাগারের পুস্তকরাজি তখন তার অবলম্বন হত। মনের ক্ষুধা মিটাতে বসে দৈহিক ক্ষুধা মেটানোর কথা তিনি ভুলে যেতেন, প্রয়োজনীয়তাও বোধ করতেন না বিন্দুমাত্র।

তিনি যে সাধক, সাধনাই তার একমাত্র লক্ষ্য। এ সাধনা জ্ঞানার্জনের সাধনা—এখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটা না-মেটার প্রশ্ন অবান্তর।

আই. সি. এস. হতে পারলেন না অরবিন্দ।

ঘোড়ায়-চড়া পরীক্ষায় হাজীরা না দেওয়ার অজুহাতে।

চমৎকার ব্যবসা ব্রিটিশ সরকার।

আসল কারণ তো অন্য রকম। আসলে ভারতীয় ছাত্রদের সভায় অরবিন্দের রাজনৈতিক বক্তৃতা তোমাদের ভাল লাগেনি। শাসকগোষ্ঠি তোমরা—তোমাদের ক্ষমতা শক্তির পরিচয় না দিলে কি চলে ?

তাই তোমরা তুচ্ছ ঘোড়ায়-চড়ার অজুহাতে নাকচ করে দিলে অরবিন্দের পরীক্ষায় সম্পূর্ণ ফলটাকেই।

বারীন্দ্রকুমার 'আমার আত্মকথা' গ্রন্থে লিখেছিলেন সে কথা।

"সেখানে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের এক আলোচনা সভা ছিল তার নাম ছিল 'মজলিস'। এই সভায় গরম গরম রাজনৈতিক বক্তৃতা দেওয়ায় অরবিন্দ সেই বয়সেই ইংরেজ সরকারের 'সুনজরে' পড়েন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন সেখানে অরবিন্দের সমসাময়িক। আই. সি. এস. পরীক্ষায় বেশ সম্মানের সঙ্গে পাস করেও তুচ্ছ ঘোড়ার-চড়ার অজুহাতে যে তাঁকে অকৃতকার্য বিবেচনা করা হল তার কারণ খুব সম্ভব ইংরেজ সরকারের সেই সুনজর।"

কি জবাব দেবে ইংরেজ সরকার ?

মিথ্যা কথা।

সত্যি তোমাদের বাহাদুরি আছে।

একটা মনগড়া গল্প ফেঁদে বসার মতো জুড়ির অভাব তোমাদের নেই।

তাই তোমরা বলে বসলে ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার জন্যই অরবিন্দ আই. সি. এস. হতে পারিলেন না। কি সুন্দর তোমাদের ছলনা। তিনি যে পরীক্ষা দিতে হাজির হলেন না সে কথা বলার মত সৎসাহস পর্যন্ত তোমাদের নেই।

সাক্ষী সেকালীন প্রচারিত আমাদের সংবাদ পত্রগুলোই।

অথচ ভাবতো একবার চারুচন্দ্র দত্তের বোম্বাইয়ের বাসার কথা।

সেই কাহিনী শুনলেই তো প্রমাণ পাওয়া যাবে অরবিন্দ সম্পর্কে তোমার যে প্রচার চালিয়েছ তা কতখানি ভিত্তিহীন।

বোম্বাইয়ের একটা ছোট্ট শহর। ঠানা।

ঠানার একটা বাড়িতে তখন চারুচন্দ্র থাকতেন।

চারুচন্দ্রের বাড়িতে হাজির হয়েছেন কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব। সবারই ইচছা ছিল বাইরে বেরুবেন।

কিন্তু কী নিদারুণ বৃষ্টি। বাইরে বের হয় সাধ্য কার ?

অথচ সময় কাটানোও দায়।

হঠাৎ পরিকল্পনা হল সময় কাটানোর।

ছোট্ট একটা রাইফেলও এল।

দূরে বসিয়ে দেওয়া হল একটি দেশলাইয়ের কাঠি। লক্ষ্য : বারুদ মাথানো ছোট্ট মাথাটি। ঐ মাথাটাকেই টিপ করে হিট্ করতে হবে।

চেষ্টা করলেন অনেকেই।

কিন্তু ব্যর্থ হল ওদের নিশানা।

এবার অরবিন্দের পালা।

আসুন মিঃ ঘোষ এবার আপনার পালা।

হেসে উঠলেন ঘোষ সাহেব।

বলেন কি? জীবনে আমি কোন দিন রাইফেল ছুঁইনি। আমাকে আর রাইফেল ছুঁড়তে বলবেন না।

কিন্তু না বললে শুনছেই বা কে?

বন্দুক ধরেন কি তাতে কি হয়েছে? এতো একটা আমোদ বই অন্য কিছু নয়!

অরবিন্দ পারলেন না ওদের সকলের আনন্দ লাভের সদিচ্ছাটুকুকে নস্যাৎ করে দিতে।

রাইফেল হাতে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন অরবিন্দ। বুঝে নিলেন নিশানা করার কায়দা কানুন।

আর তারপর?

অবাক কাণ্ড!

লক্ষ্য বিধলেন তিনি।

একবার, দুবার, তিনবার।

সকলে তারিফ করলেন অরবিন্দকে।

ধন্যবাদ মিঃ ঘোষ। সাবাস!

বল ব্রিটিশ সরকার তুমি ভারত ভাগ্য বিধাতা সাজতে চেয়েছো বলে তুমি যা বলবে তাকেই আমাদের বেদ বলে মেনে নিতে হবে?

নিজের উপর যে অরবিন্দের এত আস্থা তিনি ঘোড়ার চড়া পরিক্ষার কৃতকার্য হতে পারেন নি, একথা বিশ্বাস করতে বল?

কিন্তু বিশ্বাস কর ব্রিটিশ শাসক; আজ তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তোমরা

যে আমাদের কী মহৎ উপকার করলে সে কথা তোমাদের বোঝাব কি করে? তোমাদের অভিসম্পাতই তো শেষ পর্যন্ত আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ালো আমাদের কাছে।

তাই আই. সি. এস. অরবিন্দকে আমরা না পেলেও বিপ্লবী অরবিন্দকে আমরা পেলাম, পেলাম ঋষি অরবিন্দকে।

এ তো বিধি নির্দিষ্ট হয়েই ছিল!

তা না হলে যে অরবিন্দ পুরো চৌদ্দ বছর বিলেতে কাটালেন, কাটালেন বিলেতী আদব-কায়দায়, আবহাওয়া পরিবেশের মধ্যে, যেখানে পদে পদে লোভ আর আকর্ষণ, বিলাসিতা আর ভোগ সেই অরবিন্দ এত লোভের হাতছানিকে জয় করলেন কি করে? পাণ্ডিত্যের কমতি ছিল না অরবিন্দের বিন্দুমাত্র অথচ তিনি ভাবছেন, জ্ঞান সাগরের তীর ভূমিতে তিনি শুধু নুড়িই কুড়িয়েছেন এতকাল, পরশ পাথরের সন্ধান পান নি তিনি।

তা ছাড়া কি?

ভারতীয় শিক্ষা, ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় সাধনা ও ধ্যানধারণার সঙ্গে তিনি তো পরিচয়ের কোন সুযোগ পেলেন না।

একী হল তার? মায়ের সঙ্গে ছেলের সম্পর্ক স্থাপনের কোন সুযোগই হল না তার জীবনে।

ছিঃ ছিঃ এ তিনি কি করছেন?

থাক বিলিতি ডিগ্রী শিকেয় তোলা, যাক বিদেশী সভ্যতার মোহ নাগালের বাইরেই।

দেশেই ফিরবেন তিনি।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।

দেশে ফিরে এলেন একে তিন ভাই।

প্রথমেই ফিরলেন অরবিন্দ—তারপর বিনয় ভূষণ—তারও পরে মনোমোহন।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অপেক্ষা করেছিলেন ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ পুত্র অরবিন্দের প্রত্যাবর্তনের জন্য।

কিন্তু ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস।

ইহজন্মে পিতাপুত্রে মিলন আর সম্ভব হল না।

পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ স্বপ্ন দেখিতেন: পুত্র অরবিন্দ আই. সি. এস. পাশ করে

ঘরে ফিরবে। একজন জাদরেল অভিসার হবে অরবিন্দ। ভারতবাসীর সব চেয়ে আকাঙ্ক্ষিত চাকুরী যদি তার ছেলে পায় তাহলে পুত্র গর্বে পিতার বুক বড় হয়ে উঠবে বৈকি।

কিন্তু ভাগ্য বিধাতা বিরূপ।

আই. সি. এস. ডিগ্রী পাওয়া অরবিন্দের পক্ষে সম্ভবপর হল না। কৃষ্ণধন ভেঙে পড়লেন। তবু ছেলের উপর রাগ নেই, নেই পুত্রের প্রতি পিতার বিন্দুমাত্র অভিমানও!

অরবিন্দ যে তার সাত রাজার ধন এক মানিক। বড় আদরের। সেই অরবিন্দ দেশে ফিরে আসছে। যখন এ সংবাদ পিতার কাছে এসে পৌছাল যখন ডাঃ ঘোষ আনন্দে উদ্বেল।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন পুত্রের প্রত্যাবর্তনের। খবর নিচেছন নিয়মিত বিলিত জাহাজে।

কিন্তু হঠাৎ!

হঠাৎ একেবারে বিনা নোটিশে ডাঃ কৃষ্ণধনের পায়ের তলার মাটি সরে গেল! এ কোন দুঃসংবাদ তিনি পেলেন?

অরবিন্দ যে জাহাজে করে রওনা দিয়েছে জেনেছেন সেই জাহাজটাই লিসবন বন্দরের কাছাকাছি পৌছেই সাগরের জলে ডুবে গেছে। প্রাণ হারিয়েছে যাত্রীরা।

তাহলে অরবিন্দ?

অরবিন্দ আর নেই। একথা ভাবতেও পিতার বুকে যেন শেল বিদ্ধ হতে লাগল। এ কী শুনছেন তিনি।

আর ভাবতে পারেন না ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ।

আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

আর সেই যে তিনি মূচ্ছা গেলেন—সে মূচ্ছা আর ভাঙল না।

অথচ এ সংবাদ তো ভুল।

যে জাহাজ ডুবির ঘটনা কৃষ্ণধন জানলেন সে জাহাজে অরবিন্দ আসলে রওনা হতেই পারেন নি। তিনি অন্য জাহাজে রওনা দিয়েছিলেন।

কিন্তু হায় পিতা!

তোমার স্নেহ আর কোনদিন অরবিন্দকে ঘিরে বিবর্তিত হবে না! তুমি যে তোমার প্রিয় পুত্রকে একা ফেলে রেখে অমরলোকের পথে অমৃতের যাত্রী হলে সেখান থেকেই তুমি তোমার পুত্রকে আশীর্বাদ করে যাও। একবার অন্ততঃ চোখ মেলে দেখো সারা ভারত জুড়ে তোমার ছেলের আত্মীয়। আজ যেন ভেঙচি কাটছে কোন্নগরের সেই সমাজ পতিদের যারা অযথা তোমায় একঘরে করে রেখেছিল।

অরবিন্দ দেশের মাটিতে পা দিলেন সুস্থ শরীরে।

কিন্তু শুনতে পেলেন পিতার মৃত্যু সংবাদ, জানতে পারলেন পিতার মৃত্যুর কারণও।

হু হু করে কেঁদে উঠলেন অরবিন্দ।

এ দুঃখের যে আর শেষ নেই।

তিনিই তো পিতার মৃত্যুর জন্য দায়ী!

কিন্তু নিয়তি।

আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে গেছে বলেই হয়তো মারা গেলেন কৃষ্ণধন ঘোষ।

কিন্তু কে এই সান্ত্বনার বাণী আজ শোনাবে অরবিন্দকে। পিতার ইচ্ছাটুকুও যে তিনি আজ সফল করে ফিরতে পারেন নি।

ভয় কি আমি তো আছি।

খুশীতে উচ্ছল মাতামহ রাজনারায়ণ বসু।

বুঝেছিলেন তিনিই, অরবিন্দ আই. সি. এস. না হওয়ায় কোন ক্ষতি হয়নি। অরবিন্দ যে সৌম্য পাণ্ডিত্যের প্রতিমূর্তি। এ পাণ্ডিত্যের মূল্যই বা কম কিসে? অরবিন্দ যে মূর্তিমান প্রতিভা—একথা স্বীকার না করলে যে সত্যের অপলাপ হয়।

শুরু হল তিন ভাইয়ের চাকুরী জীবন।

বিনয় ভূষণ কাজ নিয়ে এলেন কোচবিহার।

কিছু দিনের মধ্যেই প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকের পদ পেলেন মনোমোহন।

কিন্তু অরবিন্দ?

- সুদূর বরোদা রাজ্য হল অরবিন্দের কর্মক্ষেত্র।

তখন অরবিন্দ বিলেতে। শিক্ষাজীবন সমাপ্তির অধ্যায়। আর এ অধ্যায়েই অরবিন্দের পরিচয় হল বরোদার গায়কোয়াড সয়াজি রাও-এর সঙ্গে। তিনিও তখন লণ্ডনে।

মাত্র এইটুকু পরিচয় সম্বল করে অরবিন্দ হাজির হলেন বরোদায়।

গায়কোয়াড সয়াজি রাও বুঝেছিলেন, অরবিন্দ ঘোষ অসামান্য প্রতিভার অধিকারী।

সুতরাং অরবিন্দ সম্পর্কে আজ তার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, নেই অযথা সঙ্কোচ টেনে এনে তাকে দূরে সরিয়ে রাখার কোন কৌশল প্রয়োগের চেষ্টা।

চাকুরী পেলেন অরবিন্দ বরোদায়।

সেটেলমেণ্ট বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগে কাজ নিলেন অরবিন্দ।

আর অবসর সময়?

তিনি গাইকোয়াডের প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবেও করে দিতেন অনেক কাজ।

কিন্তু অরবিন্দের কি তাতে মন ভরে?

আই. সি. এস. এর মোহ যাঁকে বাঁধতে পারেনি বরোদা রাজ্য তাকে বাঁধবে কি করে?

ইংলণ্ডে এসে তিনি যেমন বিদেশী পরিবেশ আর আকর্ষণ, লোভ আর মোহ, সব কিছুকে হেলায় তুচ্ছ করে শুধু মাত্র শিক্ষা আহরণেই ব্রতী হয়েছিলেন, শুধু শিক্ষা অর্জনই ছিল জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তেমনি বরোদায় যে কাজ তিনি পেলেন তাতে শান্তি পেলেন না। মানসিক শান্তিই যেখানে বড় কথা সেখানে প্রাণের যোগাযোগ আশা করা যায় কি করে?

ফলে ভাল লাগল না তাঁর রাজস্ব বিভাগের চাকুরী, ভাল লাগল না সেটেলমেণ্ট বিভাগও।

পরিবর্তন করতে হল চাকুরীর পদটিকে।

তিনি যোগ দিলেন শিক্ষা বিভাগে।

আজন্ম শিক্ষাব্রতী অরবিন্দ হয়তো বা মানসিক তৃপ্তি পাবেন এই দপ্তরে।

অরবিন্দ তখন একুশ-বাইশ বছরের যুবক।

তাতে কি হয়?

আত্মসুখের চিন্তা নেই, চঞ্চলতা নেই, আছে শুধু জ্ঞান সাধনা। সঙ্গী হল শুধু বই আর বই।

বরোদা কলেজের ইংরাজী অধ্যাপক অরবিন্দ।

অমিত প্রতিভাধর অরবিন্দ খুব সহজেই সফলতা অর্জন করলেন অধ্যাপনা জীবনে। হয়তো প্রথম প্রথম বিদেশী পরিবেশে এতকাল শিক্ষা গ্রহণের জন্য সেদেশী শিক্ষা পদ্ধতি এদেশের ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু তাও খুব বেশী দিনের নয়।

অসুবিধা কাটিয়ে উঠলেন অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই। আর ছাত্ররা? তারা পেল তাদের প্রিয় অধ্যাপক অরবিন্দকে।

এবার অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে পেলেন ভারতীয় কাব্য, সাহিত্য, দর্শন পাঠের অখণ্ড অবসর।

শুরু হল নতুন করে মাতৃভাষার সঙ্গে পরিচয়।

বাংলা ভাষা শিখতে হবে—শিখতে হবে সংস্কৃত ভাষাও।

আঠারশ' আটান্নব্বই সালের কথা।

দীনেন্দ্রকুমার রায় এলেন বরোদায়।

উদ্দেশ্য অরবিন্দকে বাংলা শেখাবেন।

অরবিন্দের মামা যোগীন্দ্রনাথ বসুই অরবিন্দের জন্যে এই শিক্ষক নিয়োগ করলেন।

দীনেন্দ্র কুমার রায় এলেন বরোদায়।

কিন্তু হতাশ হলেন তিনি।

কেন?

দীনেন্দ্র কুমার রায় হয়তো ভেবেছিলেন বিলেত-ফেরৎ একজন সাহেবকে তিনি বাংলা শেখাবেন। বিশেষতঃ অরবিন্দ যখন চৌদ্দ বছর বিলেতে কাটিয়ে এসেছেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন, তার কল্পনা আর বাস্তব—এ দু'য়ের মধ্যে আকাশ-জমিনের ব্যবধান, তখনই এই হতাশা।

কিন্তু এ হতাশা দীর্ঘকালের নয়। অরবিন্দের জ্ঞানার্জনের স্পৃহাটুকু লক্ষ্য করে, তাঁর পাণ্ডিত্য, লক্ষ্য করে ফরাসী, ইংরাজ, ল্যাটিন, গ্রীক এগুলোর উপর তার দখল—এ হতাশাভাব কেটে গেল দীনেন্দ্রকুমারের।

অরবিন্দর সঙ্গে পরিচয় হল দীনেন্দ্রকুমারের।

অরবিন্দের হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে তিনি তৃপ্ত। হীনমন্যতা নেই কোথাও, নেই সংসারের কুটিল চক্রের অসূয়া স্পর্শ। এ যে শিশুর সারল্যে বড় উজ্জ্বল। বড় প্রাণবন্ত। কোথায় স্বার্থপরতা? শুধু আছে স্বার্থত্যাগের একটা মহিমা।

পৃথিবীর মানুষে এও কি সম্ভব?

অবাক হয়ে ভাবতে থাকেন দীনেন্দ্রকুমার।

আর কি তার পাঠানুরাগ?

তারিফ না করে সেদিন উপায় ছিল না দীনেন্দ্রকুমারের।

তারিফ করতে হয়েছিল তার উদার হৃদয়েরও!

বরোদায় চাকরী নিয়েছিলেন। মাস মাহিনাও তার কম ছিল না। প্রায় হাজার টাকা। অথচ হলে কি হয়? মাসের শেষে তবু টানাটানি। হাতে একটি পয়সাও নেই।

মাকে বা বোনকে টাকা পাঠাতেন। বই কিনতেন। যারা প্রার্থী হয়ে তাঁর দুয়ারে এসে দাঁড়াত তাদের কোনদিন বিমুখ করতেন না তিনি তাই নিজের বেলায় ঐ বিরাট মাস-মাহিনার একটা সামান্য অংশই পড়ে রইত। এতে হয়তো কৃচ্ছ সাধন করা যায় কিন্তু অভাব মেটে না। প্রয়োজনের বিরাট গহ্বর।

তবু দুঃখ নেই অরবিন্দের। ভাবনা তো নেই-ই।

ব্রহ্মচর্য নিরত অরবিন্দ, পরদুঃখকাতর অরবিন্দ। আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী অরবিন্দ কোনদিন টাকা-আনা-পাই-এর হিসাব মেলাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠেন নি।

তাই মিতাচারী জীবনে তিনি ছিলেন সুখী। সুস্বাস্থ্যের অধিকারীও।

সেদিন অরবিন্দ একটা মনি অর্ডার ফরম পূরণ করতে ব্যস্ত।

এলেন দীনেন্দ্রকুমার রায়।

অরবিন্দ অবাক! এসময় তো দীনেন্দ্রবাবুর আসবার কথা নয়। হাতের কলমটা নামিয়ে রাখলেন বাধ্য হয়েই।

জিজ্ঞাসা করলেন।

কি ব্যাপার দীনেন্দ্রবাবু। হঠাৎ অসময়ে? কিছু বলবেন?

না, এমনিই এসেছি তেমন কিছু বলবার নেই।

কিন্তু অরবিন্দের যেন মনে হল কিছু বলতেই উনি এসেছেন।

বলুন না কি বলবেন?

তবু সংকোচ যায় না দীনেন্দ্রকুমারের।

ভাবছেন দীনেন্দ্রকুমার, কি করে বলবেন? সব সময় সব কথা বলা যায়ও না। খানিকটা লজ্জা সঙ্কোচ এসে কণ্ঠরোধ করেই ফেলে।

তাগিদ দিলেন অরবিন্দ, বলুন না কি বলবেন? আমি কিন্তু বুঝতে পারছি কিন্তু বলতেই আপনি এসেছেন।

আর এড়িয়ে যাওয়া যুক্তিহীন।

অতএব এবারে আসল কথা বলতেই হল দীনেন্দ্রকুমারকে।

কিছু টাকার বড় প্রয়োজন। বাড়ীতে টাকা পাঠানো উচিত ছিল অনেক আগেই অথচ পাঠাতে পারছি না।

সেকথা আমাকে বলেন নি কেন?

বলিনি, ভাবছিলাম বলবো সময় মতো, কারণ আপনার হাতে যদি টাকা পয়সা না থাকে। তাই বিব্রত করতে চাইনি আপনাকে।

ছিঃ ছিঃ দেখুন তো। কী অন্যায়! কী অন্যায়! বাড়ীতে টাকা পাঠানো দরকার সেকথা আগে বলবেন তো।

আর কোন কথা অরবিন্দ বললেন না।

বাক্স খুলে বের করলেন হাতব্যাগ। তারপর ব্যাগে যা ছিল সব তিনি তুলে দিলেন দীনেন্দ্রকুমারের হাতে।

বললেন, এখন আর এর বেশী টাকা সঙ্গে নেই।

আপনি বরং এ টাকাই পাঠিয়ে দিন আপাততঃ।

দীনেন্দ্রকুমারের বিস্ময়ের তখন অন্ত নেই।

না, না এ টাকা আমি নিতে পারব না! এ টাকাতো আপনিই কাউকে পাঠাবেন বলে মনি অর্ডার ফরম লিখতে বসেছেন।

সে তো বাড়িতে পাঠাব বলে। আপনার প্রয়োজন তাদের চেয়ে অনেক বেশী। আমি না হয় পরেই পাঠাব। আপাততঃ আপনিই পাঠিয়ে দিন।

আর কোন কিছু বলবার সুযোগ অরবিন্দ দিতে চান না দীনেন্দ্রকুমারকে।

লেখা বন্ধ রেখে আপাততঃ মনি অর্ডার ফরম যথাস্থানে রেখে দিলেন।

অরবিন্দ তখন বরোদায়।

মণীষী রমেশচন্দ্র দত্ত আঠার শ' নিরানব্বই সালের শেষের দিকে বরোদায় এলেন। বরোদার মহারাজার নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিলেন রমেশচন্দ্র।

তিনি তখন উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনার।

ইংরাজী সাহিত্যের প্রোথিত-যশা লেখক, কবি-প্রতিভার ধারক রমেশচন্দ্র বরোদায় পৌছে জানতে পারলেন, অরবিন্দ এখানেই আছেন।

বরোদায় আসার পর হতেই অবসর মুহূর্তগুলো অরবিন্দ কবিতা রচনার প্রচেষ্টায় ভরিয়ে রাখতেন। কাব্য-পাঠ যেমন চলত তেমনি সমান তালে চলত কাব্য-চর্চাও। এখবর অনেকেই জানেন, অনেকে জানতেও পেতেন লোক পরম্পরায়।

অরবিন্দের কাব্যচর্চা অবশ্য আজ নতুন নয়।

তিনি যে জন্ম কবি।

চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। অবশ্য ইংরাজী কবিতা। আর তা প্রকাশিতও হয়েছিল পত্রিকায়।

ধুম্ পড়ে গিয়েছিল সেদিন সমালোচক মহলে বিস্ময়ের। বিস্ময় বৈকি! এক জন চৌদ্দ বছরের বালকের—সেও বাঙালী বালকের হাত দিয়ে এমন কবিতা! বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সন্দেহ দোলায় দ্বিধান্বিত হয়ে উঠেছিলেন সেদিন অনেক সমালোচকই।

আজ আবার নতুন পরিবেশে নতুন ভাবে সেই প্রতিভারই অনুশীলনের সুযোগ ও অনুশীলন।

রমেশচন্দ্রও জানতে পেরেছিলেন অরবিন্দের কাব্য-চর্চার কথা।

এক মনীষার আর এক মনীষার সন্ধান।

দেখা করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন রমেশচন্দ্র অরবিন্দের সঙ্গে।

এলেন অরবিন্দের ঘরে অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করতে!

এক প্রতিভা আর এক প্রতিভার আকাশে আজ আনন্দের উদ্বেল। একটি প্রতিভা আজ দ্বিধাহীন কণ্ঠে প্রশংসায় পঞ্চমুখ আর অন্য একটি প্রতিভা প্রশংসা শুনে সংকুচিত। বিদ্যা বিনয়ের জন্ম দেয় এ যেন তারই সাক্ষ্য।

শুনলাম তুমি কবিতা লিখছ।

লজ্জায় পড়েন অরবিন্দ।

কোনক্রমে বলেন, সে সব তেমন কিছু নয়।

শুনেছি তুমি তো রামায়ণ-মহাভারতের অংশবিশেষ ইংরাজীতে অনুবাদও করেছো। দেখি পাণ্ডুলিপি। কেমন হয়েছে দেখি।

অত্যন্ত দরাজ হৃদয়ে রমেশ চন্দ্রের এ আহ্বান। এ চাওয়া।

কিন্তু আপনি যে অনুবাদ করেছেন তার পাশাপাশি রাখার যোগ্যতাও আমার অনুবাদ সাহিত্যের নেই। সেগুলো নিতান্ত ছেলেমানুষি। তুচ্ছ।

বেশ তো তোমার সেই তুচছ লেখাগুলোই দাও। পড়ে তো দেখি, ক্ষতি কি ?

অতএব উপায় নেই অরবিন্দের।

অনুরোধে ঢেকি গোলে যায়। আর এতবড় একজন মনীষী তাকে বলেছেন সে কথাটা তিনি রাখবেন না এড়িয়ে যাবেন সেও বা কেমন ধারা কথা অশোভনও বটে।

অরবিন্দ কি কোন অশোভন আচরণ করতে পারেন ?

অতএব অগত্যা তুলে দিতে হল তাঁর হাতে পাণ্ডুলিপি।

আর পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়েই রমেশ চন্দ্র ডুব দিলেন অরূপ সাগরে। মুক্তো খোঁজার জহুরী চোখ তার আছে।

তাই এলোমেলো ভাবে শুধু পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো উল্টেপাল্টেই কোন একটা মন্তব্য জাহির নয়। তিনি আগাগোড়া পড়ে গেলেন পাণ্ডুলিপির সব পাতাগুলোই।

পড়া শেষ হল অবশেষে।

চমৎকার! সুন্দর! দোষরহীন।

তারিফ না করে উপায় নেই রমেশ চন্দ্রের।

অরবিন্দ তাকিয়ে আছেন রমেশ চন্দ্রের মুখের দিকে।

খুশীতে উদ্বেল রমেশচন্দ্র।

তোমার কবিতা আগে পড়লে আমি কখনই রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ করে সময় নষ্ট করতাম না, অরবিন্দ।

অরবিন্দ অবাক। কী শুনছেন তিনি।

জান অরবিন্দ আমার নিজের কাব্য রচনার প্রয়াসটা ছেলেমানুষিক হয়েছে।

এবার অরবিন্দ আরও লজ্জায় অধোবদন।

উত্তর দিলেন, না না কি বলছেন আপনি? আপনার অনুবাদ সাহিত্যের প্রশংসাও তো খুব হয়েছিল। সেকালীন ইংরাজী পত্রিকা আপনার কবিতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু সে তো অপাত্রে দান হয়েছে অরবিন্দ। বিশ্বাস কর, তোমার কবিতার সঙ্গে পরিচয় থাকলে আমি কখনই সে লেখা ছাপাতাম না।

চলে গেলেন রমেশচন্দ্র।

কিন্তু অরবিন্দ?

এত প্রশংসা তাকে উদ্বেলিত করতে পারল না, পারল না তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে।

আসলে অরবিন্দ যে এই সব সাধারণ নিন্দা-প্রশংসার উত্তরে উর্দ্ধে।

ভূপাল চন্দ্র বসুও যথার্থ নির্বাচন করেছিলেন অরবিন্দকে।

বিন্দুমাত্র ভুলচুক্ হয়নি নীলকান্তমণির সন্ধান পেতে।

তাই নিশ্চিন্ত মনে বঙ্গীয় কৃষিবিজ্ঞানের উর্দ্ধতন রাজ কর্মচারী ভূপাল চন্দ্র বসু কন্যা মৃণালিনীদেবীকে সঁপে দিলেন অরবিন্দের হাতে।

বরোদায় থাকতেই অরবিন্দের বিয়ে হয়ে গেল।

ভূপাল বাবু আপন হৃদয়ের উদারতা আর বিদ্যানুরাগই করেছিলেন পাত্র নির্বাচনের মাপকাঠি। তাই তাঁর বিচার ভুল হয়নি তার নিজের মনের কাছে। অরবিন্দ যে যথার্থ মানুষ।

কিন্তু আর একজনের মন?

সেখানে ভূপাল বাবুর বিচার ঠিক রায় দেয় নি।

অরবিন্দের পাণ্ডিত্য আর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতকে যেমন লক্ষ্য করেছিলেন ভূপালবাবু অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে, তেমনি তারই অজান্তে কখন যেন এড়িয়ে গেছিল অরবিন্দের সংসার সম্বন্ধে ঔদাসীন্যে ভরা তার সাধনানিরত জীবনটি। আসলে একমুখী ভূপালবাবু অন্যদিক সম্পর্কে হিসেব-নিকেশ করবার অবসর পান নি আদৌ। হয়তো বা চান নি।

তাই অরবিন্দের প্রতি তার প্রথম রায় যেমন খাঁটি হয়েছিল, অরবিন্দ

যেমন বিশ্ববন্দিত হলেন; তেমনি তার সেই এড়িয়ে যাওয়া দিকটিতে তার মেয়ে মৃনালিনী হলেন স্বামী বিরহিণী। এখানেই ভূপালবাবুর বিচার অসম্পূর্ণ।

অরবিন্দ স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যপালন করেছিলেন যথাযথভাবে। সেখানে কাথাও ফাঁকি ছিল না। কিন্তু সব কর্তব্যপালন তিনি করতে পারেন নি, তারই অগোচরে সেখানে রয়ে গেছে অজস্র ফাঁক।

আসলে আগামীকালের বিপ্লবী ও মহাতপস্বীর পক্ষে ফাঁকটা সব সময় বুঝে ওঠা সম্ভবপর হয় নি।

ব্যক্তি জীবন নয় সমষ্টি জীবনই ছিল তার ভাবনা। সংসার নয় সমগ্র দেশেই তার ধ্যান ধারণা। দেশ যার কাছে বড়, ক্ষুদ্র সংসার তাকে টেনে রাখবে কি করে ?

পারেনি ধরে রাখতে অরবিন্দকে ক্ষুদ্র সংসার।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই।

আহ্বান শুনেছেন তিনি বাংলাদেশের।

তাই আর বরোদা নয়, বাংলার মাটি-মায়ের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি।

হলই বা বরোদা তার কর্মস্থল, না হয় তার জীবন ধারনের সাশ্রয় এখানেই। তাহলে বাংলাদেশের সঙ্গে তার কি তুলনা চলে ? না তুলনা করা যায় ? জননী জন্মভূমি যে তার মনোভূমি। নাড়ীর যোগ যে এখানেই ! সেই নাড়ীর যোগ ছিন্ন করা কি সম্ভব ? অস্বীকার করা যায় কি নেই মাটিমায়ের আহ্বান ? যায় না। মা ডাকছেন অথচ সন্তান সেই আহ্বানে সমস্ত দেহ মন সঁপে দিতে পারবে না মায়ের চরণ তলে এ ছেলে কেমন ছেলে ?

বাংলাদেশ ডাকছে। ডাকছে অরবিন্দকে।

অরবিন্দকে সে ডাকে সাড়া দিতেই হবে।

তোমার কলঙ্ক মুছে দেওয়ার দায়িত্ব তোমার যেসব ছেলেরা নিয়েছে আমিও তাদের পাশেই দাঁড়াব না।

কলঙ্ক !

হ্যাঁ, কলঙ্ক ছাড়া আর কি ?

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় হতেই এ কলঙ্কের

সূত্রপাত। শেষ স্বাধীন নবাবের পতনে পলাশীর প্রান্তরে শেষ স্বাধীন-রবি গেল অস্তাচলে।

কিন্তু সেদিন বৃটিশ সেনাধ্যক্ষ জানত এ পরাজয় শুধু সিরাজউদ্দৌলার নয়, এ পরাজয় শুধু বাংলার নয়—ঐ পরাজয় সারা ভারতের। তাই সেদিন দুর্যোগের মসীলিপ্ত মেঘখান শুধুমাত্র পলাশীর ভাগ্যাকাশ জুড়েই সীমাবদ্ধ রইল না—দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল সারা বাংলার আকাশ—সারা ভারতবর্ষের আকাশ। ভারতবর্ষ হল কলঙ্কিত। পররাজ্যগ্রাসী বৃটিশ বেনিয়ার বিরাট গহবরে স্থান পেল ক্রমান্বয়ে সারা ভারত। সচিত হল ভারতের কলঙ্কময় অধ্যায়।

কলঙ্ক ছাড়া এর আর ভিন্ন নাম দেওয়া যায় না।

সেদিন আমাদেরই ঘরশত্রু বিভিষণের দল ডেকে এনেছিল গোবিন্দপুর, সুতানটির লালমুখো বেনিয়াদের। সেনাপতি মীরজাফর, ধন-কুবের জগৎ শেঠ, রাজা রাজবল্লভ, উমিচাঁদ—এরা সবাই সেদিন ঘরশত্রু বিভীষণের ভূমিকা নিল। ব্রিটিশ বেনিয়া যারা শুধুমাত্র ব্যবসা করতেই আমাদের দেশে এসেছিল তাদের কাছে রাখল ঘৃণ্য প্রস্তাব।

তোমারা সিরাজের বদলে মীরজাফরকে সিংহাসনে বসানোর ব্যবস্থা করে দাও। বিনিময়ে তোমাদের প্রচুর অর্থ দেব।

সাবাস ঘরশত্রু বিভিষণের দল।

মীরজাফর সেদিন সিংহাসন পেল।

আর ব্রিটিশ বেনিয়ারা পেল প্রচুর উৎকোচ আর উপঢৌকন।

কিন্তু হলে কি হয়? ধোপে তা টিকল না। শুরু হল পালাবদল। মীরজাফরকে বিদায় নিতে হল খুব শীঘ্রই। মীরজাফর গেল, এল মীরকাসিম, আবার মীরজাফর।

বাংলাদেশ তখন নবাবীর ভাঙ্গাগড়ার খেলাই মেতে উঠেছে।

বাংলার গভর্ণর হয়ে এবারে এল ক্লাইভ। দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ হ'তে ফরমানও পেল ক্লাইভ। সুতরাং বাংলা-বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায় করার অধিকারও তার হস্তগত হল। বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে। আর এতে সাহায্য করলেন, দাক্ষিণ্য দেখালেন দ্বিতীয় শাহ আলম নিজেই।

ক্লাইভ প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হল সুচতুর হেস্টিংসের আমলে পৌছে। তার সঙ্গে দেশীয় রাজন্যবর্গ পেরে উঠলো না। সে ক্ষমতা তাদের ছিলও না। তাই জ্ঞাত সাম্রাজ্যবাদ ওয়েলেসলি ছলে বলে কৌশলে গ্রাস করে যেতে লাগল দেশীয় রাজ্যগুলো। কী চমৎকার কৌশল! অধীনতামূলক মিত্রতা! অধীনতা স্বীকার কর, মিত্রতা পাবে। বন্ধুত্বের সূত্রে তোমাকে বেঁধে নেব! বাঃ বাঃ বুদ্ধির তারিফ না করে কী আর উপায় আছে? পৌছে দিলে সামরিক সাহায্য। অধীনস্থ হল দেশীয় রাজ্যগুলো। তারপর ওরাই হল শিখণ্ডি। ওদের সম্মুখ ভাগে রেখে ওদেরই প্রতিবেশী শক্তিশালী রাজ্যগুলির উপর কঠিনতম আঘাত হানলে। আর তোমাদের এই প্রচণ্ড আঘাত সেদিন সহ্য করবার মত ক্ষমতা ছিল না হায়দরাবাদ, অযোধ্যা, তাঞ্জোর, সুরাট, কর্ণাটের সুতরাং ওরা তো বাধ্য হবেই ইংরাজশক্তির কুক্ষিগত হয়ে পড়তে। পড়েছিলও।

এল ডালহৌসী। লর্ড ডালহৌসী আর ও একধাপ উপরে। এবারে আর অধীনতা মূলক মিত্রতা নয়, একেবারে স্বত্বলোপ নীতি—একেবারে আড়াল আবডাল সরিয়ে ফেলা আর কি। সাঁতরা, সম্বলপুর, ঝাঁসি, নাগপুর এবার এই নূতন নীতির আওতায় এসে আপন অস্তিত্ব হারিয়ে ইংরাজদের অধীনে এল।

ভারত আজ ব্রিটিশ ভারতে হল রূপান্তরিত।

তারপর?

তারপর আর কি? দীর্ঘকাল একটানা সেই কলঙ্কময় অধ্যায়েরই টানাপোড়েন।

কিন্তু কত দিন আর সহ্য করা যায়?

সহ্যের তো একটা সীমা আছে।

এল আঠারশ' সাতান্ন। সাম্রাজের দেশ বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন কোরবার জন্য আমরা মরিয়া হয়ে উঠলাম।

শুরু হল ইংরাজ অপশাসনের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম গণবিপ্লব।

কিন্তু তোমরা—ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা? ক্ষমতায় তখন তোমরা মদমত্ত। ফলে স্বীকৃতি দিলে না একে গণ-বিপ্লব হিসেবে। বললে এ সিপাহী বিদ্রোহ। তা বল। তাতে আমাদের কি এসে যায়। তোমরা তো জানি কখনই একে

সংক্ষিপ্ত বিদ্রহে আখ্যা দিয়ে অধ্যায়ের ইতি টানা সম্ভব নয়—কারণ পরবর্তী কালে সারা ভারত জুড়ে যে গণ বিপ্লব শুরু হয়েছিল তার মূল প্রেরণা তো এই আঠারশ' সাতান্ন সালের বিপ্লবই। যাকে তোমরা সাময়িক বিদ্রোহরূপে নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছিলে?

এই সিপাহী বিদ্রোহই কিন্তু আমাদের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ।

আরও একটু গভীর ভাবে ঘটনাগুলি পরম্পরায় সাজাবার চেষ্টা কর মহানুভাব ব্রিটিশ। তাহলেই বুঝতে পারবে এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ।

তোমরা প্রভু সাজলে ভারতীয়দের।

একেবারে রাজ্যের গোড়াপত্তন হতে শুরু করেই নানা ফন্দি ফিকিরে সাম্রাজ্য গ্রাসের লালসাটাকে বজায় রাখতে একটার পর একটা দেশীয় রাজ্য গ্রাস করে চললে। যারা রাজ্য হারালেন, হারালেন স্বাধীনতা, তাঁরা মুখ বুজে তোমাদের এ অন্যান্য আচরণ চিরকাল সহ্য করে যাবেন এ কল্পনায় তোমাদের এল কী করে? সুতরাং দেশীয় রাজন্যবর্গ ইংরাজ বিদ্বেষী হয়ে উঠবেন এ আর বেশী কি! ওরা দীর্ঘকাল ধরে যে প্রবল ঘৃণা তোমাদের জন্য সঞ্চিত করে রেখেছিল মনে মনে তা-ই প্রকাশ্য বিপ্লবের রূপ নিল আঠারশ সাতান্ন সালের যুদ্ধে। সেদিন তোমাদের হটিয়ে দেওয়াই ছিল একমাত্র লক্ষ্য।

উত্তর ভারতের সর্বত্র বিপ্লব। নানা সাহেব, তাঁতিয়া তোপী, রাণী লক্ষ্মীবাঈ সবাই নেতৃত্ব দিলেন। সংগ্রাম চলল প্রায় একবছর।

বিপ্লবের এমন একটা পর্যায় এল যে জাতীয় বাহিনী সেদিন দিল্লীর মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্থানের বাদশাহ বলে ঘোষণা করতে দ্বিধান্বিত হয়নি বিন্দুমাত্র।

কিন্তু কপাল আমাদের মন্দ তাই নেতৃত্বের বড় অভাব, বড় অভাব সংগঠনের।

সুতরাং নির্মূল হয়ে গেল সিপাহীদের জয়ের আশা।

বিপ্লবীরা? তোমাদের চোখে বিদ্রোহী। সুতরাং পেল সুকঠোর শাস্তি।

স্বাধীনতা আমরা পেলাম না। কিন্তু ভারতের কোম্পানীর রাজত্বের মেয়াদের হল শেষ। ভারতের শাসন ভার হল হস্তান্তরিত।

শুধু একটি মাত্র ঘোষণা।

এবারে শাসন ভার গ্রহণ করলেন স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী।

"ভারতবাসীর ধর্ম বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি, প্রাচীন আচার ব্যবহার এগুলোর উপর আর হস্তক্ষেপ করা হবে না।"

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এ বাণী প্রচারিত হল ব্রিটিশ ভারতে। আর আমরা? ভারতীয়রা? ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা লাভের যে স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলাম সেই স্বপ্ন টুটে গেল আশ্চর্য্য। আমরা অনায়াসে আমাদের মূল লক্ষ্য হ'তে সরে এলাম। আসলে সেদিন 'ভারত শাসন আইন' আমাদের কাছে মনে হয়েছিল ঘুমপাড়ানি গান।

কিন্তু এতো মরণ-ঘুম নয়।

কিন্তু আর সরে দাঁড়াতে রাজী নই।

তাই যারা প্রগতিপন্থী তারা দাবী তুললেন, শাসনতন্ত্রে অংশ গ্রহণের সুযোগ চাই।

গঠিত হল: ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়া লীগ—আর সকলেরই লক্ষ্য একই। শাসনতন্ত্রে অংশ চাই।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ মোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাই যেদিন ভারতসভা নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন সেদিন ইংরাজ শাসকগোষ্ঠিরও টনক নড়ল। ওরা বুঝল রাষ্ট্রবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করার জন্য জাতীয় আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে রাষ্ট্র-বিপ্লব।

ভয় পেয়েছিল ইংরাজ।

তাই আন্দোলনের গতিটাকে এক নিয়মতান্ত্রিক ছকে ফেলতে চাইলে ওরা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাও চালাল এই ব্যাপারে প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরাজ। যে কোন মাশুলেরবিনিময়েই হোক না কেন, ছলে বলে কৌশলে ভারতে আন্দোলনের গতিকে ভিন্ন মুখী করে তুলতেই হবে।

সেদিন ইংরাজ সরকারের এ চেষ্টায় ঘাটতি রইল না বিন্দুমাত্রও।

ভারতের গভর্ণর জেনারেল হয়ে এলো লর্ড ডাফরিন। ধূর্ত ডাফরিন ভারতবাসীকে মর্ফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়াতে চাইলো। তাই ভারতবাসীর মতামত জানাবার জন্য বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতবাসীকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নামে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বপক্ষে সম্মতি দিল।

'আঠারশ' পঁচিশ খৃষ্টাব্দে বাঙালী ব্যারিষ্টার উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি নির্বাচিত হলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের। শুরু হল প্রথম অধিবেশন।

কিন্তু বদান্যতা তোমাদের ব্রিটিশ শাসক!

সর্ত চাপিয়ে দিলে এই সভার উপরে।

বছরে একবারের বেশী এ অধিবেশন ডাকা চলবে না।

না-ই বা হল।

দেশের নেতৃবর্গ হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছে দেশের নানা অভাব অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ তো পাবেন, আবেদন তো জানাতে পারবেন। যদি সুরাহা করার থাকে তাহলে একবারের অধিবেশনই বা কম কিসে।

কিন্তু না কোন সুরাহা হয়নি।

আসলে কাগজে কলমে সম্মতি দান কাগজ কলমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেই সীমা হতে বের হয়ে আসা আর সম্ভব পর হয় নি!

তোমরা তো চাওনি আদৌ যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে কোন প্রকার জনমত গঠিত হোক।

তাই জনমত গঠন রোধ করাই ছিল সেদিন তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

এবারে কিন্তু আমাদের নেতৃবর্গ ভুল বুঝতে পারলেন।

আবেদন-নিবেদন কোন মহতী উদ্দেশ্য সফল সম্ভব হতে পারে না। ব্রিটিশ সরকারের বধির কর্ণে আবেদন-নিবেদন পৌঁছায় না। তা অরণ্যে রোদনেরই সামিল।

সুতরাং প্রতিক্রিয়া দেখা দিল নেতৃবর্গের মনে।

চরমপন্থা গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তাদের তাই একমাত্র লক্ষ্য হল: ভারত হতে ইংরেজকে হটাতে হবে। ইংরেজ সরকারের কায়েমী শাসন যন্ত্রটাকে বিকল করে তুলতে হবে।

সাড়া দিল দেশের তরুণ সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশী।

ওরা এখন ব্রিটিশ বিদ্বেষী।

স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে। আজ ওরা মরিয়া।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে পৌঁছে তাই শুরু হল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন।

বাংলা আর মহারাষ্ট্র এগিয়ে এল সর্বপ্রথম। ঐ দুটি দেশই হল আজ বিপ্লবের

কেন্দ্র স্থল !

বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল, মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়—এঁদের কেউ চাইলেন না ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আপোষে আসতে। আপোষ কোন মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতে পারে না। অতএব ওরা হলেন চরমপন্থী।

আর বাংলা দেখ? সন্ত্রাবাদীর পূণ্যভূমি তখন বাংলাদেশ।

লর্ড কার্জন উপলব্ধি করলো অত্যন্ত অনায়াসেই, বাংলাদেশ সন্ত্রাসবাদী দলের প্রধান ঘাঁটী। অতএব এই সন্ত্রাস বাদীদের ঘাঁটিটাকে ভেঘে তচ্‌নচ্‌ করে দিতে হবে।

কার্জন অজুহাত দেখালেন বঙ্গ ভঙ্গের প্রয়োজনীয়তাকে স্থাপন করতে গিয়ে। Partition of Bengal is a settled fact. বঙ্গ বিভাগ করবেই এই সেদিন ছিল তোমার ঘোষণা কার্জন। দুটি প্রদেশে ভাগ একটি পূর্ব প্রদেশ; আর পশ্চিম বাংলা, বিহার আর উড়িষ্যা নিয়ে অন্যটি।

কিন্তু আমরা মেনে নিতে পারলাম না তোমাদের ঔদ্ধত্য।

বিধাতার বিধানকেও বানচাল করবে এত ক্ষমতা তোমাদের এল কী করে ব্রিটিশ?

প্রতিবাদ জানাল বাঙালী। নেতৃত্ব দিলেন সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

We must unsette the fact.

আমরা বঙ্গ বিভাগ মানি না। ব্রিটিশের পরিকল্পনা আমরা ভেঙে গুড়িয়ে ফেলবই।

কারণ—এতো সত্যকথা বাংলা দেশের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে হবে। বাংলাদেশকে পঙ্গু করার জন্যই তোমরা, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সেদিন তোমাদের কূটনীতি ডিভাইড় এ্যাণ্ড রুল প্রয়োগ করলে।

কিন্তু আমরা তা মানব কেন?

তোমরা বাংলাদেশকে পঙ্গু করবে আর আমরা তাই নিরাপদে বসে বসে দেখব তা কি হয়?

সুতরাং শুরু হল জনমত সংগঠন।

কবি-সাহিত্যিক এগিয়ে এলেন দেশের দুর্দিনে। গ্রহণ করলেন নতুন ব্রত। রবীন্দ্রনাথ রাখি বন্ধনের মাধ্যমে বাঁধতে চাইলেন বাঙালীকে একসূত্রে। মন্ত্র হল, ভাই ভাই, একঠাঁই। সেই মন্ত্রেই তিনি গান বেঁধে দিলেন।

বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন,
এক হউক এক হউক হে ভগবান।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শেল সর্বভারতীয় রূপ।

বালগঙ্গাধর তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, লালা লাজপৎ প্রমুখ নেতারা নেতৃত্ব দিলেন এই সর্বভারতীয় আন্দোলনে। ভারতবাসীর কানে কানে মন্ত্রোচারিত হল, বন্দেমাতরম্। সমগ্র দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে স্বদেশী আন্দোলন।

বিলাতি বর্জন কর। বিলাত্তি কাপড় বয়কট কর। বিলাতি দ্রব্য পরিত্যাগ কর। সেদিন আন্দোলনকারীরা জানতেন বৃটিশবেনিয়াকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল করা অত্যন্ত সহজ। অন্ততঃ সে কৌশল তাদের জানা আছে।

সুতরাং শুরু হল পিকেটিং।

অফিস আদালত, মাদক দ্রব্যের দোকানের সামনে চলতে লাগল পিকেটিং পথে ধারে পুড়তে লাগল বিদেশী কাপড়ের স্তূপ।

কিন্তু তোমরা সেদিন ভয় পেয়েছিলে। প্রমাণ চাও ?

পার্লামেণ্টের সভ্য মিঃ ম্যাকলিন বললেন,

A resolution to boycot American goods has been passed and acten upon by China. But the Bengal resolution affects a much more extensive trade and is an alarming matter.

আর তোমাদের মর্নিং পোষ্ট পত্রিকার সম্পাদক ? তিনি তো লিখলেন,

The people of Bengal, buffled in all their Attempts to make their protest avail by other means have now united to adopt the method of Boycott, that particular weapon, and we are not among those who profess to smile at it.

কি বল অহঙ্কারী ব্রিটিশ, এই প্রমাণই কি যথেষ্ট নয় ?

কিন্তু তোমরা আমাদের উপকারই করেছিলে।

তাই রাখিবন্ধন উৎসব অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতে গিয়ে বাঙ্গালার আনন্দমোহন বসু অকুণ্ঠীত ঘোষণা করলেন :

Lord Curzon has done us indeed a singal service and emabled us to lay the priceless foundation of new national life. Our present troubles heard a new birth, we are going to see the birth of a new nation.

জন্ম নিল নতুন জাতি।

দুঃখের মাঝে হার মানব না—এই শপথে উদ্বেল এ জাতি।

বিদেশী শাসক বর্জন কোরব—বর্জন কোরব বিদেশী দ্রব্য, বিদেশী শিক্ষা।

এ শপথ গ্রহণ করল সেদিন বাঙালী। উন্মাদনা সেদিন সর্বত্র।

উন্মাদনা বরোদা নিবাসী অরবিন্দের মনেও।

ভারতের জাতীয় আন্দোলন প্রবর্ত্তক কি ভাবে তিনি করবেন এমন একটা ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছিল। ভারতবর্ষ পরাধীন। এ পরাধীনতার হাত হতে মুক্তি চাই। কি ভাবে তিনি ব্রতী হবেন এই ছিল তার একমাত্র ভাবনা।

এল উনিশ শ' পাঁচ।

লর্ড কার্জন বাংলাকে ভেঙ্গে দু'টুকরো করে দিতে চাইলে।

কিন্তু বাঙালী কথনই তার এ চাওয়াটাকে অনুমোদন করতে পারে না।

অনুমোদন করতে পারেও নি।

চঞ্চল হয়ে উঠলেন অরবিন্দ। রাজ সম্মান, মোটা টাকার মাস মাহিনা আর খ্যাতির মোহ তাকে ধরে রাখবে সে ক্ষমতা নেই। দুঃখিনী জননীর ক্রন্দন তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না।

দেশ তাকে ডাকছে আর তা উপেক্ষা করে যাবেন এও কি সম্ভব ?

পরাধীন জন্মভূমি—আর তিনি একা বসে রাজসুখ উপভোগ করবেন এ কথনও কি হয়, না হতে পারে ?

বরোদায় থাকাকালিন অরবিন্দ রচিত সাহিত্যই তার চিন্তাধারার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করে। স্বাক্ষর বহন করে স্বদেশ আর স্বদেশ প্রেমিকদের প্রতি তার ঐকান্তিক সহানুভূতি ও সমত্ববোধের কথা।

তাঁর Perseus the Deliverer কবিতায় দেবশক্তি আর দানব শক্তির যে সংঘর্ষ দেখানো হয়েছে তা তো শাসক জাতির উৎপীড়নে পীড়িত, নির্যাতিত শাসিত শ্রেণীর মর্মদাহ ছাড়া অন্য কিছু নয়। না, শুধু রূপক রচনা নয়, রাজনীতিক প্রবন্ধ রচনাও তিনি শুধু করলেন বরোদাতে থাকতেই।

আর রাজনীতিমূলক প্রবন্ধ লিখতে অরবিন্দকে প্রেরণা দিলেন বোম্বাই

হ'তে প্রকাশিত পত্রিকা 'ইন্দুপ্রকাশ'-এর সম্পাদক মণ্ডলীর একজন—কে, জি, দেশপাণ্ডে।

অরবিন্দের কাছে অভিন্নহৃদয় বন্ধু দেশ পাণ্ডের আবেদন।

তুমি আমাদের কাগজে লেখো অরবিন্দ।

আমি লিখব কি ?

হ্যাঁ, তুমিই লিখবে। এ আমার একান্ত অনুরোধ।

এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবেন এমন সাধ্য অরবিন্দের নেই। অতএব সর্ত আরোপ করে ব্যাপারটার নিষ্পত্তিতে আসতে চাইলেন তিনি।

বেশ লিখব। কিন্তু সর্ত, ছদ্মনামে লিখব।

দেশপাণ্ডে রাজী।

প্রকাশিত হল অরবিন্দের প্রবন্ধ।

News lamps for old—শিরোনামায় লিখে চলেছেন অরবিন্দ ক্রমাগত।

আর ইন্দুপ্রকাশ-এর পাঠকবর্গ ? ওরা ব্যগ্র হয়ে উঠল এমন রচনাবলীর লেখকের পরিচয় জানতে। কিন্তু অরবিন্দ রাজী নন।

তিনি শুধু লিখে চলেছেন চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী প্রবন্ধ নিয়ে।

ছুটে এলেন গোবিন্দ রাণাডে পত্রিকা অফিসে।

দেখা করলেন স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে। বন্ধ করুন এমন অগ্নিময়ী রচনা। শেষ পর্যন্ত আপনাদের রাজদ্রোহের অপরাধী হতে হবে।

রাণাডের কথায় এমন পত্রিকা-স্বত্বাধিকারী সতর্ক।

এবার অনুরোধ অরবিন্দকে।

ভাষাটা একটু নরম করুন। অন্ততঃ খাদে নামান খানিকটা তা না হলে হয়তো বিপদ আসবে।

কিন্তু কার বিপদ ? অরবিন্দের প্রশ্ন। পত্রিকা স্বত্বাধিকারী সম্পাদক মণ্ডলীর বিপদ না তার নিজের বিপদ ? নিজের জন্য ভাবনা নেই অরবিন্দের।

কিন্তু পত্রিকার সম্পাদক গোষ্ঠির জন্য ? তাদের জন্য তো ভাবতেই হবে।

অতএব শেষ সিদ্ধান্ত নিলেন অরবিন্দ। তিনি আর লিখবেন না।

আবার ছুটে এলেন দেশপাণ্ডে।

সে কি ! তুমি না লিখলে কাগজের প্রচার বন্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু কি লিখব ? প্রাণহীন কতগুলি শব্দ সমষ্টি সাজিয়ে গুছিয়ে প্রকাশ করে লাভ ?

লাভ তোমার না হোক। পত্রিকাটা তো বাঁচুক।

রাজী হলেন অরবিন্দ।

কিন্তু প্রাণের সাড়া নেই লেখায়। অতএব কতদিন আর লিখবেন? লেখা বন্ধ হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত আপনা আপনিই।

কিন্তু প্রাণের আবেগ রোধ করবে কে? তা কি রোধ করা যায়?

এল উনিশ শ' চার সাল।

অরবিন্দ যোগ দিলেন কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে।

তিনি একটা বিরাট আশা নিয়ে এসেছেন অধিবেশনে। সে আশা কিনা বাঁধল এ অধিবেশনে যোগ দিয়েই।

কংগ্রেসকর্মী ও নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে যে উৎসাহের জোয়ার তিনি লক্ষ্য করলেন তা দেখে অরবিন্দের বুঝি আনন্দের সীমা-পরিসীমা নেই।

মনের উৎসাহ আজ শতগুণে উৎসাতি।

পরবর্তী কাশীর অধিবেশনে তিনি যোগ দিতে পারলেন না।

কিন্তু রইল তার সদাজাগ্রত দৃষ্টি কংগ্রেসের কার্যসূচীর দিকে।

অরবিন্দ তখনও রাজনীতির ক্ষেত্রে যোগ দান করেন নি অথচ রাজনীতির বাইরে থেকেও আজ তার কাছে একটা বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট: কংগ্রেস আজ আর তার গতানুগতিক খাতে বইছে না। কংগ্রেস ক্রমান্বয়ে দুইভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের একটা বিরাট অংশ সেদিন অত্যন্ত সহজেই যেন অনুভব করেছিলেন আবেদন-নিবেদন অনুরোধ আর সমস্যা নিয়ে নানা জল্পনাকল্পনা কখনই তাদের চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে না। এগুলো নিছক প্রহসন! অতএব চরমপন্থী হতে হবে ওদের। স্বাধীনতা কি কখনও ভিক্ষায় মেলে? স্বাধীনতা অর্জন করে নিতে হবে। ভিক্ষালব্ধ সম্পত্তি আর উপার্জিত বিত্তের মধ্যে যে ব্যবধান। অতএব চরম পন্থী হয়ে উঠলেন তারা।

সিদ্ধান্ত নিলেন ওরা: ভারতের বুক হতে ইংরাজ জাতকে একেবারে ঝাড়ে নির্মূল করতে হবে বিশেষত: শাসক গোষ্ঠিকে। ওদের উচ্ছেদ সাধন করতে না পারলে স্বাধীনতা অর্জন কখনই সম্ভব না।

সমাধিক সাড়া দিল সেদিন তরুণ সম্প্রদায়। ওরা আজ ব্রিটিশ বিদ্বেষী।

স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—তা যে কোন মূল্যের বিনিময়েই

হোক না কেন। আর সেই আকাঙ্ক্ষারই পরিণতিতে শুরু হল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন।

স্থাপিত হল গুপ্ত সমিতি। শুরু হল শক্তি-চর্চা আর অস্ত্র সংগ্রহ প্রচেষ্টা। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে—এ যেন তারই প্রস্তুতি পর্ব। মহারাষ্ট্র আর বাংলা হয়ে উঠলো আন্দোলনের প্রাণ কেন্দ্র।

বাংলার বিপিন চন্দ্র পাল, মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লাল লাজপৎ রায়—তাঁরা সেদিন বুঝেছিলেন ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠির সঙ্গে কোন আপসে আসা অর্থহীন। আপসে রফা করে আর যাই হোক না কেন স্বাধীনতা কখনই আসবে না। চরমপন্থা অবলম্বন ছাড়া সেদিন আর অন্য কোন পন্থা ছিল না ওদের সামনে।

তোমরা অবশ্য এদের প্রতি তাচ্ছিল্য ভরা দৃষ্টি নিয়ে তোমাদের অহঙ্কার আর অপশাসনের পরিচয় দিয়ে ঘোষণা করলে ব্রিটিশ শাসক, ওরা Terrorit।

কিন্তু লক্ষ্য করতে পারনি জাতীয় ধমনীতে সঞ্চারণকে।

অথচ একথা সত্য। যেমন সত্য তোমার সন্ত্রাসবাদী দলকে ভয় পাওয়া আর ভয় পেয়ে অযথা অত্যাচার আর নিপীড়ণের মাধ্যমে তোমাদের শক্তির ও মত্ততার পরিচয় দেওয়া।

অরবিন্দ অনুভব করেছিলেন, কি করে জাতীয় জীবনের ধমনীতে সঞ্চারিত হচ্ছে নতুন প্রাণ। তীক্ষ্ণধী অরবিন্দের সামনে তখন জাতীয় আন্দোলনের রূপ অত্যন্ত স্পষ্ট। যা ছিল তাঁর কল্পনায় তা-ই যেন বাস্তবে রূপ পাচ্ছে। একটা মানসিক চাঞ্চল্য অনুভব করলেন তিনি।

বাংলাদেশের আন্দোলনের মধ্যেই যে তিনি দেখতে পেলেন আপন কল্পনার বাস্তব রূপ পরিগ্রহের সম্ভাবনাকে।

অতএব আর দ্বিধা নয়, নয় সংকোচন। বৃথা নয় কালক্ষেপ বরোদায়। এবার বাংলা।

এই তো যথার্থ মরসুম।

অরবিন্দ মনস্থির করে নিলেন, কলকাতায় সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কলেজে চাকুরী নেবেন। চলে যাবেন বাংলার প্রাণ কেন্দ্র কোলকাতায়।

সুতরাং দ্বিধা নয়, দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলেন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কাছে।

শিক্ষা পরিষদ অবাক। অবাক স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, শ্রীহরেন্দ্র নাথ দত্ত।

অথচ দেশের এই মণীষীরা চেয়েছিলেন, কেরানী তৈরীর কারখানাকে বাদ

দিয়ে মানুষ তৈরীর বিদ্যালয় স্থাপন করতে। তারা সেদিন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন বিদেশী শাসকগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজগুলো কখনই দেশাত্মবোধে অনুপ্রেরিত হওয়ার শিক্ষা দিতে পারে না, শিক্ষা দিবে না।

সুতরাং দেশের তরুণশক্তিকে নতুনমন্ত্রে দীক্ষা দিতে হলে চাই নতুন স্কুল কলেজ নতুন পরিবেশ। নিজ জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ, জাতির প্রতি শ্রদ্ধা যদি জাগাতে না পারে সে শিক্ষা আদৌ শিক্ষা নয়।

চিন্তিত হলেন নেতৃবর্গ।

কিন্তু সমস্যাও যে অনেক। সমস্যা অর্থের, সমস্যা শ্রমের।

নেতৃবর্গের প্রথম আবেদন ব্যর্থ হল না।

এগিয়ে এলেন মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্য, জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী এগিয়ে এলেন রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিকও। এরা প্রত্যেকেই জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠান আয়োজন সুসম্পূর্ণ করতে দান করলেন, এক লক্ষ হিসেবে টাকা। অতএব প্রথম সমস্যার সমাধানে আজ নেতৃবর্গ খুশীতে উদ্বেল।

গঠিত হল : জাতীয় শিক্ষা পরিষদ।

আর এই পরিষদের অধীনে গড়ে উঠল বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন জিলায় জিলায় স্কুল।

কোলকাতা ও রংপুরে স্থাপিত হল জাতীয় কলেজ।

আর ঠিক তখনই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সামনে এল নতুন সমস্যা। কোলকাতার কলেজের জন্য একজন উপযুক্ত অধ্যক্ষ চাই। এই পদের দায়িত্ব যে অনেক ; উদ্দেশ্য যে মহান।

কোথায় পাবেন এমন যোগ্য শিক্ষা ব্রতী ?

অথচ শিক্ষা পরিষদ জানেন, তারা দেড়শো টাকার বেশী মাস-মাহিনা দিতে পারবেন না।

সুতরাং কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

আর সেই বিজ্ঞাপনের জবাবে দরখাস্ত পেশ করলেন অরবিন্দ।

একী ! বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষের দরখাস্ত। তিনি ভুল করেন নি তো। এক হাজার টাকার মাসমাহিনা ছেড়ে দেড়শো টাকা মাসমাহিনার তিনি কোলকাতায় আসতে চান। এ কী করে সম্ভব।

অনেক দ্বিধা আর অনেক অবিশ্বাস নিয়েই নির্বাহক সমিতি অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলেন।

অবাক ওরা সকলেই। দেশের স্বার্থের জন্য অরবিন্দ বিসর্জন দিচ্ছেন আপন স্বার্থ। কী বিপুল এ ত্যাগ!

কোথায় অপরিমেয় সুখ—কার্পেট বিছানো বরোদার জীবন আর কোথায় দৈন্যদশার ছেঁড়া মাদুর ছড়ানো বাংলার জীবন। কিন্তু কেন?

আসলে অরবিন্দ তখন চেয়েছেন ধ্যানমগ্ন জীবনকে কর্মক্ষেত্রে প্রসারিত করে দিতে।

একটা উপযুক্ত কালের অপেক্ষায় শুধু এতদিন তিনি ভারতীয় কাব্যসাহিত্যদর্শন নিয়ে, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা অবলম্বন করে ধ্যানমগ্ন হয়ে ছিলেন।

তাছাড়া আর কি?

তাই অত্যন্ত অনায়াসে ফিরিয়ে দিলেন বরোদার মহারাজের পত্র বাহককে। অথচ এই পত্র বাহক তো অরবিন্দের সামনে নিয়ে এসেছিল নতুন পদমর্যাদার নিয়োগ পত্র—বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষ হ'তে অধ্যক্ষ। নিয়ে এসেছিল আরও ঢালাও সুখের প্রতিশ্রুতি এক হাজারের বদলে দেড় হাজার টাকা মাস মাহিনা।

মুহূর্ত্তের জন্য বোধ হয় অরবিন্দ থমকে দাঁড়ান। একী কঠিন পরীক্ষা।

পদে পদে লোভ। পদে পদে এমন হাত ছানি। কর্মক্ষেত্র হ'তে সরে দাঁড়ানোর জন্য এত আকুলতা! কিন্তু অরবিন্দ হার মানবেন না।

প্রলোভন জয় করতে পারবেন না তিনি কি মাত্র তেমন ছেলে? মাটি-মার আহ্বানে তখন যে তার শিরা উপশিরা সাড়া দেওয়ার জন্য আকুল।

অতএব প্রত্যাখান কর মহারাজের এই অনুরোধ মেশানো আহ্বান। উপেক্ষা কর লোভের উপঢৌকন। না-ই হল।

দেড় হাজার টাকা নয় দেড়শো টাকাই এখন অরবিন্দের কাছে অনেক মূল্যবান মনে হল।

তার মায়ের এ সামান্য সামর্থকে উপহাস করবেন তিনি কোন মুখে? বন্দে মাতরম্।

বন্দেমাতরম্ পত্রিকা প্রকাশ করলেন বিপিন চন্দ্র পাল।

বাগ্মী বিপিন চন্দ্র পাল, তেজস্বী বিপিন পালকে তখন বাংলাদেশের মানুষ এক ডাকে চেনে। দেশের মানুষ জেগে উঠছে। সাড়া দিচ্ছে বিপিন পালের আহ্বানে।

বন্দেমাতরমের লক্ষ্য হল : দেশের মানুষের মনে নব চেতনার উন্মেষ ঘটানো।

দেশবাসী পেল শক্তি, পেল পথের সন্ধান এ পত্রিকা হ'তে। কিন্তু আরও যেন কিছু চাওয়ার আছে দেশবাসীর।

বিপিন চন্দ্র সিদ্ধান্ত নিলেন : অরবিন্দকে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় নিয়ে আসতে হবে। আপনি আমাদের বন্দেমাতরম্‌কে সাহায্য করুন, অরবিন্দ বাবু। অরবিন্দ রাজী হলেন।

থাক না কেন কলেজের অধ্যক্ষের গুরু-দায়িত্ব তবু অবসর তো আছে। সেই অবসর মুহূর্ত গুলোই তিনি ভরিয়ে তুলবেন বন্দেমাতরম্ এর কাজে যোগাযোগ রাখলেন, লিখবেন তিনি।

অরবিন্দো ভাবেন, শিক্ষাদানের ব্রত উদযাপন ছাড়াও আর একটি দায়িত্বও তিনি পালন করবেন। এ দায়িত্ব জাতীয় আন্দোলদের।

কিন্তু মানুষের ভাবনার সঙ্গে কার্য সম্পর্কিত হয়ে থাকবে সব সময়—এমন অভিপ্রেত বুঝি ভগবানের নয়।

অথচ কত সামান্য কারণ।

ব্রিটিশ পরিচালিত স্কুল হ'তে বিতাড়িত ছাত্রদের তিনি ভর্তি করতে চাইলেন। এই ছাত্রদের অপরাধ ? কেনই বা ব্রিটিশ-স্কুল ওদের বিতাড়িত করল ? ওদের চোখে অবশ্য ওদের মস্ত অপরাধ। ওরা স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে। ওরা স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ! কেউবা সরাসরি অংশ নিয়েছে, কেউবা সমর্থন জানিয়েছে। তাই ওরা অপরাধী। অরবিন্দোর স্বীকা করেন না ওদের অপরাধ।

অরবিন্দ মনে করলেন এই ছাত্রদের জন্য তার কলেজের দরজা খুলে দেওয়া দরকার।

কিন্তু টনক নড়ল কর্তৃপক্ষের।

কেনই বা নড়বে না।

জাতীয় কলেজ স্থাপিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা তো ছিল বিদেশী ধাঁচেই। অরবিন্দের এ শিক্ষায় আস্থা নেই। সেখানে শিক্ষা ধর্মকে সযত্নে এড়িয়ে চলে সেই শিক্ষা শিক্ষা-শব্দবাচ্য হ'তে পারেন। ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যই ধর্ম রক্ষার্থে, মানব জাতির কল্যাণর্থে। দেশের জন্য নিজের জন্যও যখন বাঁচতে শেখার শিক্ষা দেয় তখনইতো সার্থক-নামা।

অতএব শুরু হল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর ।

স্বাধীন অরবিন্দ স্বাধীনতা খুইয়ে চাকুরী করতে রাজী নন । টাকার জন্য তো তিনি জাতীয় কলেজের দেড়শ টাকার অধ্যক্ষ হন নি । সেজন্য তো বরোদার দেড় হাজার টাকার মাইনের অধ্যক্ষ পদ ছিলই ।

তার সমস্ত অন্তরাত্মা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল ।

ইস্তফা দিলেন তিনি কলেজের অধ্যক্ষের পদ হতে ।

ছাত্রেরা মর্মাহত । তাদের প্রিয় অধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ আর কলেজে তাদের সামনে এসে দাঁড়াবেন না ।

কিন্তু সবই তো ভাগ্যের নির্দেশ ।

বিদায় জানাতেই হয় একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও ।

উনিশ শ' সাত সালে বাইশে আগষ্ট কলেজের ছাত্রেরা অরবিন্দকে জানাল বিদায়-অভিনন্দন ।

অরবিন্দ শোনালেন প্রিয়ছাত্রদের নতুন কথা তার মনের আকাঙ্খার বাণী ।

তোমরা মহান্ হও । কিন্তু তোমাদের মহান্ হওয়া তোমাদের নিজেদের জন্যে নয়, তোমাদের আপন অহঙ্কারের পরিতৃপ্তির জন্য নয় । তোমাদের মহান্ হতে হবে দেশের জন্য, ভারতের জন্যে । দেশের সেবায় তোমরা আত্মনিয়োগ করবে, ভারতকে গৌরবান্বিত করার জন্য শপথ নেবে । মাকে বাঁচাতে হবে । মাকে সমৃদ্ধিশালী করাতে হবে এ-ই হবে তোমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য । আমার প্রতি নয় আমার আদর্শের প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধাই আমার কাম্য ।

আজ কলেজে রুটিন-জীবন নয় । এখন কলেজের বন্ধন হতে মুক্তি ।

এই মুক্তিই তো অরবিন্দের প্রকাশ্যে রাজনীতি করার সুযোগ এনে দিল ।

'বন্দোমাতরম্' এর সঙ্গে সবিশেষ জড়িয়ে পড়লেন তিনি ।

যোগ দিলেন পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীও ।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ঢেলে দিলেন উদ্যম ও কর্মদক্ষতা, অরবিন্দ দিলেন প্রতিভা ও সাধনা ।

'বন্দেমাতরম্' এখন আর ইংরাজী সাপ্তাহিক নয়, ইংরাজী দৈনিক ! অরবিন্দ এই দৈনিকের সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন ।

দেশবাসীর সম্মুখে জাতীয় আদর্শ তুলে ধরাই সেদিন ছিল অরবিন্দের আদর্শ ।

মধ্য পন্থী দল সৃষ্ট রাজনৈতিক অন্ধকার দূর করে জাতীয় অন্দোলনকে জোরদার করার ব্রত নিল 'বন্দেমাতরম্' ।

শিক্ষাবিদ পরিণতি পেলেন রাজনীতিবিদ। অরবিন্দ এখন জাতীয় আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত। শোনালেন দেশবাসীকে, আবেদন-নিবেদনে স্বরাজ আসতে পারে না জাতিকে আত্ম-নির্ভর হতে হবে।

স্বাধীনতার আদর্শ ঘোষণা করতে গিয়ে অরবিন্দ অকুণ্ঠিত চিত্ত। তাঁর বিশ্বাস ভারত স্বাধীনতা লাভ করবেই। সুতরাং ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বা নাম মাত্র রাজনীতিক সুবিধে লাভের সম্ভাবনা লক্ষ্য করে জাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ হতে সরে দাঁড়াবেন—অরবিন্দ এমন নীতি আর আদর্শ নিয়ে রাজনীতি শুরু করে নি।

অরবিন্দ জাতীয় দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। হাল ধরলেন কাণ্ডারী হয়ে। তিনি এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন অনায়াসে জনসাধারণের পাশাপাশি দাঁড়াতে হবে ওদের পাশে দাঁড়িয়ে দিতে হবে কর্মে প্রেরণা।

সুতরাং নির্দেশ দিলেন অরবিন্দ।

আন্দোলনের পুরোভাগে নেতৃত্ব গ্রহণের এ নির্দেশ। বাংলার জাতীয় দল সেদিনই উপলব্ধি করতে শিখল অরবিন্দের এ নির্দেশের তাৎপর্য।

জাতীয় দল ছড়িয়ে পড়ল ভারতের সর্বত্র।

প্রদেশে প্রদেশে গঠিত হল জাতীয় দল। নেতৃত্ব দিলেন তিলক, নেতৃত্ব দিলেন অরবিন্দ।

জাতীয় দলের সংগঠন শক্তি ভাবিয়ে তুলল কংগ্রেস নেতৃবর্গকে।

এ কী! জাতির দুর্দিনে দেশের এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় শুধুমাত্র নেতৃত্বের লড়াই। সামান্য নেতৃত্বের লড়াইয়ে সুরাট কংগ্রেস ভেঙে গেল।

অবশ্য অস্বীকার করা যায় না সুরাট কংগ্রেস জাতির পক্ষে একটি কলঙ্ক।

কলঙ্ক ছাড়া এর আর ভিন্ন নাম দেওয়া যায় না।

শুধুমাত্র নেতৃত্ব নিয়ে যে মতান্তর আর মনান্তর সুরু হল ত, সামলাতে শেষ পর্যন্ত পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হল। এতো কলঙ্কই।

কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ সুরাট অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে স্যার রাসবিহারী ঘোষের নাম প্রস্তাব করলেন। রাখতে চাইলেন তার নিজস্ব কয়েকটি বক্তব্য। কিন্তু কে শোনে কার কথা। চারদিক হতে উত্তেজিত জনতা ঘিরে ফেলেছে, তার কোন কথা আর শুনতে রাজি নয়। জুতো চেয়ার ছোড়াছুড়ি শুরু হয়েছে অধিবেশনে।

সুরেন্দ্রনাথ পালিয়ে গেলেন কয়েকজন বন্ধু ও স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যে।

এল পুলিশ। ভেঙে গেল অধিবেশন।

ছত্র ভঙ্গ করে দিল জনতাকে।

অরবিন্দ কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বসেছিলেন মঞ্চের এক পাশে।

সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনের শুরু হ'তে মারমুখী জনতা—পুলিশের হস্তক্ষেপ। কিন্তু অবিচল অরবিন্দ।

তার শুধুমাত্র ভাবনা, সুরাট কংগ্রেস ভেঙে গেল। ভগবানের এ-ই হয়তো অভিপ্রেত। কিন্তু কোন কিছুই অমঙ্গলের নয়।

সুরাট কংগ্রেসের এ খণ্ডযুদ্ধ যেন জাতির জীবনে নিয়ে এল বিরাট পরিবর্তন। জাতি আজ বুঝেছে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা—এ উপলব্ধি একেবারে মনেপ্রাণে।

সুরাট কংগ্রেস থেকে ফিরে এলেন অরবিন্দ।

শুরু হল পূর্ণ উদ্যমে কর্ম্মযজ্ঞে।

ভারতবাসীর কানে পৌঁছে দিতে হবে দেশ সেবার আদর্শ, স্বাধীনতার বাণী।

অথচ তিনি তো নেতৃত্ব চাননি, চাননি সুনাম, খ্যাতি। শুধু চেয়েছিলেন দেশের মঙ্গল, জাতি কল্যাণ।

বঙ্গ ভঙ্গ বাঙালীর ঘুম ভাঙিয়েছিল। বুয়র যুদ্ধ, রুশ জাপান যুদ্ধ, ইটালি আবিসিনিয়ার যুদ্ধ বাঙালী বিপ্লবীদের মনে সঞ্চার করেছিল নতুন প্রেরণা। রাশিয়া দিয়েছিল পথ নির্দেশ।

উনিশ শ' দুই সালেই বাংলাদেশে গুপ্তসমিতি গঠনের সূত্রপাত।

ঋষি অরবিন্দ সেদিন পরামর্শ দিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে সুদূর বরোদাতেই। সেনাবাহিনীর কর্মে ইস্তফা দিলেন যতীন্দ্রনাথ। ফিরে এলেন বাংলাদেশে। উদ্দেশ্য গুপ্ত সমিতি গঠন। সমিতির সভ্যদের অস্ত্র পরিচালনায় পারদর্শী করে তুলতে হ'বে।

সেদিন নেতৃবর্গ অত্যন্ত অনায়াসেই বুঝতে পেরেছিলেন ইংরাজকে এদেশ হ'তে অস্ত্র বলে বিতাড়িত করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। অত্যাচারের বদলে অত্যাচার বেত্রাঘাতের বদলে বুলেট। অথচ সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ আমাদের হাত হ'তে অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে। তুলে দিয়েছে কলম। আজ কলম ছেড়ে হাতিয়ার ধরার দিন সমাগত। পরাধীন জাতির সুখ স্বপ্ন ভাঙতে হ'বে জাগাতে হবে তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতিকে নির্বাসন দিতে হবে ওদের সুখ বিহ্বল-কল্পনার রাজ্য হতে। ওদের আজ উদ্ধত করে তুলতে হ'বে, নতুন মন্ত্র দিতে হবে দীক্ষা, আত্মদান ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই। হাসিমুখে জীবনের জয়গান গেয়ে, জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্যরূপে দলিত

মথিত করে অস্তমিত স্বাধীনতা সূর্য্যকে উদিত করতে হবে ভারতের উদয়াচলে।

মানিকতলা অঞ্চলে মুরারী পুকুরের এক বাগান বাড়ী বিপ্লবীদের আস্তানা হয়ে উঠল। বিপ্লবীদের হেড কোয়ার্টার্স। শুরু হল বিপ্লবীদের অনুশীলন।

সুরাট কংগ্রেস থেকে ফিরে এল অরবিন্দ জাতীয় দলের শক্তি বৃদ্ধিতে নিয়োগ করলেন তার সর্বপ্রচেষ্টা।

বৃটিশ সরকার ভাবলেন দলটাকে ভাঙতে হবে। প্রয়োগ করলো দমননীতি।

শুরু হল ধর-পাকড়। জাতিয় দলে বহু নেতাই তোমাদের রাজরোষের আওতায় পড়ে তোমাদের কারাগারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন।

এল উনিশ শ' সাত সালের সাতাশে জুন।

গ্রেপ্তার হলেন অরবিন্দ।

বন্দে মাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত। অতএব গ্রেপ্তার কর অরবিন্দকে।

যুগান্তর সাপ্তাহিকে প্রকাশিত 'কাবলী দাওয়াই' এর ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল বন্দে মাতরম্-এ। কিন্তু তোমরা কি ভাবতে পেরেছিলে সেদিন তোমাদের এত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে ?

ভাবনি। ভাবতে পাননি। তাই আদালতে অভিযোগ আনলে অরবিন্দের বিরুদ্ধে। তোমরা অভিযুক্ত করলে বন্দে মাতরম্ পত্রিকায় সম্পাদক অরবিন্দকে।

কিন্তু আদালতে প্রমাণ করতে পারলে না যে অরবিন্দই বন্‌দে মাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক। চেষ্টা তো কম করনি ?

শেষ পর্যন্ত বন্‌দে মাতরম্ কাগজের প্রথম উদ্যোক্তা, বিপিন চন্দ্র পালকে পর্যন্ত তোমাদের পক্ষ থেকে সাক্ষী মানলে। উদ্দেশ্য : বিপিন পালের কাছ হ'তে শুধু একবার জেনে নেওয়া অরবিন্দ ঐ কাগজের সম্পাদক। তারপর তোমাদের পায় কে ? অরবিন্দের শাস্তি সুনির্দ্ধারিত।

কিন্তু দেখতে পাওনি সেদিন বাঙালীর বুকের উন্মাদনা।

শুনতে পাওনি সেদিন অরবিন্দ প্রশস্তি।

সাবাস অরবিন্দ! বাংলামায়ের সুসন্তান অরবিন্দ তুমি ধন্য।

বাঙালী সেদিন বিপিন পালকে সরকার পক্ষের সাক্ষী মানায় চঞ্চল। কি করেন শ্রদ্ধেয় নেতা বিপিন পাল। কি বলবেন তিনি আদালতে? আদালতে যদি তিনি স্বীকার না করেন অরবিন্দ বন্‌দে মাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক তাহলে

সে শাস্তি তো নিজের মাথায় তুলে নিতে হবে। সুতরাং জন-হৃদয়-নেতা বিপিন পাল কি করবেন, কি বলবেন, সে দিকেই চেয়ে রইলে সেদিন দেশবাসী ?

অবশেষে এল নির্দিষ্ট দিন। আজ অরবিন্দের বিচার।

আদালত কক্ষ থেকে আদালত প্রাঙ্গন পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য। তিল ধারণের ঠাঁই নেই কোথাও। চঞ্চলতা নেই, নেই মুখতা। আছে শুধু দেশের দুই নেতার প্রতি সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। একজন অরবিন্দ—অপরজন বিপিন পাল। একজন কাঠগড়ার আসামী অন্যজন সাক্ষী। সরকার পক্ষের সাক্ষী বিপিন পাল উঠে দাঁড়ালেন কাঠগড়ায়। ভাবলেন হীন ও মুখ।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষমান হাজার হাজার বাঙালী।

কি বলবেন দেশ বরেণ্য নেতা ? শুধু শোনার অপেক্ষা।

এগিয়ে এল সরকার পক্ষের কৌঁসুলী।

অরবিন্দ ঘোষকে আপনি চেনেন ?

চিনি। স্পষ্ট উত্তর।

আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন যে বন্দেমাতরম্ পত্রিকার তিনি সম্পাদক।

বিপিন পাল অবিচল।

নির্ভীক কণ্ঠে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলেন দেশ বরেণ্য নেতা চন্দ্র পালঃ

I have cocscientions Objcetion to take part or swear in these procenediogs.

সাধু! সাধু।

সত্যিই তুমি মহান প্রিয় নেতা তুমি বিপিন পাল।

সরকারের নেকনজর হতে রেহাই পেলে না তুমি। আদালতের আদেশ অমান্য করার অপরাধে তোমাকে অপরাধী হতে হল। মাথায় তুলে নিতে হল ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের শাস্তি। কিন্তু তুমি যে আর একবার দেশবাসীর অন্তরে পেলে শ্রদ্ধার অবিচল আসন—তা থেকে তোমাকে কেড়ে নেবে এমন সাধ্য অহঙ্কারী মূঢ় ব্রিটিশের কোথায় ?

অরবিন্দ মুক্তি পেলেন।

কিন্তু মুদ্রাকর অপূর্বকৃষ্ণ বসুকে রাজরোষের কবল থেকে বাঁচানো গেল না। পত্রিকায় সম্পাদকের নাম না রইলেও মুদ্রাকরের নাম তো ছাপানো ছিল। সুতরাং অপূর্বকৃষ্ণ বসুকে পেতে হল ব্রিটিশ বিচারকের নির্দেশে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড !

মুক্তি পেলেন অরবিন্দ।

আবার লেখা—আবার বক্তৃতা।

জাতীয়তার আদর্শ, স্বরাজ ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার তাকে করতেই হবে।

অরবিন্দ দেশবাসীকে দিলেন অগ্নিমন্ত্র।

স্বরাজ চাই। হিংসা পূর্ণ সশস্ত্র বিপ্লব নয়, আগ্নেয়াস্ত্র রক্তপাত নয়, প্রয়োজন শুধু নৈতিক বলবৃদ্ধির। স্বরাজ সত্য ও সংগত দাবি। এ দাবি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব করুণাময় ঈশ্বরের ইচ্ছায়। ঈশ্বরে বিশ্বাস আনতে হবে। সুতরাং নৈতিক শক্তি লাভ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কিন্তু অরবিন্দের এ মন্ত্রে জেগে উঠল দেশে দুর্বার তরুণ শক্তি। ওরা মুক্তি চায়। ওরা চায় এবারে পালাবদল।

নিষ্পেশন আর অত্যাচার অনেক সহ্য করেছে ওরা, আর নয়। এবারে জবাব দিতে হবে। উপযুক্ত জবাব! ব্রিটিশ পুলিশের নির্মম অত্যাচার ওরা আজ আর সহ্য করতে রাজী নয়। মারের জবাব দেবে মার দিয়েই, বেত্রাঘাতের জবাব দেবে বুলেটে।

যৌবন জলতরঙ্গ রোধ করার সাধ্য কার?

অরবিন্দ বুঝলেন দীর্ঘকাল ইংরাজ অপশাসনের ফলই দেশের তারণ্য শক্তির জাগরণ। অসন্তোষ বহ্নি অন্তরে ধূমায়িত হচ্ছিল এখন শুধু মাত্র অনুকূল পরিবেশ পেয়ে লেলিহান শিখার জ্বলে উঠতে চায় এ হুতাশন নির্বাপিত করার সাধ্য কোন শক্তিরই নেই।

বাংলার নানা স্থানে গড়ে উঠল বিপ্লবী দল।

নেতৃত্ব দিলেন অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

বিপ্লবীরা বুঝলেন আজ অ্যাকশন নেওয়ার উপযুক্ত সময় এসেছে। উল্লাসকর দত্ত গোপনে বোমা প্রস্তুত করছেন আর সেই বোমা পৌঁছে দিচ্ছেন বিপ্লবীদের হাতে?

বিভক্ত বাংলা দেশের দুই গভর্ণর—পূর্ববঙ্গে ব্যামফিল্ড ফুলার আর পশ্চিমবঙ্গ এণ্ড্রু ফ্রেজার—এরা দুজনেই আজ বিপ্লবীদের টার্গেট।

লাটসাহেব ফুলারের গ্রীষ্মাবাস শিলং।

বারীন্দ্র কুমার হাজির হলেন দুটো বোমা ও দুটো রিভলবার সঙ্গে নিয়ে শিলং মেদিনীপুর গুপ্ত সমিতি হতে হেমচন্দ্র দাসও এসেছেন। তিনি সঙ্গে রিভলভার এনেছেন। একেবারে পাকা বন্দোবস্ত।

কি ফুলারের ভাগ্য বোধহয় সুপ্রসন্ন। তাই ফুলার সেই দিনই শিলং ছেড়ে গৌহাটি চলে এসেছে একটা বিশেষ প্রয়োজনে।

বুঝতে পারলেন বারীন্দ্র, বুঝতে পারলেন হেমচন্দ্র শিলং-এ আর অযথা ফুলারের অপেক্ষায় সময় অপচয় করা অযৌক্তিক।

অতএব চল গৌহাটি।

কিন্তু হল না। গৌহাটি কোন সুবিধাই করে উঠতে পারলেন না বারীন্দ্র বা হেমচন্দ্র দাস। কিন্তু তারা ফুলারের ট্যুর প্রোগ্রাম পেয়েছেন অতএব শেষ পর্যন্ত ফুলার বধ বোধহয় সম্ভব হবে। তোমার নিস্তার নেই ফুলার।

পৌছালেন বরিশাল। বিধাতার অভিপ্রায় বোধহয় ভিন্ন রকম। তাই বরিশালের নেতাস্থানীয় ব্যক্তিরা ফুলার বধের বিষয়টাকে ভালোচোখে নিতে পারলেন না!

বারীন্দ্রকুমার বিতাড়িত হলেন বরিশাল হতে।

কিন্তু বাংলার যুব সম্প্রদায়কে ঠেকিয়ে রাখবে কে?

হেমচন্দ্র দাস আর প্রফুল্ল চাকী অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করলে ফুলারকে। ফুলার বধে সিদ্ধিলাভ করতেই হবে।

এলেন রংপুরে ওরা দুজনেই।

রংপুরে স্টেশনের এক প্রান্তে বোমা রাখা হল। উদ্দেশ্য গভর্ণর ফুলারকে নিয়ে যখন স্পেশাল ট্রেনখানি রেললাইনের উপর দিয়ে যাবে তখন বোমাও বিস্ফোরিত হবে—। আর? আর তাদের ফুলার বধে উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে ট্রেনখানি বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু ফুলার ট্রেনে এলেন না।

রংপুর হতে ষ্টিমারে গোয়ালন্দ রওনা হয়ে গেলেন ফুলার। তারপর গোয়ালন্দ হতে চলে যাবেন কোলকাতা।

ব্যর্থ হলেন হেমচন্দ্র দাস ব্যর্থ হলেন প্রফুল্ল চাকী।

কোলকাতা ছাড়া আর ফুলার বধ সম্ভব নয়।

ক্ষুণ্ণ মনে বাধ্য হয়ে রংপুর ছাড়লেন শেষ পর্যন্ত হেমচন্দ্র আর প্রফুল্ল। রওনা দিলেন কলকাতা অভিমুখে।

ফুলালের ভাগ্যই ফুলারকে সরিয়ে নিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত বিপ্লবীদের দেওয়া নিশ্চিত মৃত্যু উপহার হতে দূরে।

নৈহাটি পৌছালেন হেমচন্দ্র ও প্রফুল্ল।

কিন্তু এ কী। রেলওয়ে প্লাটফর্ম পুলিসে গিসগিস করছে কেন? কি ব্যাপার?

অনুসন্ধিৎসু ওরা দুজনেই। কিছু একটা রাজকীয় সমারোহ নিশ্চয়ই আছে।

ব্যর্থ হলেন ওরা। জানতে পারলেন অনুসন্ধান শেষ লাট সাহেবের স্পেশাল ট্রেন এখানে দাঁড়াবে। তাই এত সতর্কতা।

ব্যস্। ঐ তো সামনে সিদ্ধি।

সতর্ক হয়ে নেমে পড়লেন ওরা দুজনেই গাড়ি থেকে।

প্লাটফর্মের দক্ষিণ দিকের লাইনের ধার ঘেঁষে খানিকটা এসে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ওরা দুজনেই।

না কারও কোন সন্দেহের কারণ হন নি।

সন্দেহ করবেই বা কে?

ওরা যে দুজন অজ্ঞ গেঁয়োর ভূমিকা নিয়েছেন তখন।

এখন শুধু অপেক্ষা।

গত দুদিন পেটে একটি দানাও পড়েনি। পায়ের জুতো নেই, জামাকাপড় বিশ্রী ময়লা চুল দাড়ি সব মিলিয়ে চেহারার যা অবস্থা তাতে নিতান্ত পরিচিত-জনেরও ভুল হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু সেজন্যে দুঃখ নেই ওদের।

সামনে রয়েছে মহতী ব্রত। এ ব্রত উদ্‌যাপিত হলে এ পাওয়া না পাওয়ার দুঃখ রইবে না।

অস্ত্র প্রস্তুত করলেন এরা।

আসন্ন লগ্ন যেন বিফলে না যায়।

স্পেশাল ট্রেন কোলকাতার অভিমুখে যাত্রা করলেই চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়বেন।

তারপর

তারপর সুনিশ্চিত মৃত্য উপহার দিতে পারবেন ফ্লারকে।

নিখুঁজ পরিকল্পনা।

কিন্তু এ কী। অপেক্ষায় আর কাল গোনার যে আর শেষ নেই।

অবশেষে পাওয়া গেল আসল খবর।

স্পেশাল ট্রেন শিয়ালদহ এল না। হুগলির পুল পার হয়ে চলে গেল।

আবার ব্যর্থ হতে হল বিপ্লবীদ্বয় হেমচন্দ্র দাস আর প্রফুল্লকে।

ফুলার বধ সম্ভব হল না।

আবার এণ্ড ফ্রেজার। পূর্ববাংলা নয়, পশ্চিম বাংলার গভর্ণর এবারের লক্ষ্য। ফ্রেজার সাহেবের স্পেশ্যাল ট্রেন ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিলেন বিপ্লবীরা।

উনিশ শ' সাত সালের ছয়ই ডিসেম্বর নারায়ণগড়ে মাইন পাতা হল। এ মাইনগুলোও তৈরী করেছিলেন উল্লাসকর দত্ত।

মাইন পাতলেন বারীন্দ্র ঘোষ, বিভূতি ভূষণ সরকার ও প্রফুল্ল চাকী। মাইন পাতা হল। লাগান হল ফিউজ। টাইম ফিউজ। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে সরে এলেন ওরা তিন জনেই।

স্পেশ্যাল ট্রেন ফ্রেজারকে নিয়ে যথাসময়ে পৌছাল নারায়ণগড়ে।

মাইন বিস্ফোরণও ঘটল, স্পেশ্যাল ট্রেনখানাও দুর্ঘটনার মুখে পড়ল। অনেকগুলো রেলকামরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু ফ্রেজারের কাল তখনও পূর্ণ হয়নি। তাই বেঁচে গেল ফ্রেজার।

আর ব্রিটিশ শাসক তোমরা?

তোমরা তোমাদের শক্তির অহঙ্কারের পরিচয় দিতে কয়েকজন নির্দোষ রেল কুলি আর গ্যাং ম্যানদের গ্রেপ্তার করলে। ওরা যে অসহায়। তাই অসহায় ওদের উপর নেমে এল তোমাদের প্রচণ্ড নিপীড়ন।

কিন্তু যেদিন তোমরা বুঝতে পেরেছিলে পরবর্তীকালে, সেই মুরারী পুকুরের বিপ্লবীরা গ্রেপ্তার হলে, যে ঐ ট্রেন দুর্ঘনার মূলে এই বিপ্লবী দল, সেদিন বোধহয় একবার লজ্জায় নিজের শক্তির স্পর্দ্ধাকে ধিক্কার দিয়েছিলে তাই না?

হয়তো বা লজ্জাও পেয়েছিলে নিজেদের অপদার্থতার পরিচয় পেয়ে।

না, গভর্ণর বধ সেদিন সম্ভব হল না।

বহাল তবিয়তে বেঁচে রইলেন পূর্ব বাংলার ব্যামফিল্ড ফুলার, পশ্চিম বাংলার গভর্ণর এ ফ্রেজারও রইলেন নিরাপদ দূরত্বে।

বিপ্লবীরাও বুঝলেন, অত্যাচারীদের অত্যাচারের জবাব এবার সরাসরি দিতে হবে। প্রথম লক্ষ্য হল ম্যাজিস্টেট এ্যালেন!

উনিশ শ' সাত সালের তেইশে ডিসেম্বর ম্যাজিস্টেট এ্যালেন গুলিবিদ্ধ হল।

বিপ্লবীদের অব্যর্থ লক্ষ্য। শাসক শ্রেণীর অত্যাচারের জবাব দিতে গিয়ে বিপ্লবীদের হাত একেবারে জন্যও কেঁপে উঠল না অন্তরে এলনা বিন্দুমাত্র দ্বিধা।

আহত এ্যালেন। প্রাণে মরল না ঠিক, কিন্তু পঙ্গু হয়ে গেল এ্যালেন সারা জীবনের মতই।

এবারেও তোমরা ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ শাসক।

তোমার গুপ্তচর বাহিনী শতচেষ্টা সত্ত্বেও খুঁজে পেল না অত্যাচারীকে।

কিন্তু আমাদের হল বিরাট লাভ।

আমাদের নতুন বোধের উন্মেষ ঘটল।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তো বিপ্লবীনেতা অরবিন্দ বারীন্দ্রনাথকে বললেন, A revolver is much easiet than a bomb.

নতুন দৃষ্টি কোণ থেকে নেওয়া হল এবারের নতুন কার্যসূচী।

সিদ্ধান্ত নিলেন বিপ্লবী দল, ফরাসী মেয়র তার্ডিভেলকে হত্যার সিদ্ধান্ত। চন্দন নগরের এই মেয়রের কুকীর্তি তখন সমস্ত দেশ জুড়ে।

উনিশ শ' আটসালের এগারই এপ্রিল।

হেমচন্দ্র দাস, নিরাপদ রায়, উল্লাস কর, ইন্দু রায়, বারীন্দ্র ঘোষ, বিভূতি সরকার, আর নরেন গোঁসাই হাজির হলেন 'চন্দন নগরে। ওরা সশস্ত্র। প্রস্তুত হয়েই এসেছেন।

মেয়রের বাড়ির পাশের একটা গলি ধরে এগিয়ে এলেন ওরা। অপেক্ষা করতে লাগলেন একটা নির্দিষ্ট স্থানে লগ্নের আগমনের জন্য।

প্রথম নিরীক্ষণ, তারপর অ্যাক্শন।

মুহূর্তের জন্য ভুলচুক হওয়া চলবে না।

ভুল করলে ভুলের মাশুল বিপ্লবীদেরই দিতে হবে। উপস্থিত বুঝি হারানো মানেই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু।

অবশেষে এল শুভলগ্ন।

ইন্দুভূষণ বোমা ছুঁড়লেন তার্ডিভেলকে লক্ষ্য করে।

ফল কি হল দেখার অবসর নেই।

এখন পালানোর পালা।

পথ—আর পথে পা দিয়েই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সরে পড়তে হবে। অন্ততঃ সব সন্দেহ হ'তে শত যোজন দূরে পৌঁছে যেতেই হবে নিরাপদ সময়ের ব্যবধানে।

হলও ঠিক তাই।

ওরা গঙ্গা পার হয়ে চলে চন্দননগর থেকে শ্যামনগরে।

সেখান হ'তে ট্রেনে সোজা শিয়ালদহ।

আর তারপর ?

তারপর আবার নতুন প্রস্তুতি ! নতুন এ্যাকশন।

এবার তোমার পালা প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড।

অত্যাচার আর অন্যায়ের ঝুরিটা তুমি পূর্ণ করে ফেলেছ কিংসফোর্ড। এবার তোমাকে তোমার অপরাধের জবাব দিতে হবে বাংলার বিপ্লবীদের কাছে। বিপ্লবীদের বিচারালয়ে গৃহীত রায় অনুসারেই তোমাকে শাস্তি পেতে হবে কিংসফোর্ড।

কিন্তু তোমার অপরাধ সম্পর্কে তুমি কি সচেতন নও ?

বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বোধহয়।

তুমিই তো রাজদ্রোহের অপরাধে 'যুগান্তর' কাগজে বেশ কয়েকবার, 'বন্দেমাতরম' কাগজকে একবার, আর 'নবশক্তি' কাগজেও একবার রাজদ্রোহিতা অপরাধে অভিযুক্ত করলে।

আর 'বন্দেমাতরম্' এর শুনানীর দিনে আদালত প্রাঙ্গণে সমবেত উৎসুক জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে ই, বি, হুই—শ্বেতাঙ্গ পুলিশ ইন্সপেক্টর শুরু করল লাঠি চার্জ।

পুলিশের এ ঔদ্ধত্য সহ্য করতে পারেনি চৌদ্দ বছরের বালক সুশীল সেন।

কিশোর ছাত্র সুশীল সেন তাই নিল দৃঢ় পণ, ঐ শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্টকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েও ছিল সে। সিংহের বিক্রম আর অতুলনীয় মনোবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুশীল সেনের উপর। উপযুক্ত শিক্ষা দিল। কুকুরের জন্য লথার্থ মুগুরের ব্যবস্থা করল। কিল-চড়-ঘুষিতে পর্যুদস্ত করে তুলল সার্জেণ্টটিকে।

সমস্ত আদালত প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠল।

বন্দেমাতরম্।

তোমাদের চোখে এ ধৃষ্টতা।

ব্রিটিশ বিচারালয়ের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তোমাদের ভাষায় নেটিভদের এ আচরণ ধৃষ্টতা বলেই মনে হয়েছিল তোমাদের কাছে।

কিংসফোর্ডে নির্দেশ সুশীলকে গ্রেপ্তার করা হল।

বিচারও করলেন কিংসফোর্ড'ই।

তাকে পনের ঘা বেত মারবার হুকুম দেওয়া হল।

সুশীল মার খেল।

কিন্তু তোমরা সেদিন ভাবনি ব্রিটিশ শাসক এই মার আবার আবার পাণ্টা তোমাদের কাছে ফিরে আসবে।

বিপ্লবীরা প্রস্তুত হল উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্যেই।

'যুগান্তর' পত্রিকায় ঘোষিত হল শপথ বাণী :

পনেরো ঘা বেতের বদলে পনেরোটা বুলেট আমরা বেছে রাখলাম বিদেশী শাসকদের জন্যে।

এ কিন্তু কোন কথার কথা নয়, মর্ম উৎসারিত বাণী।

আর এই মর্ম উৎসারিত বাণী বাস্তবে রূপ দিতেই বিপ্লবী দল পাঠালেন ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকীকে। মজঃফরপুরে।

কিংসফোর্ড' মজঃফরপুরে এসেছে বদলী হয়ে।

সুশীল সেনের বেতের জবাব এবার কিংফোর্ডকে দিতেই হবে।

এল উনিশ শ' আট সালের তিরিশে এপ্রিল।

ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী কিংসফোর্ডের গাড়ী লক্ষ্য করে বোমা ছুড়লেন।

বুম্-ম্-ম্…

কিন্তু বেঁচে গেল কিংস্‌ফোর্ড।

সেদিন ক্লাব ঘর থেকে কিংস্‌ফোর্ডের গাড়ীটাই ফিরে এসেছিল। কিংসফোর্ডের পরিবর্তে গাড়ীতে ছিল দুজন ইউরোপীয়ান মহিলা—মিসেস কেনেডি ও তার কন্যা।

পালাল ক্ষুদিরাম, পালাল প্রফুল্ল। তাদের বোমা নিক্ষেপের ফলাফল না জেনেই।

কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।

ধরা পড়লেন দুজনেই।

প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়েই আত্মহত্যা করলেন। আর ক্ষুদিরাম? ব্রিটিশ বিচারক মিঃ কারণডফের রায় অনুসারে ফাঁসির হুকুম হল তার।

তৎপর হয়ে উঠল কোলকাতা পুলিশ।

থানা তল্লাসি আর গ্রেপ্তারের ব্যাপকতা দেখা দিল সর্বত্র।

শেষ পর্যন্ত কোলকাতা পুলিশ একটা বিশেষ সূত্র থেকে সন্ধান পেল মাণিকতলা অঞ্চলের মুরারিপুকুরের একটি বাগান বাড়ির। আসলে ওটা বোমার কারখানা।

অস্ত্রশস্ত্র সহ ধরা পড়লেন বারীন্দ্র কুমার ।

ধরা পড়লেন উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, কানাই লাল দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সত্যেন বসু ।

বারীন্দ্র কুমার স্বীকার করলেন, লাট সাহেব বধের প্রচেষ্টা তাদেরই । তারাই পাঠিয়েছিল ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্লচাকীকে মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে ।

না আর একটি কথাও নয় ।

বাড়তি কোন কথা বলে বিপ্লবের গতিকে রুদ্ধ হ'তে দিতে পারে না বাংলার দামাল ছেলের দল ।

কিন্তু ভীমরতি হল নরেন গোস্বামীর ।

মতিভ্রম ছাড়া আর কি ? তা না হলে রাজ-সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে কেন নরেন গোঁসাই ?

কেনই বা পুলিশের কাছে বলবে যে বীপ্লবীদের সঙ্গে অরবিন্দের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ।

আর পুলিশ কমিশনার যে 'এম্পায়ার' কাগজে বললেন, আমরা জানি এই হত্যা কাণ্ডের সঙ্গে কে বা কারা জড়িত, তাদের গ্রেপ্তার করা হবে খুব শীঘ্রই সেতো এই নরেন গোঁসাই-এর কথাও উপর ভিত্তি করেই ।

নরেন গোঁসাই এর কথার উপর ভিত্তি করেই অরবিন্দের গ্রে ষ্ট্রীটের বাসায় হানা দিল ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী মি ক্রেগান আর মিঃ ক্লার্কের নেতৃত্বে ।

প্রায় ছয় সাত ঘণ্টা যাবৎ অরবিন্দের বাড়ি থানা তল্লাসি চালিয়ে, ক্ষমতার অপব্যবহার আর অপপ্রয়োগ করে অরবিন্দকে নিয়ে আসা হল স্থানীয় থানা ঘুরিয়ে লালাবাজারে । আবার সেথান হ'তে রয়েড ষ্ট্রীট । গোয়েন্দা পুলিস দপ্তর ।

শুরু হল জিজ্ঞাসাবাদ ।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা শেষে একটি মূল প্রশ্নে ফিরে যাওয়া ।

মিঃ ঘোষ, আপনার ব্যক্তিগত যোগাভ্যাস আর সাহিত্য সাধনার জন্য মুরারী পুকুরের বাগান বাড়ির প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে স্বীকার করি । কিন্তু বোমা তৈরীর জন্য বাগান বাড়ী আপনার ছোট ভাইকে দেওয়া বোধহয় উচিত হয়নি ।

তীক্ষ্ণধী অরবিন্দ বুঝতে পারেন অনায়াসেই এই গোয়েন্দা পুঙ্গবটির আসল উদ্দেশ্য কী :

বাগানের আমার যেমন স্বত্ব রয়েছে, তেমনি সমান অধিকার রয়েছে আমার ভাইয়েরও। আমি বাগানের আমার ভাইকে বোমা তৈরীর সুযোগ করে দিয়েছি বা অনুমতি দিয়েছি এমন কথা আপনাকে কে বলল ?

জিজ্ঞাসাবাদ তেমন আর এগিয়ে নিতে যেতে পারে না। গোয়েন্দা পুলিশ। অতএব বৃথা রয়েড ষ্ট্রীটে অরবিন্দকে আটকে রাখা।

সন্ধ্যার পর ষ্ট্রীট থেকে আবার লালবাজার।

মিঃ হ্যালিডে প্রশ্ন করলেন অরবিন্দকে সরাসরি, বোমা তৈরী মত হীন কাপুরুষোচিত কাজে লিপ্ত ছিলেন বলে আপনার লজ্জা হওয়া উচিত—তাই নয়।

দপ্ করে জ্বলে ওঠেন অরবিন্দ।

তাই পাল্টা প্রশ্ন করলেন তিনি।

আমি এ কাজে লিপ্ত ছিলাম এ কথা মনে করার আপনি অধিকার পেলেন কোথায় ?

মিঃ হ্যালিডে তবু একবার চেষ্টা করলেন, ধরে নেওয়া নয়, সবই সত্য। সমস্ত ঘটনাই আমার জানা !

আপনার জানা, না-জানায় আমি আদৌ কৌতূহলী নই।

স্থিতধী অরবিন্দের স্পষ্ট উত্তর।

হ্যালিডে নির্বাক।

জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর আশা তখন নির্মূল।'

না। জিজ্ঞাসাবাদের কোন সুফল লাভ করতে পারলে না তোমরা।

তাই বিচার হল না। অথচ নির্জন কারাবাসের হুকুম দিল তোমার শাসনযন্ত্র।

একমাত্র উদ্দেশ্য, অরবিন্দের জীবন থেকে বাইরের সব যোগাযোগ ছিন্ন করে দেওয়া।

তোমাদের অহঙ্কার আর খেয়াল খুশী চরিতার্থ করতে চাইলে অহঙ্কারী ব্রিটিশ।

কিন্তু কোন কিছু বিফলে যায় না।

কোন কিছুই নয় ব্যর্থ।

ব্যথা যে কখনও কখনও ফুল হয়ে ফোটে সে মাহাত্ম্য উপলব্ধি কোরবার মত মন তো কোনদিনই ছিল না ব্রিটিশ-শাসক।

শুরু হল অরবিন্দের নির্জন কারাবাস।

উনিশ শ' আট সালের পাঁচই মে।

কিন্তু এতো কারাবাস নয়, এ যে বনবাস, আশ্রমবাস।

অরবিন্দ তো নিজেই লিখেছেন :

"অনেকদিন হৃদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবল চেষ্টা করেছিলাম। উৎকট আশা পোষণ করেছিলেন জগদ্ধাতা পুরুষোত্তমকে বন্ধু ভাবে, প্রভু ভাবে লাভ করি। কিন্তু সহস্র সাংসারিক বাসনার টান, নানা কর্মে আসক্তি, অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকারে তা দেখতে পারিনি।

"শেষে পরম দয়ালু সর্বমঙ্গলময় শ্রীহরি সেই সব শত্রুকে এক কোপে নিহত করে তার সুবিধা করলেন, যোগাশ্রম দেখালেন। স্বয়ং গুরু রূপে, সখা রূপে, সেই ক্ষুদ্র সাধন-কুটীরে অবস্থান করলেন।"

"সেই আশ্রম ইংরেজের কারাগারে।

"আমার জীবনে এই আশ্চর্য্য বৈপরীত্য বরাবর দেখে আসছি যে আমার হিতৈষী বন্ধুরা আমার যতই উপকার করুন…শত্রুই অধিক উপকার করেছেন। তাঁরা অনিষ্ট করতে গেলেন, ইষ্টই হল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কোপদৃষ্টির একমাত্র ফল, আমি ভগবানকে পেলাম।"

জেলখানায় দুঃখকষ্টের তো সীমা পরীসীমা ছিল না। যেমন কদর্য আহারের ব্যবস্থা, তেমনি পানীয় জলের অভাব আর জেলখানার মহার্ঘ বিছানার কথা না বলাই ভাল। অথচ এ কারাগার অরবিন্দের কাছে আশীর্বাদ, নির্জনতা মহিমাময়। নির্জনতার বিপুল বৈভব অরবিন্দ অনুভব করেছিলেন।

"এখানে ক্ষুদ্র ঘরের দেওয়ালে সঙ্গী স্বরূপ, যেন কাছে এসে ব্রহ্মময় হয়ে আলিঙ্গণ করতে উদ্যত হত।

"উঠোনের দেওয়ালের গায়ে একটি গাছ ছিল, কী নয়ন রঞ্জক ছিল তার নীলিমা, সেই নীলিমায় আমার প্রাণ জুড়িয়ে যেত।

"…ঘরের সামনে যে শান্ত্রী ঘুরে বেড়াত, তার মুখ যেন কতদিনের পরিচিত।

"ঘরের পার্শবর্তী গোয়ালঘরের কয়েদীরা ঘরের সুমুখ দিয়ে গরু চরাতে নিয়ে যেত। সেই গরু ও গোপাল ছিল আমার নিত্য দিনের প্রিয় দৃশ্য।

"আলিপুরের নির্জন কারাবাসে অপূর্ব প্রেমশিক্ষা লাভ করলাম। এখানে আসবার আগে মানুষের মধ্যে আমরা ব্যক্তিগত ভালবাসা অতি ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল এবং পশু পাখির দুঃখে আমার মনের উৎস থেকে কোন করুণাধারা প্রবাহিত হত না।

"…কিন্তু একি হল!

সকল শ্রেণীর জীবের ওপর এত মমতা কোথা থেকে এল?

গরু পাখি এমন কি পিপীলিকা দেখেও প্রাণে এত আনন্দের শিহরণ জাগে কেন ?"

এমার্সন সাহেবের অনুমতি পেয়েছিলেন অরবিন্দ।

বাড়ি হতে জামাকাপড় ও পড়বার বই আনিয়ে নিতে পারেন মিঃ ঘোষ।

চিঠি লিখলেন অরবিন্দ মেসোমশাই কৃষ্ণ কুমার মিত্রকে।

আমার জামাকাপড় ও পড়ার বইয়ের সঙ্গে গীতা ও উপনিষদ্ অবশ্যই পাঠাবেন।

বাড়ি হতে জামাকাপড় এল। এল গীতা ও উপনিষদ্।

নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গী পেলেন অরবিন্দ।

শুরু হল নতুন ভাবে জীবন-সাধনা।

তারপর একদিন আর কারাবাসের কষ্ট রইল না।

উপলব্ধি করলেন, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

ভগবানকে উপলব্ধি করলেন অন্তরে।

মনে প্রাণে আজ প্রশান্তি।

ভয় নেই, দুশ্চিন্তা নেই, গ্লানি নেই, আছে শুধু সচ্চিদানন্দ মহৎ আত্মার উপলব্ধি।

আলিপুর।

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বীচক্রফ্ট-এর এজলাস।

বিচার শুরু হল অরবিন্দের।

প্রায় একবছর পরে আজ যেন হঠাৎ বিচারের অবসর এসেছে ব্রিটিশ শাসক-গোষ্ঠির।

কে? লজ্জা?

না বিনা বিচারে আর দীর্ঘকাল অরবিন্দকে কারাগারে আটকে রাখার মত মানসিক শক্তির অভাব? কোন্‌টি ঠিক?

অযথা কাল হরণ করে চেষ্টাতো চালালো এতকাল ধরে অরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ আর সাক্ষী সাবুদ সংগ্রহে।

তোমরা শাসকগোষ্ঠি নয়কে হয় করতে জুড়ি-হীন।

কিন্তু কখনও কখনও এমন ছেলেমানুষী করে বস, একবারও ভেবে দেখনা—তোমাদের যুক্তি ধোপে টিঁকবে কিনা।

কি বললে? ছেলেমানুষি নয়?

বেশ তো আর একবার না হয় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে মিঃ নর্টনের কাণ্ডকারখানা অরবিন্দকে দোষী সাব্যস্ত করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার কথা।

কে নর্টন ?

কেন ? তোমাদের পক্ষের সরকারী কৌশুলি ব্যারিস্টার নর্টন।

নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কি বাদ রাখল নর্টন। মিথ্যা সাক্ষী সাবুদ থেকে শুরু করে, জাল চিঠি-পত্র যেমন দাখিল করল আদালতের কাছে তেমন আষাঢ়ে গল্পও কিছু কম ফাঁদে নি।

কিন্তু কি লাভ হল তাতে ?

শুধু দীর্ঘকাল ধরে মামলাটাকে ঝুলিয়ে রাখলে।

এই বুঝি তোমাদের সান্ত্বনা।

অরবিন্দ ভগিনী সরোজিনা দেবী অরবিন্দের আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত ব্যয় বহন করেছিলেন।

জন সাধারণের কাছে সরোজিনী দেবী আবেদন করেছিলেন। সে আবেদনে সাড়াও পেয়েছিলেন। চাঁদা উঠেছিল কুড়ি-বাইশ হাজার টাকা।

পি, মিত্র, জে, এন, রায়, হেমেন্দ্র মিত্র, শরৎ চন্দ্র সেন, নরেন্দ্র নাথ বসু প্রমুখ ব্যাটাস্ট্রাররা অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করলেন।

মামলা চলতে লাগল।

অর্থও খরচ হ'তে লাগল প্রচুর।

কিন্তু কতদিন আর তা সম্ভব ? দীর্ঘ মেয়াদী মামলা চালাবার ক্ষমতা আর তার রইল না। নিঃস্ব হয়ে পড়লেন তিনি।

শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন বাঘা বাঘা ব্যারিস্টাররা।

এবার কৃষ্ণ কুমার মিত্র প্রস্তাব করলেন, চিত্তরঞ্জন দাসকে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দিলে মন্দ হয় না।

কিন্তু বয়স যে ভীষণ অল্প। খুত খুত করতে থাকে ভূপাল বাবুর মনটা।

ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীকেই মামলার দায়িত্ব দিলেন ভূপাল বাবু।

কিন্তু কোন ফল হল না। নিরুৎসহ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীও। কাছে উদ্যমের বড় অভাব।

কৃষ্ণ কুমার মিত্র, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী—ওরা চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে দেখা করলেন।

আপনি এ মামলা পরিচালনার দায়িত্ব নিন। অবশ্য আপনাকে বেশী ফী দেওয়ার মত সমর্থ আমাদের নেই।

ভাবলেন চিত্তরঞ্জন। অর্থই কি তার জীবনের একমাত্র কামনার সামগ্রী? আর কিছু কি নেই? নেই দেশের প্রতি কর্ত্তব্য।

বললেন, ফী আপনাদের দিতে হবে না। আমিই এ মামলা পরিচালনা করব

অবাক! বিস্ময়ে হতবাক ওরা সকলেই।

চিত্তরঞ্জনের তখন মাসিক আয় প্রায় পাঁচহাজার টাকা।

সেই চিত্তরঞ্জন, ওকালতিই তার পেশা তিনি বলেন বিনা পারিশ্রমিকে মামলা পরিচালনা করবেন।

অবাক হবারই কথা!

চিত্তরঞ্জন এলেন অরবিন্দের মামলা পরিচালনা করতে।

মিঃ নর্টন দাখিল করলেন আদালত সকাশে অরবিন্দের লেখা একটা চিঠি। স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে অরবিন্দ লিখেছিলেন এ চিঠি: অনেকদিন যাবৎ তোমার নিকটে কোন পত্র লিখি নাই। ভগবান আমাকে যেখানে লইয়া যান সেখানেই যাই। এখন আমার নিজের কোন কাজ নাই, ভগবানের কার্যে আমি সর্বদাই ব্যস্ত আদেশ করেন আমি তাহাই করি, আমার নিজের কোন ইচ্ছা নাই। ঈশ্বর তোমাকেও দয়া করিবেন, তোমার পথ দেখাইয়া দিবেন। তুমি আমার সহধর্মিনী তুমি কি আমার কার্যের সহায় হইবে না?

"প্রতিদিন অন্ততঃ আধঘণ্টা ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন কর। তিনিই তোমাকে শক্তি দেবেন। আমার মন্ত্র সম্বন্ধে কাহাকেও বলা নিষেধ, এমনকি তোমাকেও বলা যায় না। তবে এখন আমি গুরুর আদেশ পাইয়াছি, এখন তোমার কাছে উহা ব্যক্ত করিব। তুমি ভিন্ন আর কাহাকেও একথা বলি নাই, বলিতে পারা যায় না। আমি আজ মাছ মাংস ছাড়িয়া দিয়াছি। বোধহয় জীবনে আর কখনও উহা স্পর্শও করিব না। কিন্তু ন-মাসি আমার কথা শুনিবেন কেন? এই জন্য আমি তাঁহার বাড়িতে উঠিতে চাই না—দেশের মুক্তির জন্য একমাত্র ব্রহ্মতেজই প্রয়োজন হইয়াছে।

চমৎকার তোমাদের যুক্তি ব্রিটিশ-শাসক।

মিঃ নর্টন বললেন, এ চিঠিতে অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয় এ চিঠি পড়লেই বোঝা যায় অরবিন্দ তার স্ত্রীকেও এই সমিতির নানা কার্যে যোগদান করতে অনুরোধ করছেন।

অথচ তোমরা কোথাও খুঁজে পেলে না এর মধ্যে ধর্মীয় ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল সমাধিক, সেই আকুতিই তো প্রকাশ পেয়েছে এ চিঠিতে।

চিত্তরঞ্জনের বক্তব্য, ওটা ধর্মীয় চিঠি। সেখানে রাজনীতির গন্ধ নিয়ে আসা অনভিপ্রেত।

যুক্তি দিলেন, ব্যাখ্যা করলেন হিন্দুধর্মের তাৎপর্য। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়ে দিলেন চিত্তরঞ্জন। ব্যাখ্যা 'ব্রহ্মতেজ'।

মিঃ নর্টন এবার দ্বিতীয় আর একখানা চিঠি দাখিল করলেন কোর্টে।

তার ভাষায় অমোঘ বাণ।

Dear Brother,

We must have sweets all over India, ready made for imergency. (cmergncy)

I wait here for your answer.

Yours,
Barindra Kumar Ghosh.

মিঃ নর্টন পড়লেন এ চিঠি।

স্পষ্ট তার বক্তব্যঃ চিঠিতে উল্লিখিত সন্দেশ বোমা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

চিত্তরঞ্জন বোধহয় ক্ষণিকের জন্য দ্বিধাচিত্ত।

তার পরেই তিনি তার বক্তব্য রাখলেন।

এ চিঠি জাল, মি লর্ড। পুলিস তার অসৎ অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য এ' চিঠি তৈরী করেছে। পুলিসের কথায় ধরে নেওয়া হয় বারীন্দ্র কুমার এবং অরবিন্দ দুজনেই তখন সুরাটে ছিলেন, তাহলে এমন একটা জরুরী চিঠি বারীন্দ্র ডাকে পাঠাবে কেন ?

মিঃ লর্ড, বারীন্দ্র কুমার সব সময় অরবিন্দকে সেজদা সম্বোধন করতেন, হঠাৎ এ চিঠিতে Dear Brother সম্বোধন করবেন এ কল্পনায় আনা যায় না।

তাছাড়া কোন বিপ্লবী কখনই এমন জরুরী চিঠিতে নিজের পুরোনাম লেখেন না হয়তো বা সংক্ষিপ্ত নাম বা কোন চিহ্ন ব্যবহার করে থাকেন। সেটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে বারীন্দ্র কুমারের পুরো নাম সন্দেহ জাগায় কারণ তা ওদের রীতি বিরুদ্ধ।

পুলিশের বক্তব্য, চিঠিখানা গ্রে ষ্ট্রিটের বাড়িখানা তল্লাসির সময় পাওয়া গেছে। যদি তা-ই হয় তাহলে অরবিন্দ তো এ চিঠি অনেকদিন আগেই পেয়েছেন। এমন একটা জরুরী অথচ সর্বনাশা চিঠি তিনি বিপ্লবী হয়েও নষ্ট

করবেন না সঙ্গে বয়ে বেড়াবেন প্রমাণ হিসাবে এমন কল্পনা বাতুল ছাড়া অন্য কেউ, করতে পারে না। কারণ সুরাটে তিনি এ চিঠি পেলেন যদি ধরে নেওয়া হয় তাহলে তারপর তো তিনি সুরাট থেকে এলেন বোম্বে—বোম্বে থেকে কোলকাতা, কোলকাতার স্কটলেন হ'তে গ্রে ষ্ট্রীট—এতগুলো স্থান পরিবর্তন, সত্বেও তিনি চিঠিটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরছেন এও কি সম্ভব ?

চিঠির মধ্যে দু-একটা বানান ভুল আছে। ধরা যাক এমারজেন্সী বানান, বারীন্দ্র কুমারের মত শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে এত সহজ বানান ভুল করা অসম্ভব।

চিঠি প্রাপ্তি সম্পর্কে পুলিশের অফিসারের সাক্ষ্যদানও অস্বাভাবিক। সুতরাং এ চিঠি জাল।

বিচারক মিঃ বীচ্ক্রফ্ট মানলেন চিত্তরঞ্জনের যুক্তি চিত্তরঞ্জন বললেন, রাজনীতি ক্ষেত্রে অরবিন্দ যেটুকু করেছেন তা বে-আইনী নয়। স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করেছেন অরবিন্দ। স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করেছেন অরবিন্দ। স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার কি কখনও বে-আইনী হতে পারে ? পারে না। দেশপ্রেম অপরাধ নয়

মিঃ বীচ্ক্রফ্টে মেনে নিলেন চিত্তরঞ্জনে যুক্তি।

একদিনের সহপাঠি মিঃ বীচ্ক্রফ্ট সহপাঠি অরবিন্দের বিচারকের আসনে বসে কিন্তু প্রশ্রয় দেননি কোন দুর্বলতা।

রায় বেরুল। প্রমাণিত হল অরবিন্দ নির্দোষ।

উনিশ শ' নয় সালের পাঁচই মে অরবিন্দ মুক্তি পেলেন।

মুক্ত ! মুক্তি ! মুক্তি !

এ মুক্তি নিজন কারাবাস হ'তে।

এ মুক্তি ভূমার উপলব্ধি শেষ।

দেশবাসী অরবিন্দের মুক্তিতে আনন্দের উদ্বেল।

কিন্তু সে আনন্দে সাড়া দিতে পারছেন না কেন অরবিন্দ ?

সে কী তার জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্কোচন লক্ষ্য করে।

নেতৃবর্গের অনেকেই ব্রিটিশ বন্দীশালায়, অনেকেই দ্বীপান্তরে।

এই নেতৃবর্গের কেউ কেউ বা সরে পড়েছেন আদর্শ বিসর্জন দিয়ে।

তিলক কারাগারে, কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখেরা নির্বাসনে দণ্ডে দণ্ডিত ; বিপিন চন্দ্র পাল বিলেতে। একমাত্র ডাঃ মুঞ্জে মতিলাল ঘোষ প্রমুখেরা জাতীয় দলের আদর্শ নিয়ে কোনক্রমে টিকে আছেন এখনও ?

আসলে সেদিন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার আর নিপীড়নের ভয়ে

দেশবাসী জাতীয় দলকে বা জাতীয় দলের আদর্শকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করলেও সরাসরি যোগ দিতে পারছে না সে আদর্শে। অংশ নিতে পারছেনা দেশ সেবায়।

জাতীয় দলের মুখপাত্র দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' অনেকদিন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। অরবিন্দ তখন কারাগারেই। সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে 'বন্দেমাতরম্' কবলে পড়ে আজ একেবারে নিশ্চিহ্ন।

অরবিন্দ চঞ্চল, অরবিন্দ বিহ্বল।

শুষ্ক খাতে কি করে তিনি নদীর পরিপূর্ণ যৌবন-উচ্ছলতা নিয়ে আসবেন? অথবা আসতে তো তাকে হবেই।

মন স্থির করে ফেললেন।

নতুন করে আবার কর্মযজ্ঞে ঝাঁপ দিবেন তিনি। গ্রহণ করবেন নূতন কর্মসূচী।

হৃদয়ে উপলব্ধ তত্ত্বজ্ঞান, নতুন ঐশীবাণী তিনি শোনাবেন দেশবাসীর কানে কানে।

সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে আবার জাতীয় আন্দোলন শুরু হ'বে।

হিংসা নয়, অহিংস ; কলহ নয়, প্রেম ; ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী দেশ সেবায় ব্রতী হওয়াই হবে এ নব আন্দোলনের মূল মন্ত্র !

তার নব নীতি প্রচারের বাহন হল 'ধর্ম' 'কর্মযোগিন' সংবাদপত্রদ্বয়—একটা বাংলা, অপরটা ইংরাজী।

কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশবাসী তখন বিভ্রান্ত।

ভারতের বড়লাট লর্ড মিণ্টো মর্লি-মিণ্টো সংস্কারের প্রবর্তন করলেন।

উনিশ শ' নয় সালের কথা।

কী দয়া ওদের !

ভারতের জনগণের শান্তি ব্যাহত। আর এই ব্যাহত শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যই এই মর্লি-মিণ্টো সংস্কার। ওদের চোখে যেন ঘুম নেই ভারতের জনগণের শান্তি ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত।

এই নব প্রবর্তিত সংস্কারে বলা হল, ভারতীয় জনগণকে শাসনকার্যে সহযোগিতার সুযোগ যোগ দেওয়া হবে।

আর তাতেই ভুলে বসল সব কিছু মধ্যপন্থী দল। সেকালীন রাজনীতির কর্ণধারেরা।

কিন্তু এর মধ্যেযে সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি সৃষ্টিকারী সর্বনাশা বীজ নিহিত আছে তা মধ্যপন্থী নেতৃবর্গের চোখ এড়িয়ে গেল।

সুরেন্দ্র নাথ বা গোখেলের মত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরও যেন অবসর নেই বিষয়টি সম্পর্কে তলিয়ে আলোচনা করার। এত শ্রম স্বীকার করবেনই বা কেন? বাইরের আপাততঃ মধুর সম্ভাবনা দেখেই ওরা বিমুগ্ধ।

নতুন শাসন-সংস্কার ভারতের কী মহৎ উপকারই না করল! উপকার নয়, স্বাধীনতা লাভের পথে একটা বিরাট অচলায়তন সৃষ্টি করলে তোমরা।

হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা হল।

সুতরাং হিন্দু হিন্দুর জন্য, মুসলমানের জন্য মুসলমান—এই বোধটুকু তো তোমরা জাগালে ভারতবাসীর মনে অত্যন্ত সহজেই।

এ-ইতো হল মর্লি-মিণ্টো সংস্কারের সোনার ফসল।

ভারতীয় জাতীয় শক্তিকে পঙ্গু করে দেওয়ার সহজ সুযোগ!

অরবিন্দ বুঝতে পেরেছিলেন এই সংস্কারের ত্রুটি।

অতএব তিনি চাইলেন, এই সংস্কারের ভাবী ফল সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে দিতে।

এ দায়িত্ব তাকে নিতেই হবে।

তিনি লিখলেন এ সম্পর্কে 'কর্মযোগিন্'-এ, লিখলেন 'ধর্মে' ও।

কিন্তু দুর্ভাগ্য অরবিন্দের!

দুর্ভাগ্য দেশবাসীর!

মধ্যপন্থী নেতৃবর্গ জনসাধারণকে সঠিক পথ খুজে পেতে দিতে চায়না তাই রাজনীতির কূট চক্রান্তে জনসাধারণ বিভ্রান্ত, কুয়াসাচ্ছন্ন।

ভেদনীতি সৃষ্টিকারী মর্লিমিণ্টো সংস্কারই আপাততঃ তাই সাধারণের কাছে মনে হল পরমার্থ!

কিন্তু কত কাল আর আফিমের নেশায় বুঁদ করে রাখা যায় মানুষকে।

খুব বেশীদিন সময় লাগল না মধ্যপন্থী দলের অপকৌশল ব্যর্থ করতে।

উনিশ শ' নয় সালের সেপ্টেম্বর।

কংগ্রেস প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন বসবে হুগলীতে।

মধ্যপন্থী নেতৃবর্গ খসড়া প্রস্তুত করলেন অধিবেশনের প্রস্তাবের।

কিন্তু এ কী!

এ যে জাতীয় দলের আদর্শের পরিপন্থী!

- প্রতিনিধি নির্বাচনে তরুণ সম্প্রদায় যোগ দিতে পারবে না।

আহা! কি জন-দরদ!

অরবিন্দ যেন নির্বাচিত হতে না পারেন সে চেষ্টাও কম চালালেন না মধ্যপন্থী নেতৃবর্গ।

এ কী অন্যায়!

অরবিন্দ কিন্তু সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে নির্বাচিত হলেন ডায়মণ্ডহারবার থেকে।

প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন অরবিন্দ।

ছাত্র-সম্প্রদায়কে, তরুণ সম্প্রদায়কে রাজনীতিতে যোগদানের জন্য আহ্বান জানিয়ে প্রচার পত্র ছাপালেন অরবিন্দ, একুশ বছরের গণ্ডিটা কোন বাধাই হ'তে পারে না।

হুগলীর জাতীয় দলকে নির্দেশ দিলেন তিনি, ছাত্রদের নিয়ে গঠিত স্বেচ্ছাসেবক দল অধিবেশনে যোগ দেবে। অভ্যর্থনা সমিতির নিষেধ কোন কারণেই মেনে নেওয়া চলে না।

অরবিন্দ আরও একটা দায়িত্ব দিলেন, অভ্যর্থনা সমিতি প্রচারিত প্রস্তাবের পাশাপাশি জাতীয় দলের প্রস্তাবও তিনি রাখলেন। ছাপালেন, পৌছে দিলেন জাতীয় দলের প্রতিনিধিদের হাতে।

আর তারপর?

তারপর প্রচার পত্র সহ জাতীয় দলের প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দিয়ে হাজির হলেন সম্মেলনে।

প্রচার পত্র বিলি করা হল সম্মেলনে।

প্রতিনিধি বর্গ কিন্তু এখন অরবিন্দের পক্ষে।

বিপুল সমর্থনে গৃহীত হল অরবিন্দের প্রস্তাবসমূহ।

আর মধ্যপন্থী দল?

ওদের জন্য রইল্ জনসাধারণের ধিক্কার বাণী।

দেশের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে অরবিন্দ বুঝতে পারলেন দেশবাসী এখন গভীর অবসাদে মগ্ন।

একদিকে বিপ্লব—ইংরাজ হটাও। আর অন্যদিকে শাসন কায়েম করার জন্য প্রচণ্ড দমন নীতি।

বরিশালের ঝালকাঠিতে বক্তৃতা করতে এসে অরবিন্দ বললেন,

"আমাদের স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্য—আমাদের জাতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ ধন, ধর্মকে

পাওয়া! স্বরাজ বলতে এই বুঝায় না যে, দেশবাসী ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, দেশময় সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করবে, বা বোমা রিভলবারে দেশ আচ্ছন্ন করে দেবে। স্বরাজ অর্থ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন বা অন্য কোন প্রকার শাসন-ব্যবস্থা নয়, আমাদের জাতির জীবনের পূর্ণতা লাভই স্বরাজের আদর্শ! হিংসার পন্থা এই স্বরাজের পথ নয়। শিক্ষা, বাণিজ্য, শিল্প, রাজনীতি, শাসন ব্যবস্থা—সবরকম জাতীয় অনুষ্ঠানেই আমাদের স্বদেশী মন্ত্র গ্রহণ করে জাতীয় বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখতে হবে। প্রত্যেক জাতি তার ন্যায্য অধিকার লাভ করবেই—এটা বিধাতার বিধান কোনও রাজশক্তির সাধ্য নেই সে বিধানে বাধা দেয়। নির্যাতন আসবেই, কিন্তু আত্মশক্তিতে আস্থাবান হয়ে সেই নির্যাতনে টিকে থাকবার মত শক্তি অর্জন করতে হবে।”

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তার আধ্যাত্মিক বাণী শোনার মত মানসিক প্রস্তুতি সাধারণের নেই।

অতএব আর কর্মক্ষেত্র নয়, এবারে গভীর সাধনা, নিজেকে গঠন করার সাধনা।

আশ্রম জীবন এখন অরবিন্দকে বড় বেশী আকর্ষণ করে।

না, এ আকর্ষণের পেছনে রাজনৈতিক ঝড় ঝাপটা কোন কার্যকরী ভূমিকা নেয়নি।

রাজরোষ তাকে রাজনীতি হ'তে দূরে সরিয়ে নিতে পারেনি।

তিনি তো মনে প্রাণে প্রস্তুতই ছিলেন, ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর দেওয়া যে কোন অত্যাচার আর নিপীড়ন সহ্য করার জন্য। প্রমাণ ?

প্রমাণ 'ধর্ম' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ।

"আমাদের পুলিশ বন্ধুগণ রচনা করিয়াছেন যে, আবার নির্বাসনরূপ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবে। এইবার নয় জন নহে, চব্বিশ জনকে—মোটরকারে রেলে Guide জাহাজে গবর্ণমেন্টের খরচে নানা প্রদেশ ও বিবিধ জেল ঘুরিয়া আসিবার জন্যে প্রস্থান করিতে হইবে। পুলিশের এই তালিকায় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ নাকি প্রথম নম্বর পাইয়াছেন।

আমরা কখনও বুঝিতে পারি নাই নির্বাসন এমন কি ভয়ঙ্কর জিনিষ যে, লোকে নির্বাসনের নাম শুনিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া দেশের কার্য, কর্তব্য, মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ পূর্বক কম্পিত কলেবরে ঘরের কোণে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িবে। চিদাম্বরম্ প্রভৃতি কর্মবীর বয়কট প্রচার অপরাধে যে কঠিন দণ্ড হাসি মুখে

শিরোধার্য করিয়াছেন, তাহার তুলনায় এই লঘু দণ্ড অতি অকিঞ্চিৎ কর।

বাহিরে পরিশ্রম করিতেছিলাম, নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে দেশ সেবা করিতেছিলাম; না হয় ভগবান লর্ড মিণ্টো ও মর্লিকে যন্ত্র করিয়া বলিলেন যাও, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক, নির্জনে আমার চিন্তা কর, পুস্তক পড়, পুস্তক লিখ, জ্ঞান সঞ্চয় কর, জ্ঞান বিস্তর কর। জনতায় থাকায় রস আস্বাদন করিতেছিল, নির্জনতার রস আস্বাদন কর।

ইহা এমন কি কথা যে ভয়ে কাতর হইতে হয়? কয়েকদিন প্রিয়জনের মুখ দেখিতে পাইব না—বিলাতে বেড়াইতে গেলের তাহা হয়, অথচ লোকে বিলাতে বেড়াইতে যায়। ধরুন অখাদ্য খাইয়া গ্রীষ্ম ও শীতে কষ্ট পাইয়া শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। বাড়িতে বসিয়াও রোগের হাত হইতে নিস্তার নাই; বাড়িতেও অসুখ হয়, মরণ হয়; অদৃষ্ট লিখিত আয়ুক্রম কেহ অন্যথা করিতে পারে না। আর হিন্দুর নিকট মরণে ভীষণতা নাই। দেহ গেল, পুরাতন বস্ত্র গেল; আত্মা মরে না। সহস্রবার জন্মিয়াছি, সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিব। ভারতের স্বাধীনতা না হয় স্থাপনা করিতে পারিলাম না, স্বাধীনতা ভোগ করিতে আসিব; কেহ আমাকে বারণ করিতে পারিবে না। এত ভয় কিসের? সস্তায় ইতিহাসের অমর নাম লিখাইলাম। স্বর্গের পথ উন্মুক্ত অথচ কষ্ট নাই। সামান্য শরীর-কেশে মুক্তি-ভক্তি পাইলাম। এইতো কথা। ট্রান্সভালের কুলিদের কহৎ ভাব শিক্ষিত লোকের এই জঘন্য কাতর ভাব দেখিয়া লজ্জিত হইতে হয়।"

ভারতের স্বাধীনতা আসবেই এ বিশ্বাস তিনি করতেন:

"চব্বিশ জনকে নির্বাসন করুন বা একশ জনকে নির্বাসন করুন, অরবিন্দ ঘোষকে নির্বাসন করুন বা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে নির্বাসন করুন, কালচক্রের গতি থামবার নয়।"

কালচক্রের গতিই হয়তো বা অরবিন্দকে নিয়ে চলল রাজনীতিক্ষেত্রে হতে বহুদূরে।

হয়তো বা তা-ই ভগবানের অভিপ্রেত।

উনিশ শ' সালের মার্চে কোলকাতা ছেড়ে যাত্রা করলেন অরবিন্দ উদ্দেশ্য চন্দন নগর। তারপর?

তারপর সেখান থেকে পণ্ডিচেরী।

৪ঠা এপ্রিল অরবিন্দে পণ্ডিচেরী এলেন। গেলেন তার যোগসিদ্ধির নির্দিষ্ট স্থানে।

আর কর্ম?

সে জন্য তিনি ভাবেন না। বিশ্বাস করেন তার কর্মের পরিধি হবে বাংলা ছেড়ে সারা ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ ছেড়ে সমগ্র পৃথিবী।

কিন্তু কেন চন্দন নগর ?

কেনই বা পণ্ডীচেরী ?

কোলকাতা পুলিসের ডি, এস, পি—গোয়েন্দাদলের সর্দার শামসুল আলমকে খুন কোরল বিপ্লবী দুই যুবক কোলকাতার হাইকোর্টের সিঁড়িতে একজন বীরেন দত্তগুপ্ত আর একজন রাজসাহির সতীশ সরকার।

আলিপুরের বোমার মামলার প্রধান তদবিরকার শামসুর আলম—তুমি চাইলে ইংরাজ সরকারের সুনজরে থেকে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে।

তোমাকে বিপ্লবীরা ক্ষমা করবে কেন ?

তুমি তোমার কর্তব্য করেছ মাত্র। আনুগত্য দেখানোই তোমার কর্তব্য। তাহ'লে বিপ্লবীরাও তাদের কর্তব্য নির্দ্ধারণ করে নেবেই না বা কেন ?

তখন আলিপুরের বোমার মামলার আপিল চলছিল হাইকোর্টে।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে শামসুল।

একটা যুবককে সিঁড়ির পৈঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে লক্ষ্যও করেছিল শামসুল।

কিন্তু অমন কত ছেলেই তো দাঁড়িয়ে থাকে এখানে ওখানে।

আমল দেয়নি শামসুল।

শামসুলে আয়ু তখন ফুরিয়ে এসেছে, আমল দেবেই বা কেন ?

গুলি চালান বীরেন।

দ্রাম।

একটি মাত্র গুলি।

তা ইহজন্মের শামসুলের আলিপুরের বোমার মামলার তদবির করার ফুরিয়ে গেল।

আর বীরেন ?

বীরেন তখন মরিয়া। তাই ভুলে গেছে সে তার পরবর্তী কর্তব্য।

সতীশ সরকার পূর্ব নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুযায়ী একটা ভাড়া করা গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে বীরেনের প্রত্যাবর্তনের জন্য শামসুলকে গুলি করার পর থেকেই।

কিন্তু মনে নেই বীরেনে কর্তব্য সমাধা শেষে পলায়নের কথা।

উত্তেজিত বীরেন ক্রমাগত গুলি ছুঁড়ছেই।

কিন্তু কতক্ষণ আর ?

গুলি ফুরিয়ে গেল অবশেষে। ধরা পড়ল বীরেন।

শুরু হল পুলিসি নিপীড়ন।

কিন্তু বীরেনের একই উত্তর, কিছুই বলল না।

বীরেনকে আনা হল আদালতে।

সেখানেও সেই একই উত্তর। কোন উত্তর দিতে রাজী নই ; তোমাদের যা ইচ্ছা শাস্তি দিতে পার।

আঠার বছরের বালক। জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। আদালতে দাঁড়িয়ে বিচরপ্রতি নিযুক্ত ব্যারিষ্টার নিশীত সেন, যাকে আসামীর পক্ষে জেরা করতে অনুরোধ করেছিলেন বিচারপতি, তাকে অনায়াসে ফিরিয়ে দিল বীরেন।

বীরেনের আজ কোন সাহাযোর প্রয়োজন নেই।

একমাত্র লক্ষ্য পূরণ হওয়ার সে যেন সকল চাওয়া-পাওয়ার উত্তরে।

বিচার হল রায়ও বেরুল। বিচারে বীরেনের ফাঁসি হল।

এ রায় অবশ্য সকলের জানা। তাই বিস্ময়ের কিছু নেই।

কিন্তু ব্রিটিশ পুলিস তখন সিদ্ধান্তে পৌছে, হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় অরবিন্দকে জড়াতে হবে। বাইরে বেশি দিন রাখা সমীচীন নয়।

ভগিনী নিবেদিতা এ খবর পেলেন কোন একটা সূত্র থেকে।

হাজির হলেন অরবিন্দের গ্রেষ্ট্রীটের বাসায়।

পালান দেরী করবেন না বিন্দুমাত্র !

হ্যাঁ, বিবেকানন্দের মানসকন্যা, লোকমাতা নিবেদিতাই সেদিনই পালাবার নির্দেশ দিলেন অরবিন্দকে।

বরোদায় প্রথম আলাপ হয়েছিল অরবিন্দ নিবেদিতায়।

নিবেদিতা বলেছিলেন, বাংলাই আপনার কর্মক্ষেত্র। কোলকাতায় আপনার ভীষণ প্রয়োজন।

অরবিন্দকে বলেছিলাম, কিন্তু আমার তো একমাত্র লক্ষ্য মানুষের মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলা। আমার কর্মক্ষেত্র তো প্রকাশ্যে নয়, নেপথ্য।

নিবেদিতা-অরবিন্দে বন্ধুত্ব স্থাপন হয়েছিল সেই ক্ষণে। দু'জনেই দুজনকে চিনতে পেরেছিলেন, একই তাদের ব্রত। একই মহৎ লক্ষে পৌছাতে হবে।

নিবেদিতা বললেন ; আমি আপনার দলের মানুষ। আপনার সহকর্মী। আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন অনয়াসে।

তাই অনায়াসে 'কর্মযোগীন্' প্রকাশনারভার নিবেদিতার উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি রওনা দিলেন চন্দননগর ছেড়ে পণ্ডিচেরী।

আশ্রম গড়ার দিকে মন দিলেন অরবিন্দ।

অরবিন্দের সঙ্গে এলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও বিজয়কুমার নাগ। আর তারই কিছু দিন পর নলিনীকান্ত গুপ্ত চলে এলেন, এলেন সৌরীন্দ্রনাথ বসুও।

কিন্তু আশ্রম গড়তে চাইলেই তো আর রাতারাতি তা গড়ে ওঠে না।

বাধাও এল প্রচণ্ড। আশ্রম গড়ার অন্তরায় হল দু'টি।

প্রথম অন্তরায় আর্থিক।

আশ্রম তৈরী করে সেই আশ্রমে সুষ্ঠভাবে চালাতে তো বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এ বিপুল অর্থ তিনি পাবেন কোথায়?

অরবিন্দ আর্থিক অভাবের কথা ভাবেন না। তিনি জানেন, তিনি শুধু কাজ করবেন। আর ভাবনা ভাববেন তিনিই যাঁর প্রেরণায় তিনি কর্মযজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন।

কী আশ্চর্য!

আর্থিক অস্বচ্ছলতাও বন্ধ হল না আশ্রমের গঠন কাজ। টাকা আসতে লাগলো আশ্রমে। কেউ বা স্বেচ্ছায়, কেউ বা দৈব প্রেরণায়, কেউ বা অরবিন্দের ব্যাক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েই—সাহায্য করতে লাগলেন অরবিন্দের গঠন কার্যে।

অর্থ সাহায্য এসে পৌছাল অযাচিত ভাবেই।

আর দ্বিতীয় অন্তরায় ছিল ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের হায়েনা চোখ।

ওরা সতর্ক। ভয়: হয়তো অরবিন্দ ব্রিটিশ রাজত্বের বাইরে ফরাসী রাজত্বের অধীনস্ত পণ্ডিচেরীতে বসে গোপনে গোপনে বিপ্লবটাকে জীইয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। ওদের বিশ্বাস, অরবিন্দে পক্ষে আন্দোলন চালানো সুবিধাই হবে ব্রিটিশ রাজত্বের বাইরে এসে।

এমন কি তোমার বদান্যতায় পত্রিকার মুদ্রাকর মনোমোহন ঘোষের ছয় মাসের কারাদণ্ডের আদেশও বের করলে নিম্ন আদালত হ'তে। কিন্তু তা ধোপে টিকিল না।

হাইকোর্টে আপীল করা হল। আর অত্যন্ত সহজেই প্রমাণ করা গেল তোমাদের ভাষায় রাজদ্রোহীমূলক প্রবন্ধটা আদেশ রাজদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী নয়।

তাই বাধ্য হলে মনোমোহন ঘোষরে মুক্তি দিতে।

হার মানলে অরবিন্দের প্রচারিত আদর্শের কাছে।

উনিশ শ' ছাব্বিশ সাল। ছাব্বিশে নভেম্বর ॥

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে শ্রীঅরবিন্দ।

আর আশ্রমের গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ নয় এবারে শুধু নির্জন সাধনা।

আশ্রম পরিচালনা সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ল মীরা রিচার্ডের উপর। একজন ফরাসী বিদূষী।

কিন্তু বিচিত্র জীবনের অধিকারিণী মীরা রিচার্ড অরবিন্দ প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিচেরী আশ্রমের সব দায়িত্বেই আপনার মস্তকে তুলে নিলেন।

আর তিনি নতুনভাবে পরিচিত হলেন আশ্রমবাসীদের কাছে। ভারতবর্ষ তাকে জানাল নতুন রূপে। বিশ্ব তাকে জানাল নতুন নামে।

মীরা রিচার্ড আজ পণ্ডিচেরী আশ্রমের শ্রীমা।

অরবিন্দ সাধনার সিদ্ধিলাভ করেন ?

কিন্তু সাধনার লক্ষ্যটি ?

যে সম্পর্কে তিনি তার মা বইয়ে লিখেছেন :

'অতি মানস রূপান্তর নিয়তি হয়ে আছে; পৃথী চৈতন্যের ক্রমবিবর্তনে তা অনিবার্য কারণ এই চেতনার উর্ধ্বমুখী শক্তি শেষ হয় নাই ; মন তার সর্বোচ্চ শিখর নয়। পরিবর্তনটি যাতে আসতে পারে, রূপ গ্রহণ করতে পারে চিরস্থায়ী হতে পারে সেজন্য প্রয়োজন। প্রথম অধঃ হাতে আহ্বান এবং সেই সাথ উর্ধ্বের জ্যোতিঃ যখন এসে প্রকট হয় তখন তাকে অস্বীকার না করে স্বীকার করবার দৃঢ় সংকল্প আর প্রয়োজন, উপর হতে ভগবানের অনুমতি। যে শক্তি উর্ধ্বের অনুমতি আর নিম্নের আহ্বান এই দুয়ের মধ্যবর্তী হয়ে উভয়ের আদান-প্রদান ঘটায় তাই ভাগবান জননীর সত্তা ও শক্তি কোন মানবীর প্রয়াস বা তপস্যা নয়, এক মায়েরই শক্তি আয়রণ-খানি ছিন্ন করতে পারে। আধারকে গড়ে তুলতে পারে, সত্যজ্যেতিঃ, দিব্য জীবন, অমরের আনন্দ।

অরবিন্দ চেয়েছিলেন আধ্যাত্মিক বিপ্লব।

এখানেও তো অরবিন্দ বিপ্লবী। রাজনৈতিক বিপ্লবের তুলনায় এ বিপ্লব কোন অংশে কম ?

কিন্তু কেন এই আধ্যাত্মিক বিপ্লবের ভাবনা ?

বারীন্দ্র কুমার তো লিখেছিলেন অববিন্দ সম্পর্কে, দেবতা নন, অনেক পিটিয়ে শানান লোহা।

দেবতা তো কেউই নন, তবে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই দেবতা

আছেন, তাঁকে প্রকট করে তোলাই তো দেব জীবনের লক্ষ্য। তা সকলেই করতে পারে।

বিশ্বাসই বোধহয় অরবিন্দকে ঠেলে দিয়েছিল আধ্যাত্মিক বিপ্লবের পথে।

অরবিন্দ নিজেই লিখেছেন :

ভগবান তাঁর জগৎকে এমন দারুণ হাতুড়ী পেটা করেন কেন, ময়দার তালের মত তাকে দলেন পেষেন কেন, কেনই বা তাকে এতবার রক্তস্নান করান প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন ?

কারণ সমষ্টি হিসাব সাধারণ মানুষ এখনও যেন একটা কঠিন মলিন্ হীন খনিগর্ভস্থ ধাতু—তাকে গলাতে হলে, এছাড়া কোন উপায় নাই। যেমন তাঁর উপকরণ তেমনি তার কর্মপদ্ধতি। উপকরণ শুদ্ধতর মহত্তর পদার্থে রূপান্তরিত হওয়ার জন্যে উন্মুখ হোক তবে তার সাথে ভগবানের ব্যবহার রীতিও হবে মৃদুতর মধুরতর তার মহত্তর ও সুন্দরতর, সার্থকতাও তাদের আসবে।...

মানুষ একবার যদি আধ্যাত্মিক হয়ে উটতে সম্মত হয়, তবে সব পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু তার মনোরম প্রাণময়-প্রকৃতি উর্দ্ধতর ধর্মের বিরোধী। সে আর অপূর্ণতাকেই ভালবাসে।

তিন রকম বিপ্লবের সঙ্গে জগতের পরিচয়, স্থূল ভৌতিক বিপ্লব—প্রবলতর ফল সব ; মানসিক ও নৈতিক বিপ্লব তার পরিসর বহুগুণে বেশী ব্যাপক ফলও বহুমুখী বেশী ব্যাপক, ফলও বহুমুখী ; কিন্তু এক আধ্যাত্মিক বিপ্লবের মহত্তর বস্তুর বীজ বপন করে।

প্রত্যেক ধর্ম পথই মানব জাতিকে সাহায্য করেছে। প্রাচীন গ্রীকোরোমক ধর্ম সাধনা মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যের দীপ্তিকে, তার জীবনের প্রসারতা ও সমুচ্চতাকে বহুমুখী সার্থকতার আদর্শকে বর্জিত করেছে। খৃষ্টীয় সাধনাকে ভাগবত প্রেমেও সহৃদয়তাকে মানুষের দৃষ্টি পথে কথঞ্চিত এনে ধরেছে। বৌদ্ধধর্ম দেখিয়েছেন জ্ঞানে কারুণ্যে শুচিতায় কি রকমে পূর্ণতর হয়ে ওঠা যায় তার এক সুমহান পন্থা। ইহুদী ধর্ম আর ইসলাম দেখিয়েছে কর্মের মধ্যেও কি রকমে ধর্মভাব নিয়ে ভগবানে নিষ্ঠা রাখা যায় কি উদ্দীপনায় ভগবতচিত্ত লওয়া যায়। আর হিন্দুধর্ম মানুষের সম্মুখে তার বৃহত্তম গভীরতম আধ্যাত্ম সম্ভাবনাকে সব উন্মুক্ত করে ধরেছে। এই সকল দিব্য-দৃষ্টি যদি পরস্পরকে আলিঙ্গন করে ধরতে পারত, যদি একে অপরের মধ্যে গিয়ে সম্মিলিত সংযুক্ত হতে পারত তবে এক মহান কবি সমাধা হত। কিন্তু তর্ক বুদ্ধিগত সঙ্কীর্ণ মতবাত আর সাম্প্রদায়িক অহমিকা অন্তরায় হয়ে আছে।

প্রত্যেক ধর্মই কতকগুলি জীবের উদ্ধার সাধনা করেছে কিন্তু আজ অবধি

কোন ধর্মই সমগ্র মানব জাতিকেই আধাত্মিক করে তুলতে পারে নাই। কারণ যা দরকার তা অনুষ্ঠান নয়, অনুশাষন নয় তা হল আধ্যাত্মিক আত্মবিকাশের জন্য এক একটা নিরবছিন্ন সর্ব ব্যাপক প্রচেষ্টা।

আজ জগতের মধ্যে যে সব পরিবর্তন দেখি—তা আদর্শ হিসাবে আর উদ্দেশ্য হিসেবে হল মানসিক, নৈতিক আর স্থূল ভৌতিক। এমনও আধ্যাত্মিক বিপ্লব তার সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে ; তবে ইতিমধ্যে এখানে ওখানে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঢেউ সে তুলে দিয়েছে এ বিপ্লবটি যতদিন না ঘটছে ততদিন অন্যান্য বিপ্লবগুলির অর্থ হৃদয়ঙ্গম হবে না। আর সে পর্যন্ত বর্তমান ঘটনার সব রকম ব্যাখ্যা আর ভবিষ্যতের সব রকম পূর্বকল্পনা নিরর্থক। কারণ সেই বিপ্লবের প্রকৃতি, শক্তি ও বাস্তব আবির্ভাবই মানব জাতির আগামী যুগের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করে দেবে।

অরবিন্দের সাধনা তো ব্যক্তি জীবনের মুক্তির জন্য নয়। নয় তার কর্ম এ পৃথিবী হতে মোক্ষলাভ।

তিনি চেয়েছিলেন ঊর্ধ্বতর লোকের এমন কোন আলো এ জগতে নিয়ে আসতে এমন কোন শক্তি পৃথিবীতে সক্রিয় করতে যা মানব প্রকৃতির মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে।

অরবিন্দের বিশ্বাস, এ শক্তির আবির্ভাব যথা সময়ে সম্ভব হইবে। পার্থিব চেতানা যদি অতি মানসিকতাকে ধারণ করতে পারে তাহলে এ যুগেই তো অঘটন ঘটা সম্ভব।

জন বলের প্রয়োজন আছে কিন্তু অমানুষিক সাধনায় আর নিজেদের নিয়োজিত করার প্রয়োজন নেই।

তাইতো অরবিন্দের সাধনা শুধু মাত্র তার নিজের জন্য নয়—সমষ্টিগত মানুষের জন্য।

তিনি সাধনার পথিকৃৎ মাত্র।

পরবর্তীদের চলার পথ সুগম করে দেওয়ার জন্যই এ সাধনা।

"অন্য লোকে স্বদেশকে একটা বড় পদার্থ, কতকগুলো মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলিয়া জানে ; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মায়ের বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হন, তাহা হইলে ছেলে কি করে ? নিশ্চিতভাবে আহার করিত বসে, স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায় ? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারী বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে

ব্রহ্মতেজও আছে সেই তেজজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম এইভাব আমার মজ্জাগত ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় অচল হইয়াছিল।" অবশেষে এল উনিশ শ' সাতচল্লিশের পনেরই আগষ্ট।

"ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করবেই" অরবিন্দের এ বিশ্বাস আজ সফল।

স্বাধীনতা দিবসে অরবিন্দ শোনালেন তার বাণী।

১৫ই আগষ্ট স্বাধীন ভারতের জন্ম-লগ্ন। এই তো সেদিন যেদিন পুরাতন যুগের শেষে নতুন যুগের পদক্ষেপ। কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের কাজেই এ দিনটি তাৎপর্যময় তা নয়, এ দিনটি তাৎপর্যময় সমগ্র এশিয়ার কাছে, সমগ্র জগতের কাছেও। কারণ 'নেশন্ গোষ্ঠির মধ্যে আর একটা নূতন নেশন-শক্তির আবির্ভাব ঘটল, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় সে নেশন অফুরন্ত। মানব জাতির রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা আধ্যাত্মিক ভবিষ্যৎ গঠনে এ নেশন-নিশ্চয়ই নেবে একটি বৃহৎ ভূমিকা। ব্যক্তিগত ভাবে আমি অত্যন্ত সুখী, যে দিনটি আমার জন্মদিন হিসেবে আমার কাছে ছিল স্মরণীয়, আমার আদর্শ ও জীবন সাধনা যারা গ্রহণ করেছে তারা সে দিনটিকে উৎসব মুখর করে তোলে, ঠিক সেই দিনটিই আজ বহন করেছে একটি বিরাট অর্থ। আমি আধ্যাপন্থী এ যোগাযোগ তাই আমার কাছে আকস্মিক-ঘটনা বা হঠাৎ-যোগ নয়, বরং যে কাজ লক্ষ্য করে আমি আমার জীবন শুরু করেছিলাম তার পেছনে যে ভগবানের শক্তি ও অনুমোদন ছিল এতো তারই পরিচায়ক, তাঁরই আশীর্বাদ। ভগবৎ-শক্তিই আমাকে প্রতিপদে পরিচালিত করেছে। যে সকল জাগতিক আন্দোলনকে পূর্ব সাফল্য আমি দেখে যাওয়ার জন্য আশা পোষণ করেছি, এক সময় যে গুলো অসম্ভব স্বপ্ন বলেই মনে হত অন্য সকলের কাছে, আজ সেগুলোই পূর্ণ সাফল্যের পথে পৌছাচ্ছে, অন্ততঃ সকল আন্দোলনের কাজ শুরু হয়েছে, পৌছাচ্ছেও সাফল্যের পথে।

আজকের মহাশুভ উদ্যোগ পর্ব আমার কাছে বাণী চাওয়া হয়েছে। কিন্তু বাণী দেওয়ার মত সম্ভাবনা এখন আমার নেই। তবে শৈশবে যৌবনে অঙ্কুরিত আশা আকাঙ্খা যা বর্তমানে ফলপ্রস্থ হতে চলেছে—সেই ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্খার কথা আমি শোনাতে পারি।…

আমি চিরকাল বিশ্বাস করেছি, বলেছি, ভারতের অভ্যুত্থান শুধুমাত্র তার

নিজের স্থূল স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নয়, নয় শুধুমাত্র আপনার প্রসার, মহত্ত্ব, শক্তি সমৃদ্ধিলাভের জন্য তার অভ্যুত্থান হবে ভগবানের জন্য, জগতের জন্য সমস্ত মানবজাতির সহায় হবে ভারত, ভারত দেবে নেতৃত্বে।

আমার আশা আকাঙ্খা গুলোকে তাদের স্বাভাবিক ক্রমানুসারে সাজিয়ে দিচ্ছি। আমি চেয়েছিলাম এমন এক বিপ্লব যা ভারতের মুক্তি নিয়ে আসবে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হবে ঐক্য।

চেয়েছিলাম, এশিয়ার পুনরভ্যুত্থান, এশিয়ার মুক্তি—মানব সভ্যতার ক্রমোউন্নতির জন্য এক সময় এশিয়া যে সুমহান ব্রত উদযাপন শুরু করেছিল আবার গ্রহণ করবে সেই একই ব্রত।

আমি চেয়েছি, মানবের জন্য একটা নূতন, একটা মহত্তর একটা উজ্জ্বলতর একটা উন্নততর জীবন ধারা—বাহ্যত এ জীবন ধারা আন্তর্জাতিক ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রত্যেক নেশন আপন আপন স্বকীয় জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য রাখবে অক্ষুণ্ণ। কিন্তু সকলেই থাকবে এক সূত্রে বাঁধা সকলের উপরে অন্তিমে হে অনিবার্য একতা রয়েছে তাকে লক্ষ্য করেই।

আমি আশা করেছি, ভারত বিশ্বকে দেবে অধ্যাত্মজ্ঞান, দেশেরজীবকে আধ্যাত্মিক করে তোলার সাধনার নির্দেশ।

আমার আকাঙ্খা, উর্দ্ধতর চেতনার মানুষের উত্তর ঘটিবে। প্রকৃতির বিবর্তনের এটা নতুন পর্যায়ের আগমনে হবে জাগরিত যাবতীয় সমস্যার সমাধান ; মানুষ যে বরাবর মিমুঢ় আর পৃদ্ধ এ সমস্যায়। মানুষ যে সেদিন থেকেই দেখেছে সর্বাঙ্গ সুন্দর সমাজের চিত্র দেখেছে স্বপ্ন।

ভারত আজ স্বাধীন একত্ব লাভ সম্ভব হয়নি, তবে তার দীর্ণ খণ্ডিত স্বাধীনতা এমনকি এক সময় এমনও মনে হয়েছিল হয়তো বা ভারত ব্রিটিশ অধিকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্ররাজির বিশৃঙ্খলার মধ্যে প্রত্যাবর্তন করেছে। তবু সুখের কথা এই সাজ্ঘাতিক পুনরাবর্তন আর ঘটবে না। অন্তত: এমন আশা করা যায়। Constituent Assembly তাদের কর্ম ব্যবস্থায় যে দৃঢ়তা ও সুবুদ্ধির পরিচয় রেখেছেন, তাতে সহজেই অনুমান করা যায় অনুন্নত শ্রেণীর সমস্যার সুসমাধানই হবে, ভাঙ্গন বা খণ্ডন ঘটবে না ; কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের সেই সুপ্রাচীন ধর্ম বিদ্বেষ এত গাঢ় হয়ে উঠেছে যে মনে হয় দেশকে যেন স্থায়ী ভাবে দ্বিখণ্ডিত করেছে রাজনৈতিক হিসাবেও। তবে আশা করি, জাতীয় মহাসভা আর দেশের মানুষ এই আপাত: বাস্তব সত্যকে স্থায়ী বাস্তব বলে গ্রহণ করবে না, দেবে না সাময়িক ব্যবস্থার অধিক মূল্য। কারণ যদি না এ ব্যবস্থা স্থায়ী হয় তবে ভারত দুর্বল হয়ে

পড়তে বাধ্য, বিফল হয়ে যাওয়াও অসম্ভব কিছু নয় ! অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা রইবে সব কালের জন্যে, নতুন করে বিদেশী আক্রমণের সম্মুখীন ভারতের আবার হয়তো বা হতেও পারে । দেশের বিভাগ দূর করতেই হবে-যে কোন উপায়েই হোক না কেন । বিরোধের উগ্রতা হ্রাস পাবে, শান্তির সৌ ভ্রাতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করবে উভয় পক্ষই, উপলব্ধি করবে একই কর্মে আত্মনিয়োগের সার্থকতা—এমন আশা অমূলক নয় । ঐক্য যে কোন আকারেই আসুক না কেন আসবেই । খণ্ডতাকে যেতে হবে, যাবেই । তা না যদি যায় তাহলে ভারতের ভবিতব্য ক্ষুন্ন হতে বাধ্য—ব্যর্থতায় অসম্ভব নয় । কিন্তু তা ঘটতে দেওয়া হবে না । কারণ তা অভিপ্রেত নয় ।

এশিয়া আজ জেগেছে, তার বহুলাংশ স্বাধীন কিংবা স্বাধীন হওয়ার পথে —এশিয়ার যে সকল অংশ এখনও পরাধীন তারাও সমস্ত রকম প্রতিকূলতাও দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মধ্যদিয়েই মুক্তির দিকে এগিয়ে চলেছে । যে সামান্য কার্য সমাধা বাকী তাও হবে, তা আজই হোক আর কালই হোক ! ভারত তার করণীয় কাজ শুরু করেছে অত্যন্ত নৈপুণ্যতার সঙ্গে । তার এই কর্ম সামর্থ্যই নির্দেশ করে ভারতের ভবিষ্যত সম্ভবনা, জাতিসংঘের আসরে সে কোন স্থান অধিকার করতে পারে এ তার সূচক ।

শুরু হয়েছে মানবজাতির ঐক্য সাধন । এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য আরম্ভ অত্যন্ত ত্রুটি বহুল । একটা বাহ্যব্যবস্থা তার হস্তগত হয়েছে সত্য কিন্তু বিপুল বিঘ্নের বিরুদ্ধেই তো তাকে চলতে হ'বে—চলতে হচ্ছে । কিন্তু সে অর্জন করছে অন্তরে বেশ ইতিহাসের শিক্ষা দিয়ে যদি দিক নির্ণয় করা হয় তাহলে একথা নিঃসন্দেহে ঘোষণা করা যায় এ বেগে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবেই পরিণামে জয়লাভও অবশ্যম্ভাবী···

অতর্কিত বাধা-বিঘ্ন আসা স্বাভাবিক ; কাজের গতি তাতে ব্যাহত হতেও পারে, তাকে ধ্বংস করতেও পারে—কিন্তু তবু ভবিষ্যৎ ফল সুনিশ্চিত যাই হোক না কেন, প্রকৃতির ধারায় ঐক্য সাধন অবশ্য প্রয়োজনীয় অপরিহার্য অঙ্গ এবং নিঃসন্দেহে ভবিষ্যৎ বাণীও করা যায় এর সিদ্ধি সম্পর্কে, সফলতা প্রসঙ্গে । একথা অত্যন্ত সত্য নেশনের প্রয়োজন সকলের কাজেই কারণ নেকনকে বাদ দিয়ে কথনই ক্ষুদ্রতর জাতি নিরাপদে থাকতে পারে না । ভারতবর্ষ যদি খণ্ডিত থাকেই তবে তার নিরাপত্তা সন্দেহাকুল । সকলের স্বার্থের দিকে তাকিয়েই ভারতে ঐক্য একান্ত অভিপ্রেত ! মানুষেরা পঙ্গুতা আর মূঢ় স্বার্থপরতাই তাকে ব্যর্থ করতে পারে—মানুষের এ গুণের বিরুদ্ধে, শোনা যায়, দেবতার প্রচেষ্টা পর্যন্ত ও ব্যর্থ হতে

বাধ্য, কিন্তু প্রকৃতির প্রয়োজন আর ভগবৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ জিনিস কখনও দাঁড়াতে পারে না।

জাতীয়তা সার্থকতা লাভ করবেই। তারপর শুধু প্রয়োজন আন্তর্জাতিক ভাব ও দৃষ্টি গড়ে তোলার, গড়ে তোলার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের।

নেশনবাদ পরিত্যাগ করবে তার যোদ্ধা মনোভাব। আপনার আপনত্বকে অক্ষুন্ন রেখেও এসকল জিনিসকে বরণ করে নিতে পারবে সমস্ত মানব জাতির যেদিন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে একটি ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্য।

ভারত জগৎকে তার আধ্যাত্মিক বিদ্যা দান শুরু করেছে। এ বিদ্যা ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপের ছড়িয়ে পড়েছে আমেরিকায়।

যুগ দুর্যোগের মধ্যেও মানুষের দৃষ্টি আশা ও ভরসায় ভারতের দিকেই রয়েছে, কেবল শাস্ত্র নয় তার সাধনা ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্যও আজ বিশ্ববাসী উন্মুখ।

এর পর আমার ব্যক্তিগত আশা ও আদর্শ।

বিবর্তনের পর্যায়ে মানুষ আরও এগিয়ে যাবে। মানুষ উচ্চতর ও চেতনার স্তরে গিয়ে পৌছাবে! চিন্তাবৃত্তির উন্মেষ কাল হতে শুরু করে যে সব সমস্যায় সে বিব্রত তার একটা সমুচিত সমাধান শুরু হবে ব্যক্তিগত পরমোৎকর্ষের ও সমাজগত সংহতির স্বপ্ন দেখবে মানুষ। বিবর্তন ক্রিয়ার বাইরের ক্ষেত্রে পৃথিবী জুড়ে রইলেও উৎস হবে ভারতবর্ষ!

ভারতের এই মুক্তিদিবসের মধ্যে আমি এই তাৎপর্যই লক্ষ্য করেছি—এ যোগাযোগ কত দিনে সম্ভব, কতদিনে তা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে তা নির্ভর করছে এই নূতন ও মুক্ত ভারতবর্ষের উপর।

স্বাধীনতা দিবসের এ বাণী ঐতিহাসিক বাণী।

কিন্তু আর কোনদিন শোনা যাবে না অরবিন্দের কোন বাণী।

আর কোনদিন এ মনীষা জেগে উঠবে বিপুল ভৈরবে।

আমাদের জন্য শুধুমাত্র তার অমূল্য চিন্তা ধারা। রইবে পথ নির্দেশ।

উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের পাঁচই নভেম্বর।

মহাজীবণের মহাপ্রয়াণ।

কেউ ভাবেন নি: এমন আকস্মাৎ মৃত্যু দেশবন্ধু স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি অরবিন্দকে ছিনিয়ে যাবে আমাদের কাছ হতে।

আজ শোকে বিমূঢ় ভারতবাসী, স্তম্ভিত বিশ্ববাসী।

পণ্ডিচেরী আজ মহাতীর্থ। শোকার্ত মানুষ দেখতে এসেছে শেষ বারের মত মহাঋষির জড় আবরণ—মরদেহ।

শোকে বিমূঢ়া শ্রীমা।

হে আমাদের ভগবানের জড় আবরণ, তোমাকে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতার নিবেদন করি তুমি যে আমাদের জন্য এত করেছ, কষ্ট করেছ, আশা করেছ, সহ্ করেছ, তুমি যে সব কিছু সংকল্প করেছ, চেষ্টা করেছ, তৈরী করে, সংসিদ্ধ করেছ, আমাদের জন্যে, তোমার সম্মুখে প্রণত আমরা : আর এই প্রার্থনা তোমার কাছে আমরা যেন কখন ভুলে না যাই এক মুহূর্তের জন্যেও তোমার কাছে সব কিছুর জন্যে আমরা ঋণী।"

শ্রীমা আদেশ দিলেন অরবিন্দের মরদেহ সমাধিস্থ করবার জন্য।

শেষ হল একটি যুগ।

ভারতের একটি যুগের ইতিহাস আজ এখানে এসে থমকে দাঁড়াল।

কিন্তু না, অরবিন্দকে ভোলা যায় না।

কোন শক্তি নেই যা মুছে দিতে পারে অরবিন্দের নাম মানুষের মনের মণিকোঠা হতে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার।
বাণীমূর্তি তুমি। তোমালাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ, কোনো ক্ষুদ্র দান
চাই নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা : ভিক্ষালাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আজ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন—

তোমারে প্রণাম জানাই অরবিন্দ।

শ্রীমান অসিতকুমার ধর
স্নেহভাজনেষু—

স্বাধীনতা ভিক্ষায় মেলে না, মিলতে পারে না। বললব্ধ জয়ার্জিত বিত্ত কি কুড়িয়ে পাওয়া ধনের সমগোত্র হয়, না হতে পারে? হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধার কোরব অথচ যুদ্ধ কোরব না তা কি হয়?

প্রায় দু'শ বছর ধরে পরাধীনতার যে জগদ্দল পাষাণভার দেশের বুকের ওপর চেপে রয়েছে তা কি কখনও অহিংসা মন্ত্রে সরিয়ে দেওয়া যায়? ছিনিয়ে নিতে হবে অধিকার। অহিংসায় নয়, উদারতায় নয়, শক্তি প্রয়োগ করেই তাড়াতে হবে ব্রিটিশ বেনের দলকে।

আমি এসেছি।

ফিরে এলেন বাংলার নব জাগ্রত তারুণ্যের প্রতীক সুভাষচন্দ্র।

বিলেত হতে একেবারে বোম্বেতে।

আই. সি. এস. পাশ করলেন। মাত্র আট মাসের চেষ্টায় চতুর্থ স্থান অধিকার করলেন এ পরীক্ষায়। কিন্তু দাসত্বের শৃঙ্খলে তিনি ধরা দিলেন না। চাকরি পেয়েও ছেড়ে দিলেন।

না, ইংরেজের গোলামি করব না।

স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সুভাষচন্দ্র। তাই শহর-গ্রামে, সদরে-মফঃস্বলে, মহকুমা, জেলায়, একপতি হওয়ার মহিমা ও মর্যাদাকে অত্যন্ত অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি। কেনই বা করবেন না?

তিনি যে শুনেছেন দেশের ডাক, দেশ সেবার আহ্বান।

আহ্বান জানিয়েছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

আশীর্বাদ করেছেন সুভাষকে, সুভাষের সিদ্ধান্তকে।

তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি সুভাষকে।

সুভাষ কি সেই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেন?

তাই বোম্বে হতে কলকাতা পৌছেই হাজির হলেন চিত্তরঞ্জনের রসা রোডের বাড়িতে।

সুভাষ আজ ফিরে এসেছেন, চিত্তরঞ্জন উচ্ছ্বসিত।

চিত্তরঞ্জন বসেছিলেন। কাছেই বসেছিলেন বাসন্তী দেবী।

সুভাষ প্রণাম করলেন চিত্তরঞ্জনকে ও বাসন্তী দেবীকে।

তুমি সমস্ত সংগ্রামের ভার নাও, সুভাষ—

বাসন্তী দেবী আশীর্বাদ করতে গিয়ে বললেন সুভাষকে।

মাথায় তুলে নিলেন সুভাষচন্দ্র ঐ দায়িত্ব। খুশীতে উজ্জল। এই তো তিনি চেয়েছিলেন। আপনি আমাকে শক্তি দিন মা। আপনি যে সর্বশক্তিরূপিণী! আপনি শক্তি দিলে নিশ্চয়ই সর্বস্তরের সংগ্রামেই জয়ী হব। পরাভূত হব না কখনই।

চিত্তরঞ্জন বললেন, স্বরাজ আমাদের চাই। কিন্তু মুষ্টিমেয়র জন্য এ স্বরাজ আমরা চাই না। চাই অগণিত জনসাধারণের সুখ।

সুভাষ নিবিষ্ট চিত্তে শুনেছেন চিত্তরঞ্জনের নির্দেশ, সাধারণ সুখসমৃদ্ধি, সাধারণের অশিক্ষা ও কুশিক্ষা দূর করাই আমাদের স্বরাজের লক্ষ্য।

স্বরাজ উদ্দেশ্য নয় একটা উপায় মাত্র। মানুষের মুক্তিই আসল উদ্দেশ্য। জনশক্তির সংহত শক্তিই দিকে দিকে জাগিয়ে তোলার ব্রত নিতে হবে আজ। তুমি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করো, সুভাষ।

নির্দেশ দিলেন চিত্তরঞ্জন।

এখন শুধু প্রয়োজন রণগুরুর আশীর্বাদ।

প্রথমেই বিলিতি বর্জন। বিলিতি বস্ত্র পোড়ানো হবে দেশবন্ধুর রসা রোডের বাড়ির টেনিস কোর্টে। অগ্নিমহোৎসব।

সুভাষ তাকালেন দেশবন্ধুর দিকে। চিত্তরঞ্জনের পরনে মোটা খদ্দরের ধুতি গায়ে খদ্দরের ফতুয়া। বাসন্তী দেবীও পরেছেন মোটা খদ্দরের শাড়ি, লাল পেড়ে। সুভাষ লজ্জা পেলেন। নিজের বিলিতি পোষাক যেন তাঁকে সহস্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় দাহ করছে। কতক্ষণে যে তিনি এই জ্বালার হাত হতে মুক্তি পাবেন, এ-ই তাঁর একমাত্র ভাবনা।

দেশবন্ধু রসা রোডের বাড়ির টেনিস কোর্টে স্তূপীকৃত করা হয়েছে বাড়ির সকলের বিদেশী বস্ত্র। দেশবন্ধুর মূল্যবান স্যুটই সংখ্যায় বেশী। সুভাষ নিজেই আগুন ধরিয়ে দিলেন এই স্তুপীকৃত বস্ত্র রাশীতে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল মূল্যবান পোষাক। অগ্নির লেলিহান শিখার পুণ্যবগাহনে পবিত্র হবে দেশ—সমস্ত পাপ কালিমা ভস্মীভূত করে, উদ্দীপিত হয়ে উঠবে দেশবাসী।

সুভাষের পরিধানেও আজ খদ্দর।

১৮৯৭ সালের তেইশে জানুয়ারী সুভাষের জন্ম।

বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী বলেছেন :

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী। যুবকগণ, ওঠো জাগো, শুভমুহূর্তে এসে পৌঁছেছো। সাহস অবলম্বন করো, ভয় পেওনা। তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলী প্রার্থনা করেছেন।

বিবেকানন্দের এই বিশ্বাস রূপ দিতেই বুঝি জন্ম নিলেন সুভাষচন্দ্র।

উনিশ শ' দুই সাল। পাঁচ বছর বয়স তখন সুভাষের।

পিতা রায় বাহাদুর জানকী নাথ বসু। সুভাষকে ভর্তি করে দিলেন প্রোটেষ্টান্ট ইউরোপিয়ান স্কুলে। সংক্ষেপে পি, ই, স্কুলে। পরিচালক ব্যাপ্টিষ্ট মিশন। ইংরেজ আর য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলে মেয়েদের জন্যই এ স্কুল। তবু কিছু কিছু ভারতীয় ছাত্রও ওরা নেয়। এই স্কুলের প্রতিই রায় বাহাদুর জানকীনাথের পক্ষপাত, কেমন যেন দুর্বলতা। সব ছেলেমেয়েকেই তিনি এই স্কুলে পড়বার সুযোগ দিয়ে ছিলেন। ষষ্ঠ ছেলে সুভাষও এই পরিবেশের মধ্যে বড় হয়ে উঠবেন এ আর এমন বেশী কথা কি?

প্রোটেষ্টান্ট ইউরোপীয়ান স্কুলের হেডমাষ্টার মিষ্টার ইয়ং-এর সুনজরে সুভাষ পড়েছিলেন, সে সুভাষ ভাল ছাত্র বলেই। এবং এও সত্য ইয়ং-এর প্রত্যক্ষ প্রভাব সুভাষের চরিত্রের উপর এসে পড়েছিল, কিন্তু সুভাষ বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে শিখলেন, ইংরেজরা ভারতীয়দের ঘৃণা করে। যোগ্যতা সত্ত্বেও গুণগত উৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও ওরা ওদের সঙ্গেই একই পংক্তিতে বসার অধিকার ভারতীয়দের আছে বলে মেনে নিতে রাজী নয়।

তা না হলে ভারতীয় ছাত্র স্কলারশিপ পরীক্ষায় বসতে পারবে না কেন? শ্রেণী পরীক্ষায় বার্ষিক ফলাফলের উপর নির্ভর করে স্কলারশিপ দেওয়া হবে না। স্কলারশিপ পরীক্ষার আলাদা ব্যবস্থা। না হয় তাই হল। কিন্তু সে পরীক্ষা শুধু য়্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কারণ কি? অর্থাৎ ভারতীয়দের জন্য স্কলারশিপ পরীক্ষা নয়, ভারতীয়রা স্কলারশিপ পাবে না, য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছাত্রদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা পাকাপাকি করার জন্যই তো এই পরিকল্পনা!

কেন এই বিভেদ? কেন? কেন?

সুভাষ কাকে জিজ্ঞাসা করবেন? কে সমাধান করে দেবেন সুভাষের এ সমস্যার—এ প্রশ্নের?

মনের দুঃখ সুভাষ বুঝি চেপে রাখতে পারেন নি, তাই প্রশ্ন করেছিলেন এক অভিভাবককে।

তাই সুভাষের এ প্রশ্নের উত্তর তিনি ভালভাবে দিতে পারলেন না, দিলেন বাঁকা ভাবে।

তবু সাত বছর কেটে গেল এই স্কুলে।

শিখলেন ইংরাজী, শিখলেন ল্যাটিন কিন্তু বাংলা সংস্কৃত ভাষা শেখার কোন সুযোগ পেলেন না এইঃ স্কুলে। ঠিক সেই সময়েই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন: ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এখন থেকে বাংলা অবশ্যপাঠ্য।

বাংলা অবশ্যপাঠ্য হল। আর কটকও তখন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত; অতএব সুভাষকেও বাংলা শিখতে হবে। শিখতে হবে সংস্কৃত। সুভাষ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। অন্ততঃ এই ব্যাপটিষ্ট মিশনারীদের পরিচালিত স্কুলের ছাত্রে ছাত্রে ভেদরেখা লক্ষ্য করার মর্মদাহী আবহাওয়ার বাইরে যাওয়ার সুযোগ তো এ নতুন ব্যবস্থাপনায় মিলল। খাঁচা হতে পেলেন তিনি মুক্তি। পেলেন নতুন পরিবেশ, পেলেন নতুন নতুন বন্ধু। তাই এই স্কুল ছাড়ার প্রাক্কালে তাঁর মনে নেই কোন ক্ষোভ, নেই কোন দুঃখ, শুধু দু'চোখে জুড়ে রয়েছে আগামী দিনের স্বপ্ন মাখা স্বাধীনতা!

মিঃ ইয়ং পি. ই. স্কুলের হেডমাষ্টারের কাছ হ'তে তিনি বিদায় নিলেন সহাস্য মুখেই। বললেন, র‍্যাভেনস বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে যাচ্ছি।

কাঠ জুড়ি নদীর তীরে র‍্যাভেনস কলেজিয়েট বিদ্যালয়!

প্রধান শিক্ষক বেণী মাধব দাস।

সুভাষ প্রথম দিন এসেই বিস্ময়ে হতবাক। এদেশীয় স্কুল। ছাত্ররা সবাই ধুতি-শার্ট, ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত! কিন্তু প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব বাবু, তিনিও তো এদেশীয় পোষাক পরেই রয়েছেন। অবাক হলেন সুভাষ। প্রথম দিন সুভাষ হাজির হয়েছেন র‍্যাভেনস কলেজিয়েট বিদ্যালয়ে একজন প্রৌঢ় কর্মচারীর সঙ্গে।

রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসু তাঁর ছেলেকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন তাকে পরীক্ষা করে আপনার বিদ্যালয়ে ভর্তি করে নিন। বললেন প্রৌঢ়

কর্মচারীটি। বেণীমাধব তাকালেন সুভাষের দিকে।

বারো-তেরো বছরের একটি জ্যোতির্ময় ছেলে। কোর্ট প্যান্ট পরিহিত। চোখে চশমা, কিন্তু তেজস্বী, শুভ্র ভাস্বর এ মূর্তি। শুধু চোখে পড়ে তা তো নয়, এ যে চোখ জুড়ে স্থায়ী হওয়ার মত।

তোমার নাম কি?

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু।

কোন ক্লাসে ভর্তি হাত চাও?

ক্লাস সেভেন-এ।

বেণীমাধব বাবু একবার তাকালেন সুভাষের মুখের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, ক্লাস সেভেন-এ কি পারবে?

পরীক্ষা করে দেখুন। খুব খুশী বেণীমাধব শুনে। কেনই বা খুশী হবেন না। এই তো যথার্থ পুরুষকারের পরিচয় রাখার মত কথা! পরীক্ষা করে দেখুন। সারা জীবন ধরেই যখন পরীক্ষা দিতে হবে তখন আজই বা পরীক্ষা দিতে ভয় পাওয়া কেন!

সুভাষের পরীক্ষা নেওয়া হল। বেণীমাধব বাবু সুভাষকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন ক্লাস সেভেন-এর ঘরে।

ক্লাস নিচ্ছেন তখন সংস্কৃতের মাষ্টার মশায় বিশ্বনাথ কাব্যতীর্থ।

সবাই সচেতন।

হেড মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে সাহেবি পোষাক পরা ঐ ছেলেটা কে?

পণ্ডিতমশাই হেডমাষ্টার মশাইকে দেখেই দোরগোড়ায় এগিয়ে এলেন।

এই ছেলেটি আজ এই ক্লাসে ভর্তি হল।

বেণীমাধব বাবু আর কিছু বললেন না। সুভাষকে ক্লাস ঘরে পৌঁছে দিয়েই ফিরে গেলেন।

সারা ক্লাস মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে সুভাষের দিকে।

প্রথম বেঞ্চের ছেলেরা সরে বসে সুভাষের বসার জায়গা করে দিল। পণ্ডিত মশাই তাকালেন তার দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি?

সুভাষ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, তার পর বললেন: শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু।

কোন বিদ্যালয়ে পড়তে এর আগে?

প্রোটেষ্টাণ্ট ইউরোপিয়ান বিদ্যালয়ে।

বিশ্বনাথ বাবু যেন খুশী হতে পারলেন না সুভাষের উপরে। মুখ বাঁকালেন। তারপর আবার শুধালেন, কি কি পড়তে সেখানে?

ইংলিশ, ল্যাটিন, ইংল্যাণ্ডজ হিস্ট্রী, জিওগ্রাফি আর এরিথমেটিক।

সুভাষের বলার ভঙ্গী ও উচ্চারণে সারা ক্লাস আজ অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ।

পণ্ডিত মশাই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না সুভাষের উত্তরে। তাই রুক্ষ মেজাজে প্রশ্ন করলেন, সংস্কৃত জানো? শব্দরূপ? ধাতুরূপ?

কিছুই পড়িনি। অক্ষর পরিচয়ও নেই।

সারা ক্লাস এবার শব্দ করে হেসে উঠল। পণ্ডিত মশাই-এর মেজাজ তখন সপ্তমে। জিজ্ঞেস করলেন, বাংলা কতদূর পড়েছ?

বাংলাও ওখানে পড়ানো হত না স্যার।

বল কী হে! তোমার মাতৃভাষা পড়ার সুযোগও ওখানে ছিল না?

ছিল না স্যার। তাইতো এখানে ভর্তি হলাম। কারণ এখন তো আবার ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় বাংলা অবশ্য পাঠ্য করা হয়েছে।

দ্বিধাহীন সুভাষের উত্তর।

পণ্ডিত মশাই বললেন, সংস্কৃত অবশ্য পাঠ্য। কিন্তু তোমার কী হবে? তুমি কী করবে?

অনমনীয় সুভাষ ধীর স্বরে উত্তর দিলেন, দু একদিনে শিখে নেব স্যার।

আবার হো হো করে হেসে উঠল ছাত্রের দল।

ব্যঙ্গ করলেন পণ্ডিত মশাই, দু একদিনে শিখে নেবে! ছাই শিখবে! কী দরকার ছিল বাপু এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার। বেশ তো সাহেব স্কুলে পড়ে সাহেব হচ্ছিলে। ওখানে থাকলেই তো পারতে। মিছিমিছি তুমিও যন্ত্রণা ভোগ করবে আর আমাদেরও জ্বালাবে।

বিশ্বাস করুন স্যার, আমি দু এক দিনেই শিখে নেব।

কিন্তু এও কি সম্ভব? এও কি বিশ্বাস করা যায়?

অসম্ভবের নায়ক সুভাষচন্দ্র এই র‍্যাভেনস কলেজিয়েট স্কুলে অনেক অসম্ভবই যে শেষ পর্যন্ত সম্ভব করে তুললেন।

সুভাষ পরদিন স্কুলে এলেন।

আজ আর সাহেবি পোষাক পরিধানে নেই! ধুতি পাঞ্জাবী পরে হাতে বইখাতা নিয়ে সুভাষ হাজির হলেন স্কুলে।

প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল স্কুল বারন্দায়। দু হাত একত্রিত করে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে নমস্কার করলেন সুভাষ প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব বাবুকে।

কাল তোমাকে অন্য পোষাকে দেখেছিলেম না? হাত তুলে সুভাষের নমস্কার গ্রহণ করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন বেণীমাধব।

মিশনারীদের স্কুলে সাহেবী পোষাক পরেই তো যেতাম তাই কালও ঐ পোষাকে এখানে চলে এসেছিলাম স্যার।

কিন্তু এসে দেখলাম সব ছাত্রই জাতীয় পোষাক পরে। সুতরাং আমরাও সেই পোষাকই পরা উচিত। কারণ আমিও তো ওদেরই একজন।

এ কথা তোমাকে কেউ কি বলে দিয়েছে?

না স্যার, কেউ বলে দেয়নি। আমি নিজেই অনুভব করেছি।

অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন বেণীমাধব বাবু।

বললেন, তোমার অনুভবই যথার্থ অনুভব সুভাষ। দেশীয় সংস্কৃতি দেশীয় বৈশিষ্ট্যকে কোনো কারণেই নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। আমরা তো দেশের কথাই ভাবব। যাও ক্লাসে যাও।

সুভাষ এগিয়ে গেলেন।

প্রাণে তাঁর আজ নতুন বিদ্যুৎ প্রবাহের স্পর্শ! নতুন চেতনা।

সত্যই কেউ সুভাষকে শিখিয়ে দেয় নি সেদিন।

বাবা জানকীনাথ বসুও তো ভীষণ অবাক হয়েছিলেন সুভাষের এ নতুন পোষাকে। গর্ব অনুভব করেছিলেন সুভাষের বুদ্ধিবৃত্তির সুষ্ঠ প্রয়োগ দেখে।

বেণীমাধব বাবু সেদিন আর একটি ছেলেকে ডাকলেন, চারু শোন। এ ছেলেটির নাম চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় যিনি র‍্যাভেনস কলেজের ইংরাজীর প্রধান অধ্যাপক তাঁরই ছেলে।

তোমাদের ক্লাসে একটি নতুন ছাত্র ভর্তি হয়েছে, জান?

হ্যাঁ স্যার, সুভাষচন্দ্র বসু।

ভাল ছেলে। তার উপরে একেবারে খাঁটি।

হ্যাঁ স্যার, ইংরেজীতে বেশ ভাল।

তুমি তো এবারে প্রথম স্থান অধিকার করেছো। কিন্তু এবার তোমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী এল।

কিন্তু স্যার ও সংস্কৃত ও বাংলা কিছুই জানে না। ও দুটোতে ভীষণ কাঁচা।

তা হোক। তবু শিখে ফেলবে। বুদ্ধি আর মেধা দুইই প্রখর। ভেতরে শিখবার একটি অনির্বাণ শিখা স্থির সংকল্প নিয়ে জলছে প্রতিনিয়ত। বেণীমাধব বাবুর বিশ্বাসই শেষ পর্যন্ত ফলবতী হল।

সুভাষের দু-একদিনে শিখে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশটা শুধু কথার কথা নয়। সেটা সত্য সত্যই রূপ পেল বাস্তবে। বার্ষিক পরীক্ষার ফল বের হলে দেখা গেল সেবারে সুভাষই প্রথম হয়েছেন!

সংস্কৃতে একশোর মধ্যে একশো।

অবাক সকল ছাত্র। অবাক পণ্ডিত মশাইও। বেণীমাধব বাবু জিজ্ঞেস করলেন, সুভাষকে একশোর মধ্যে একশো নম্বর দিলেন?

আজ পণ্ডিত মশাই-এর কোন ক্ষোভ নেই। নেই সুভাষের উপর কোন বিরূপ মনোভাব।

কি আর কোরব বলুন! তার চেয়ে বেশী নম্বর যে আর দেওয়ার উপায় নেই। উপায় থাকলে আমি তা দিতাম।

উনিশ'শ এগারো সালের দশই আগষ্ট সুভাষ ক্লাসের ছেলেদের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিল:

আগামী কাল এগারোই আগস্ট। এদিনটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। উনিশ শ' আট সালের এগারই আগস্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল। তাই এ দিনটি শোকের দিন—গভীর শোকের দিন। এই বাংলার প্রথম তরুন দেশমায়ের মুক্তির জন্য আপন প্রাণ উৎসর্গ করলেন। দেখালেন বাঙালী মরে না, প্রাণ দেয়। স্বপ্ন, সংকল্প তুলনায় অনেক অনেকবড়। আমরা এ দিনটি পালন করব। কিন্তু কি করে পালন করব?

সুভাষের ঘোষণা: আমরা কাল উপবাস করে এই দিনটি পালন করব। আমরা ছাত্ররা পুরোদিন অনাহারে থাকব। তোমরা রাজী?

রাজি, আমরা রাজি।

সিদ্ধান্ত হল : কাল উনুন জ্বলবে না, হাঁড়ি চড়বে না, আমরা সবাই উপোস করে থাকব।

১৯০৫ সাল। ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী চেয়েছিল, ভারতে অসপত্ন রাজত্ব। আর এও বুঝেছিল, বাঙ্গালীকে যদি দুর্বল করা না যায়, বাংলাকে যদি খর্ব করা না যায়, তাহলে অসপত্ন মিলবে না। সুতরাং বাংলাকে দুর্বল হলে সমস্ত বাঙ্গালীই দুর্বল হয়ে পড়বে।

সুতরাং লর্ড কার্জন সিদ্ধান্ত নিলেন এবার বাংলা দেশকে ভাগ করা হবে। পূর্ববাংলা আসামের সঙ্গে যুক্ত হবে আর পশ্চিম বাংলা বিহারের সঙ্গে।

বাঙ্গালীর ক্ষোভ এবার ক্রোধে রূপ পেল। শুরু হল সক্রিয় বিপ্লববাদ। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী স্থির করলো ১৯০৫ সালের ১৫ই অক্টোবর আইনানুগত বাংলা দেশ পৃথক হয়ে যাবে।

বাঙ্গালীকে শান্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় আইন সভায় দাঁড়িয়ে বড় লাটকে অনুরোধ করলেন মহামতি গোখলে। বড়লাটও বিলেত এলেন এ ব্যাপারে তদারক করতে। যেন বঙ্গ ভঙ্গ রহিত হয়।

কিন্তু ভারত সচিব বললে ? তিনি কোন কিছু শুনতে রাজী নন।

সুরেন্দ্রনাথ হুঙ্কার ছাড়লেন :

We shall unsettle the settled fact.

ওদের ঔদ্ধত্য আমরা সহ্য করব না। ওরা যদি ভেবে থাকে ওরা ওদের সিদ্ধান্তে অটল তাহলে আমরাও সেই সিদ্ধান্ত ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব।

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন বাংলা দেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙ্গালীকে বিচ্ছিন্ন করেন নি তাই বিশেষ রূপে স্মরণ ও প্রচার করবার জন্যে সেই দিনকে আমরা বাঙালীর রাখিবন্ধনের দিন করে পরস্পরের হাতে হরিদ্রা বর্ণের সূত্র বেঁধে দেব। রাখি বন্ধনের মন্ত্রটি এই, ভাই ভাই এক ঠাঁই।

শুধু তাই নয় রবীন্দ্রনাথ সেই মহামন্ত্র গানে বেঁধে দিলেন :

'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বংলার বায়ু বাংলার ফল।
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান ।।'

বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠল দিকে দিকে। সিদ্ধান্ত নিলেন বিপ্লবীরা,

পূর্ববঙ্গের লেফটেন্যান্ট গভর্ণর বনফিল্ড ফুলারকে হত্যা করতে হবে।

হেমচন্দ্র কানুনগো আর বারীন ঘোষ বেরিয়ে পড়লেন প্রস্তুত হয়ে ফুলার বধের দায়িত্ব নিয়ে। কিন্তু ফুলার বধ সম্ভব হলনা। সম্ভব হবে কি করে? ফুলার আগেই সে সংবাদ পেয়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে গেছেন।

এবারে লক্ষ্য কিংসফোর্ড।

কোলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট তেরো বছরের বালক সুশীল সেনকে পনেরো ঘা বেত মারার হুকুম দিলেন। সুশীলের অপরাধ? তার অপরাধ সে আপন মাতৃভূমির অপমান সহ্য করতে পারেনি। তাই একটা লাল-মুখো সাহেবকে ঘুষি মেরেছিল। আর কিংসফোর্ড—অহঙ্কারী। হঠকারী কিংসফোর্ড নৃশংস আদেশ দিলেন: প্রকাশ্য আদালতে পনেরো ঘা বেত মারার। বালক সেদিন বেতের আঘাতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল আদালত প্রাঙ্গণে।

আর সেদিনই মনে মনে শপথ নিলেন বিপ্লবীরা।

প্রতিশোধ নিতেই হবে কিংসফোর্ডের এই নৃশংসতার।

শুরু হল বিপ্লবীদের গুপ্ত মন্ত্রণা।

শ্রীঅরবিন্দ, চারুচন্দ্র দত্ত আর রাজা সুবোধ মল্লিক এই তিন বিপ্লবী দলের বিচারক সম্মিলিত ভাবে রায় দিলেন—কিংসফোর্ডের মৃত্যুদণ্ড। বেতের পনের ঘা আঘাতের পরিবর্তে বিপ্লবীরা সযত্নে তুলে রাখলেন পনেরটি বুলেট।

কিংসফোর্ডকে বদলী করে দেওয়া হল কলকাতা হতে একেবারে মজঃফরপুরে। জেলা জর্জ হিসেবেই কিংসফোর্ড এলেন মজ:ফরপুরে।

এবারে নির্বাচিত হল দুটি তরুণ যারা মৃত্যু-না-মানা মাতৃ পুজারী, যারা নির্বাচন না-জানা বহ্নিশিখা। ক্ষুদিরাম বসু আর প্রফুল্লচাকী রওনা হয়ে গেলেন মজঃফরপুর। একেবারে প্রস্তুত হয়ে। সামনা সামনি মোকাবিলা ওঁরা করবেনই।

এল উনিশ শ' আট সালের তিরিশে এপ্রিল। ক্লাবের রাস্তায় অপেক্ষা করছেন ক্ষুদিরাম, অপেক্ষা করছেন প্রফুল্ল। কিংসফোর্ড তাঁর ফিটনে এ রাস্তা দিয়েই বাড়ী ফিরবেন। কিংসফোর্ডের গাড়ি।

রাত সাড়ে আটটা। কিংসফোর্ড আজ ক্লাবে এসেছেন। এ বিষয়ে তাঁরা

নিশ্চিত কারণ ওঁরা নিজেরাই কিংসফোর্ডকে ফিটনে করে ক্লাবে আসতে দেখেছেন।

আর কিছুক্ষণ পরেই ক্লাব ভাঙবে। একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল।

ওঁরা সময় ও সুযোগ বুঝে গাড়িটার উপর বোমা ছুঁড়লেন—

বুম্-ম···

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে হারিয়ে গেল আরোহী দুই মহিলার ব্যর্থ আর্তনাদ। বোমা ছুঁড়েই দু বন্ধু পালালেন।

রেল লাইন ধরে ছুটতে লাগলেন দুজনেই। স্নান নেই, আহার নেই, আশ্রয় নেই। একরাত্রে দুই জনে প্রায় চব্বিশ মাইল পথ হাঁটলেন। যতক্ষণ না সূর্যোদয় হয় ততক্ষণ আমরা পথ চলবোই—এই শপথ নিয়েছেন তাঁরা। অন্ধকার অতিক্রম করে আলোর দেশে পৌঁছানো চাই-ই চাই।

দুপুরের কাছাকাছি উইনি ষ্টেশনের কাছে একটা মুড়ির দোকান দেখে দাঁড়ালেন ক্ষুদিরাম। উদ্দেশ্য : যদি তৃষ্ণার জল পাওয়া যায়, শুকনো মুড়ি চিবিয়ে জলপান করে তৃষ্ণা মেটানো যে বড় আরামের।

কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস। জল মিলল না। মিলল না মুড়ি।

শিও প্রসাদ সিং আর ফতে সিং দুই কনস্টেবল ঐ সময়ে ঐ মুড়ির দোকানে হাজির। ওরা খবর পেয়েছে মজঃফরপুরের ঘটনার। সুতরাং ক্ষুদিরামকে দেখেই ওদের মনে জাগল সন্দেহ। কী রকম ম্লান বেশবাস, উসকো চুল, উদভ্রান্তের মত চেহারা।

ক্ষুদিরামকে ওরা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল।

ক্ষুদিরাম বুঝতে পেরেছিল আসন্ন বিপদের কথা।

সুতরাং আসন্ন বিপদের মোকাবিলা করার জন্য রিভলভার উঁচিয়ে গুলি চালাবার উপক্রম করতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল শিও প্রসাদ সিং আর ফতে সিং। ধরা পড়ল ক্ষুদিরাম। আর প্রফুল্ল? সারারাত সারাদিন পথ চলে সমস্তিপুর পৌঁছে চেপে বসলেন কোলকাতার গাড়িতে। আর সেই গাড়িতেই সেই কামরায় ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জি।

প্রফুল্ল পকেট হতে রিভলবার বের করে নিয়ে গুলি চালালেন নন্দলালের শির লক্ষ্য করে। নন্দলাল সরে দাঁড়িয়েছে।

সুতরাং গুলি লক্ষে পৌছাল না। বেঁচে গেল নন্দলাল।

আর মাত্র দুটি গুলি সম্বল। অপচয় করা যায় না।

“আপনি বাঙালী হয়ে আমাকে ধরবেন?

প্রফুল্ল নিজের বুক লক্ষ্য করে পর পর দুবার গুলি চালালেন

লুটিয়ে পড়লেন মোকামাঘাট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে।

এ-ই বুঝি নিয়তির নির্দেশ।

কিন্তু ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখল বিংশ শতকের প্রথম শহীদ প্রফুল্লের নাম জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী—এর জন্য প্রাণ উৎসর্গই তো বৃহত্তম আদর্শ।

কিন্তু ক্ষুদিরাম?

মজঃফরপুরে আনা হল তাঁকে।

এখানে স্পেশ্যাল জর্জ কার্ণডাফ তাঁর ফাঁসির হুকুম দিলেন।

হাইকোর্ট বহাল রাখল সেই রায়।

হাসি-হাসি গলায় ফাঁসি পরলেন ক্ষুদিরাম, এ তো ফাঁসির রজ্জু নয় এ যে দেশ মাতৃকার স্নেহাঞ্চল।

দুঃখ নেই। নেই বিষাদের চিহ্ন।

সেদিন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী বুঝতে শিখল: বাঙালি মরে না, প্রাণ দেয়। অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম যে তারই সাক্ষী।

র‍্যাভেনস্ কলেজিয়েট হোস্টেল।

আজ শোক দিবস পালিত হচ্ছে।

তাই হোস্টেলের উনুন ধরেনি। আজ যে অরন্ধন।

ছাত্রেরা অভুক্ত অবস্থাতেই পড়াশুনা করছে শ্রেণীকক্ষে। বিন্দুমাত্র বিক্ষোভ নেই, বিন্দুমাত্র আচরণে তার কোনো প্রকার প্রকাশ।

ক্লাস শেষ হল। ছাত্রেরা জমায়েত হয়েছে এখন একটা ঘরে।

বেণীমাধববাবু এলেন। ছাত্রেরা শ্রদ্ধা স্তব্ধতা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে প্রধান শিক্ষক মশাই ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

বেণীমাধব বাবুর চোখ পড়ছে সুভাষের উপর।

একী সুভাষ, তুমি এখানে?

সুভাষ নীরবে একটু হাসলেন। উত্তর দেওয়ার কিছু নেই। বেণীমাধব

বাবু বুঝতে পেরেছেন সুভাষের মনের ভাষা। আজ যারা তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে তাদের সে ছেড়ে যেতে পারে না। নেতৃত্ব বাইরের থেকে করা সম্ভব নয়। দলের একজন না হতে পারলে দলপতির নির্দেশ সবাই মানবে কেন ? সুভাষ নেতৃত্ব দিতে এসে দলেরই একজন হয়ে পড়েছেন। সত্যই নেতা হওয়ার যোগ্যতা ধরেন সুভাষ।

বেণীমাধব বাবু জিজ্ঞেস করলেন : স্বদেশী গান জানো না ?

বেণীমাধব আর দাঁড়ালেন না। হয়তো বা ছেলেরা লজ্জা পাবে। আড়ষ্ট হয়ে রইবে তাঁর সামনে গান করতে। ঘর ছেড়ে চলে এলেন তিনি বারান্দায়।

ছেলের দল তখন সমস্বরে গান শুরু করল।

র‍্যাভেনস্ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রদের ক্ষুদিরামের ফাঁসি উপলক্ষ্য করে শোক দিবস পালন করাটা ভাল চোখে নিতে পারল না শাসকগোষ্ঠী। তাই বদলির হুকুম এল বেণীমাধব বাবুর।

একেবারে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে তাঁকে বদলির হুকুম দিলেন মেজিস্ট্রেট।

স্কুলে দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা।

স্যার বদলি হয়ে যাচ্ছেন। একেবারে কৃষ্ণনগর।

ছেলেরা মানতে রাজি নয় বদলির এ আদেশ।

সুভাষচন্দ্রের একক কণ্ঠ স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করল :

আমরা এ হতে দেব না। ঐ আদেশ আমরা মানি না। আমরা বদলির অর্ডার রদ করব। ধর্মঘট করব আমরা।

ছাত্রের দল তো সুভাষেরই নেতৃত্ব চায়।

তারাও স্থির সংকল্প নিল, ধর্মঘটই আমরা করব।

সুভাষ তখন সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্র।

কিন্তু বেণীমাধব চান না ছাত্ররা ধর্মঘট করুক। তিনি জানেন, চাকরিতে বিশেষতঃ সরকারি চাকরিতে বদলি আছেই, তা নিয়ে মন খারাপ করে লাভ কি ? তা ছাড়া আদেশ পালন করাই চাকরির সর্ত, তিনি তা কোন কারণেই লঙ্ঘন করতে পারেন না।

বেণীমাধব বাবু ডেকে পাঠালেন সুভাষকে।

সুভাষ এগিয়ে এলেন। ছেলেরা বাইরে অপেক্ষা করছে।

তোমরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছ? বেণীমাধবের অন্তরে স্নেহ কিন্তু সুরটা একটু বা কঠিন।

সুভাষ নিরুত্তর।

আমার তো বদলির চাকরি, সুভাষ। যখন যেখানে ওরা বদলি করবে তখন আমাকে তো সেখানেই যেতে হবে, তার জন্য বিক্ষোভ দেখিয়ে কি লাভ? বিক্ষোভের প্রশ্ন ওঠেই বা কেন?

অতএব সুভাষ ফিরে এলেন ছেলের দল নিয়ে।

কটক স্টেশন। বেণীমাধব বাবু আজ চলে যাচ্ছেন কটক ছেড়ে।

স্টেশন প্ল্যাটফর্মে ছাত্রদের ভিড়।

এক ছাত্রদলের ভিড়ের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন বেণীমাধবাবু।

কিন্তু তাঁর চোখ দুটো কাকে যেন খুঁজছে।

সুভাষ কৈ? সুভাষ কোথায়?

সুভাষ এমন সময় স্টেশনে এলেন। হাতে সুন্দর একটা ফুলের মালা। শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে সে মালা তিনি পরিয়ে দিলেন বেণীমাধবের কণ্ঠে। প্রণাম করলেন আভূমি নত হয়ে।

সুভাষকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন বেণীমাধব বাবু।

আশীর্বাদ করলেন তাকে।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি একটা মানুষের মত মানুষ হও।

নিয়মিত সান্ধ্য-ভ্রমণ শেষে বাড়ী ফিরছিলেন সুভাষ, সঙ্গে বন্ধু চারু। একটা বাড়ীর সামনে বেশ কিছু লোকের ভিড় দেখে থমকে দাঁড়ালেন ওঁরা দুজনেই। একী, কারা যেন কাঁদছে।

সকালের দিকে বাড়ির কর্তা মারা গেছে। এখনও মৃতদেহ শ্মশানে যায় নি কেন?

সেইজন্যেই তো কান্না। মৃতদেহ সৎকার হচ্ছে না বলেই কান্না।

কেন? সৎকার না হওয়ার কারণ কী? ভদ্রলোক বসন্ত রোগে মারা গেছে তাই তার মৃতদেহ কেউ ছুঁতে চাচ্ছে না!

সুভাষ ক্রোধে যেন ফেটে পড়লেন।

মৃতদেহের সৎকার হচ্ছে না আর আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন? এত ভয়, এত কুসংস্কার কেন আপনাদের?

সুভাষ মনস্থির করে নিয়েছেন এরই মধ্যে।

বেশ, কেউ যখন মৃতদেহ সৎকার করতে যেতে রাজী নয়, আমি একাই যাব। আমি একাই শ্মশানে গিয়ে মৃতদেহ সৎকার করে আসব।

ভিড় সরিয়ে এগিয়ে যেতে চাইলেন সুভাষ।

চারুর বাধা দেওয়া মানতে রাজী নন তিনি।

তুমি আমার বাড়ি গিয়ে খবর দাও ভাই। আমি শ্মশানে যাচ্ছি কখন ফিরব কোন ঠিক নেই।

চঞ্চল হয়ে উঠল ভিড়।

কে একজন যেন জিজ্ঞেস করল—ছেলেটি কে?

রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসুর ছেলে।

সরকারী উকিল রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসু? তাঁরই ছেলে?

অবাক উপস্থিত অনেকেই।

ভিড়ের মধ্যে তখন রোল উঠেছে। আমি যাব।

সুভাষচন্দ্র বললেন: নিশ্চয়ই যাবে। ভয় কি? প্রাণের উপর এত মায়াই বা কেন? বিবেকানন্দের কথা তো ভুললে চলবে না ভাই, 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' জীব সেবাই তো শিব সেবা।

কিছুদিন পর একসময় চারু এসে হাজির। একটা বিশেষ সংবাদ বহন করে নিয়ে এসেছেন আর এ সংবাদ পাঠিয়েছেন তাঁরই শিক্ষাগুরু বেণীমাধব বাবু। লিখেছেন কৃষ্ণনগর থেকে।

সুভাষ পড়লেন হেড মাস্টার মশাই বেণীমাধব বাবুর লেখা চিঠিটা।

চিঠিটা পড়া শেষ করে বললেন, মাস্টার মশাই লিখেছেন তাঁর স্কুলে ফার্স্ট ক্লাশের ছাত্র হেমন্তকুমার সরকার বায়ু পরিবর্তনের জন্য কটক যাচ্ছে। আমি যেন তার জন্য পুরীর সমুদ্রের ধারে থাকার উপযুক্ত একটা যায়গার ব্যবস্থা

অন্ততঃ করে দিই। লিখেছেন, হেমন্ত চমৎকার ছেলে সামান্য আলাপ করলেই বুঝতে পারবে ওর চরিত্র।

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সুভাষ। চোখে মুখে একটা বিরাট ঔৎসুক্য।

জিজ্ঞেস করলেন, হেমন্ত কোথায়?

আমাদের ওখানেই উঠেছে।

বাবা আমি একবার যাচ্ছি। এখনই ফিরে আসব।

জানকীনাথ বসু সম্মতি দিলেন।

সুভাষ চারুর সঙ্গে এলেন তাঁর বাড়িতে।

বাইরের ঘরে একটি কিশোর বসে আছে। শ্যামবর্ণ, দীর্ঘায়ত দীপ্ত চক্ষু এই কিশোরের। পরিচয়ের অপেক্ষা নেই। এ যেন বহু কালের চেনা, দীর্ঘকালের জানা।

তুমি হেমন্ত সরকার?

হ্যাঁ, তুমি নিশ্চয়ই মাষ্টার মশাইয়ের বহু কথিত সুভাষচন্দ্র?

আমাদের বাড়ি যাওনি কেন?

তোমাদের বড় লোকের বাড়ি, সেখানে আমার মত গরীব কি উঠতে পারে?

সুভাষের কণ্ঠে এবার ফুটে ওঠে রুদ্ধ অভিমান।

বড়লোকের ঘরে জন্মেছি, সে কি আমার অপরাধ? জন্মের ক্ষেত্রে আমার তো কোন হাত নেই, ভাই।

কাঠজুড়ি নদীর তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সুভাষ আর হেমন্ত।

হেমন্ত বললেন: এস সুভাষ। এবার আমাদের কথাবার্তা শুরু করি। তবে কথাটা কিছু গোপনীয়ই বটে।

এ জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। কাঠজুড়ি নদীর বাঁধের উপরে পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ চলে এসেছেন ওঁরা। এখন একটু বসা দরকার। স্থির হয়ে একস্থানে বসতে না পারলে আলোচনাটা যথাযথ পথে এগিয়ে যাবে না। উড়ু উড়ু ভাব নিয়ে কোন গভীর বিষয়ে আলোচনাও তেমন ফলপ্রসূ হয় না। সুতরাং ওঁরা এবার স্থির হয়ে বসে পড়লেন।

হেমন্ত জজ্ঞেস করলেন : বিপ্লবের পথ ছাড়া দেশকে স্বাধীন করা সম্ভব নয়। তোমার কি মত ?

এ তো জাজ্জ্বল্যমান সত্য। আমিও সে কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। স্বাধীনতা কেউ দেয় না। স্বাধীনতা ভিক্ষালব্ধ সম্পত্তি নয়। স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হয়। সুভাষের দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়।

হেমন্ত উৎসাহিত সুভাষের কথায়।

স্বাধীনতা আমাদের অর্জন করতে হবেই। এবং তা দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করেই।

নিশ্চয়ই। দৈহিক দুর্বলতাই সব অনর্থের মূল। আমায় দেহে, মনে, আত্মবিশ্বাস—সর্বক্ষেত্রে দুর্বল।

সুভাষের তাতে বিন্দুমাত্র দ্বিরুক্তি নেই।

কিন্তু অস্ত্রে চালানোর সময়েও তো দৈহিক শক্তির প্রয়োজন।

তুমি আমাদের গুপ্ত সমিতিতে আসবে ?

তোমাদের গুপ্ত সমিতির লক্ষ্য কি ? কী হয় ওখানে ?

লক্ষ্য অনেক। রিভলভার প্র্যাকটিস হয়। তুমি আসবে সমিতিতে ?

'নিশ্চয়ই আসব'। কোন আবেগকে প্রশ্রয় দিয়ে এ কথা সে দিন বলেন নি। বাস্তববোধকে বিসর্জন দেন নি তিনি।

মনে পড়ে বারবার তাঁদের কথা, যাঁরা স্বাধীনতার জন্য ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেলেন। মনে পড়ে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সত্যেন বোস—এঁদের কথা, এঁদের দেশ-প্রেমের কথা। আমাদের সকলের জন্যে এঁদের ত্যাগ স্বীকার করার কথা।

সুভাষ যোগ করলেন আরও একজনের কথা—তিনি শ্রীঅরবিন্দ।

সুভাষ এঁদের কথা অনেক আগেই ভেবেছেন।

তাই তাঁর পড়ার ঘরের দেওয়ালে এঁদের ছবি টাঙানো। ছবি রয়েছে বিবেকানন্দেরও। সেদিন সুভাষের পড়ার ঘরে এলেন সুভাষেরই এক আত্মীয়। ইনি একজন জাঁদরেল পুলিশ অফিসার।

কী ব্যাপার সুভাষ ? তোমার পড়ার ঘরের দেওয়ালে কাদের ছবিগুলো টাঙিয়েছ ?

সুভাষের ও বিস্ময়ের সীমা নেই। কেন, ছবিগুলো চিনতে না পারার মত কি ? যদিও ছবিগুলো খবরের কাগজ থেকে কেটে পিস্‌বোর্ডে আঠা দিয়ে জুড়েই টাঙিয়েছেন সুভাষ। তবু পুলিশ অফিসার বুঝতে পেরেছেন ওগুলো কাদের ছবি।

ওঁদের কে না চেনে ? অরবিন্দ, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম; কানাইলাল. বিবেকানন্দ—এসব মানুষের ছবি তো সকলের চেনা।

তোমার কর্তব্য এখন পড়াশুনা করা সুভাষ, রাজনীতি করা নয়। গম্ভীর মুখে উপদেশ দিয়েই বের হয়ে এসেছিলেন সেই পুলিশ অফিসার। জানতেন এর বেশী সুভাষকে বলা অর্থহীন।

তাই সুভাষকে আর কোন কিছু না বলে তিনি সোজা এসে ঢুকলেন জানকীনাথের বৈঠকখানায়। বললেন সব কথা।

সন্ধ্যের আগে যথারীতি বাড়ি ফিরলেন সুভাষ।

পড়ার ঘরে ঢুকেই সুভাষ অবাক। একী! দেওয়াল শূন্য কেন ? ছবিগুলোই বা গেল কোথায় ? সারা দেওয়ালটা শুধু পুলিশ অফিসারের রক্তচক্ষুর আর ক্রোধের সাক্ষী হিসেবে খাঁ খাঁ করছে।

সারদা ঝি কি যেন কাজ করছিল সেই ঘরেই। সারদাকে জিজ্ঞেস করলেন সুভাষ : দেওয়ালের ছবিগুলি কোথায় গেল ?

কর্তাবাবু এসে হুকুম দিয়েছেন ছবিগুলো সরিয়ে ফেলতে।

বাবা হুকুম দিয়েছেন ?

সুভাষ মুহূর্তের জন্য চুপ করে গেলেন।

তারপর একটা মমতা ভরা দৃষ্টি তাকালেন শূন্য দেওয়ালটার প্রতি। দেখলেন ছবিগুলো নেই কিন্তু বিবেকানন্দের ছবিটা রয়েছে। ওটা সরিয়ে ফেলা হয়নি।

যাক ভালই হয়েছে। বিবেকানন্দের ছবিটা তো রয়েছে।

তিনিই তো বিপ্লবের রাজা। সুভাষ মনে মনে উচ্চারণ করলেন :

আমি আর কিছুই জানি না। শুধু তোমাকেই জানি। তোমাকে জানলেই তো পাপ, দুর্বলতা, ভীরুতা—সব কিছু আপনিই পালাবে।

তুমি তো সন্ন্যাসী! কিন্তু তোমার এ সন্ন্যাস তো তোমার ব্যক্তি জীবনের মুক্তির জন্য নয়, দেশের মুক্তির জন্যেই তো তুমি সন্ন্যাসী, মানুষের মুক্তির জন্যেই তো তুমি পরিব্রাজক! আমি শুধু শক্তি চাই। তোমার আশীর্বাদই আমার চলার পথের পাথেয়।

সুভাষ ভাবলেন, দেশ মুক্তির জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামই তাঁর জন্য নির্ধারিত। সুতরাং এখন শুধু পড়াশুনা।

সামনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা।

আশ্বস্ত হলেন জনকীনাথ, আশ্বস্ত প্রভাবতী দেবীও। তাহলে ছেলে এবার পড়াশুনায় মন দিয়েছে আর মন সংযোগ যখন করেছে তখন ভাগ্যদেবী নিশ্চয়ই মুখ ফিরিয়ে রইলেন না।

উনিশ শ' তেরো সালের জুলাই মাস।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল। এ পরীক্ষায় সুভাষ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। প্রথম হয়েছিলেন কলকাতার মিত্র ইনষ্টিটিউট থেকে প্রমথ সরকার আর তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন চাইবাসা স্কুলের প্রিয়রঞ্জন সেন।

এই সুখবর বয়ে টেলিগ্রাম এসে পৌচেছে কটকে। জানকীনাথ বাবুর কাছে। টেলিগ্রাম করেছেন সুভাষের দাদা শরৎচন্দ্র বোস।

খুশী জানকীনাথ বাবু। পুত্র-গৌরবে আহ্লাদে আটখানা প্রভাবতী দেবী। তাঁর সুভাষ কি কখনও পরীক্ষায় খারাপ ফল করতে পারে? এখন একটি মাত্র প্রশ্ন সুভাষকে কোন কলেজে ভর্তি করানো যায়?

ঠিক হল কোলকাতায় প্রেসিডেন্স কলেজে ভর্তি করা হবে।

সুভাষ ভর্তি হলেন। অঙ্ক, লজিক আর সংস্কৃত এই হল তাঁর পাঠ্য বিষয়। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অঙ্কে একশোয় একশ, আর সংস্কৃতে একশোয় পঁচানব্বই। এ কলেজে অধ্যাপকগুলীর মধ্যে তখন রয়েছেন জগদীশচন্দ্র বসু, মনোমোহন ঘোষ, প্রফুল্ল ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়—সবাই এদেশের কৃতী সন্তান।

এঁদেরই সাহচর্য পেলেন সুভাষ এ কলেজে এসে। ছোট মফঃস্বল শহর

ছেড়ে বিরাট রাজধানী কোলকাতায় এলেন সুভাষ। জাগরণের আবহাওয়ার মধ্যে পৌঁছে চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি।

কলেজের ছুটি হল। আর সুভাষ ঠিক করলেন, এই প্রথম ছুটিতেই তিনি যাবেন কৃষ্ণনগর। হেমন্ত সরকারের সঙ্গে দেখা করা তাঁর আশু প্রয়োজন।

সুভাষ পৌঁছালেন কৃষ্ণনগর। এলেন হেমন্ত সরকারের বাড়ীতে।

আগেই ঠিক করা ছিল, ওঁরা যাবেন মুর্শিদাবাদ, যাবেন পলাশী।

সুভাষের বাসনা, দেখবেন পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র, দেখবেন সেই—ইতিহাস প্রখ্যাত আম্রবন। সেই যুদ্ধক্ষেত্রই সে তাঁদের কাছে মহাতীর্থ। সেখানেই একদিন মোহনলাল আর মীরমদনের সৈন্যদল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ চালাচ্ছিল। আর স্থাপন করেছিল ইংরাজরা স্মৃতিস্তম্ভ—কিন্তু সে স্মৃতিস্তম্ভ তো বিশ্বাসঘাতকতার। সেই স্মৃতিস্তম্ভ তো মনুমেন্ট অফ মেম্রারিং ট্রেচারি।

সুভাষ প্রেসিডেন্সি কলেজে এসেই পেলেন নতুন বন্ধু। দিলীপ কুমার রায়। প্রখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ছেলে দিলীপ।

দুজনের মধ্যে ভাব জমে গেল খুব তাড়াতাড়ি।

সুভাষ স্থাপন করলেন কলেজে ডিবেটিং ক্লাব।

এ ক্লাবে দিলীপকে নিয়ে আসতেই হবে। সুভাষ একদিন তাই খুব ভোরে উঠেই পায়ে হেঁটে চলে এলেন নিজেদের এলগিন রোডের বাড়ি থেকে দিলীপদের থিয়েটার রোডের বাড়ি।

কি ব্যাপার সুভাষ, এত সকালে? কলেজ যাবে না?

নিশ্চয়ই যাব। আর আজ কলেজের প্রয়োজনেই তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমাদের ডিবেটিং ক্লাবে যোগ দাও।

কিন্তু ভাই আমার ঐ সব তর্কাতর্কির মধ্যে অংশ গ্রহণ করতে ভাল লাগে না। কি লাভ হবে ওতে?

সে কি? সুভাষের সীমা-পরিসীমা নেই। ছাত্রদের মধ্যে আজ তো তর্কবিতর্কের অভ্যেস গড়ে তোলার বিশেষ প্রয়োজনীতা হয়েছে। দেশকে

নেতৃত্ব দিতে হবে। তাই এখন তর্কযোদ্ধা আর সুবক্তার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

দিলীপ জিজ্ঞেস করেন, স্বাধীনতা আনবে কি করে?

সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে।

অস্ত্র কোথায় পাবে?

সুভাষের দ্বিধা নেই। দ্বিধাহীন কণ্ঠে উত্তর দিলেন: এদেশে যদি অস্ত্র না পাওয়া যায় বিদেশ হতে অস্ত্র আনা হবে।

স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠেন সুভাষ।

কিন্তু এ আকাশ-কুসুম কল্পনা। তার চেয়ে যা তোমার নাগালের মধ্যে রয়েছে তাই করার চেষ্টা কর।

কী সেটা!

সন্ন্যাস!

চমকে ওঠেন সুভাষ। ফিরে এসে ভাবলেন সুভাষ অনেক বারই দিলীপের নির্দেশিত পথের কথা। সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে। দেশের মুক্তির আগে নিজের মুক্তির পথ তাঁকে তৈরী করতে হবে।

না, দিলীপ ঠিকই বলেছে, ঈশ্বর দুর্লভ হয়েও সুলভ। ঈশ্বর সান্নিধ্য পেলে আর কেউ বলতে আসবে না। সমস্ত ক্ষুদ্রতা পূরণ হয়ে যাবে সব তুচ্ছতা। কৃষ্ণনগরের হেমন্ত সরকারের বাড়িতে এসে হাজির হলেন সুভাষ। ঘরে ঢুকে বললেন, আমি সন্ন্যাসী হব ঠিক করেছি। চলো বেরোই পথে।

হেমন্ত বন্ধুত্বে উদার। আমি যে সবসময় প্রস্তুত হয়েই রয়েছি সুভাষ। কিন্তু তোমার বাড়ি? তাঁরা সব কিছু কি জানেন?

হয়তো বা খানিকটা অনুমান করে নেবেন।

হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন ওঁরা ইন্দ্রদাস বাবাজীর আস্তানায়, আস্তানা ছাড়া আর কি? শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব ঋতুতেই নিরাসক্ত ভাবে তিনি গাছতলাতেই রয়েছেন। পরিব্রাজকের বৃত্তি নিলেও মাধুকরী তিনি করেন না। যদি কেউ কিছু দিয়ে যান তাহলেই খান, আর তা হলে উপোস। ওঁরা দেখলেন সন্ন্যাসী ইন্দ্রদাস বাবাজী মাটিতে শুয়ে আছেন। নিরাসক্ত নির্ভর।

পায়ের উপর দিয়ে একটা সাপ চড়ে বেড়াচ্ছে। অথচ সন্ন্যাসীর ভয় নেই কোন চাঞ্চল্য।

সন্ন্যাসী তাকালেন সুভাষের মুখের দিক। ও মুখে শুধু পরহিতার্থে নিজেকে উৎসর্গ করার স্পষ্ট চিহ্ন। সন্ন্যাসী অবাক। বললেন, বেশ তো, শিষ্য যখন হতেই চাও তাহলে কিছুদিন অন্ততঃ যাওয়া-আসা করো। তারপর তো শিষ্যত্ব।

আর কোন বিশেষ উত্তর দেওয়ার উত্তর জানা নেই সুভাষের। জানা নেই হেমন্তরও।

তবু যাওয়া-আসা শুরু হল ওদের নিয়মিত। কিন্তু সাধুর দীক্ষা দেওয়ার সময় হলো না। এল না সেই শুভক্ষণ।

একদিন তাঁরা সাধুর আস্তানায় এসে অবাক হলেন। সাধু তাঁর পুঁটুলি বেঁধে কমণ্ডলু নিয়ে বসে আছেন।

আমি চলে যাচ্ছি বেটা।

কোথায় যাচ্ছেন ?

সন্ন্যাসীর কোন ঠিকানা আছে ? আসলে সন্ন্যাসীর বেশীদিন একস্থানে থাকতে নেই। একটা কেমন যেন মায়া পড়ে যায়।

কিন্তু আমাদের দীক্ষা নেওয়ার কি হবে ?

তোমাদের গুরু হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। তোমাদের গুরু অন্য কোথাও রয়েছেন।

হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে।

এলেন ওঁরা হরিদ্বারে। গুরুর সন্ধান ওঁদের পেতেই হবে।

পরনে এখন গেরুয়া। যথার্থই যেন ওঁরা নিয়েছেন প্রব্রজ্যা।

সুভাষের এলগিন রোডের বাড়িতে তখন সোরগোল শুরু হয়েছে সুভাষ কোথায় ? সুভাষ কোথায় ? তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। দেখতে দেখতে কেটে গেল দিন।

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন প্রভাবতী দেবী। মার মনে সান্ত্বনা কোথায় ? তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস ছেলে সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

জানকীনাথ বললেন, ব্যস্ত হয়ো না। আমি দেখছি কতদূর কি করা যায়। টেলিগ্রাম করা হল দেওঘরের রামানন্দ স্বামীর আশ্রমে। টেলিগ্রাম করা হল

হরিদ্বারে রামকৃষ্ণ মিশনে। কিন্তু কোথাও হতে কোন খোঁজখবর পাওয়া সম্ভব হল না।

সুভাষ আর হেমন্ত তখন হরিদ্বারের একটা হোটেলে আশ্রয় নিয়েছেন। কিছু খাওয়ার ভীষণ প্রয়োজন। সারাদিনে তাঁরা হেঁটেছেনও অনেক।

হোটেল ম্যানেজার অবাক। সে কী! দু'জন সন্ন্যাসী হোটেলে!

সে কি, আপনার হোটেলে খাবেন?

কেন খাব না? ক্ষতি কি? আমার স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাসী। তিনি তো সব সংস্কারের ঊর্ধ্বেই ছিলেন।

আপনারা বাঙালী নিশ্চয়ই? ম্যানেজারের কথায় যেন একটু বিদ্বেষের আভাস।

হ্যাঁ, বাঙালী।

আপনারা মাছ খান নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ। সম্মতি জানান ওরা দুজনেই।

কিন্তু আপনাদের তো এখানে খাওয়া চলবে না!

আমাদের অপরাধ? কেন আমরা এখানে খেতে পাব না?—সুভাষের কণ্ঠ বেশ রুক্ষ।

কারণ এখানে মাছখেকো বাঙালীর খেতে দেওয়া হয় না

তবে এ হোটেলের খাবার আমরা খাব না।

আবার পথ।

আহার না হয় না-ই জুটল। কিন্তু মাথা গোঁজার মত একটা ঠাঁই দরকার, অবশেষে ওরা দু'বন্ধু পেল একটা আশ্রয়। অনেক সাধু এখানে আস্তানা পেড়েছেন। হয়তো বা এখানে আশ্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে গুরুও মিলে যেতে পারে গুরুর সন্ধানেই তো ছুটে আসা।

আমরা এখানে থাকতে পারি কি? জিজ্ঞেস করলেন হেমন্ত আশ্রমের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসীকে।

আপনারা কি বাঙালী?

সুভাষের অহঙ্কারের যেন সীমা-পরিসীমা নেই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে।

হ্যাঁ, আমরা বাঙালী।

তাহলে বাপু তোমাদের এখানে স্থান নেই।

কেন—বাঙালীদের আপনারা এত ভয় করছেন কেন? তারা মাছ খায়, সেই জন্য?

না, বাঙালীরা বিপ্লবী। ওরা ইংরেজদের উপর বোমা ছোড়ে। ওরা ইংরেজ হটাতে চায় এদেশ থেকে।

কিন্তু আমরা তো সন্ন্যাসী।

তবু তোমাদের আশ্রয় দিতে পারি না। হয়তো বা আবার পুলিশ হাঙ্গামায় পড়তে হবে আমাদের। কি দরকার ও সব ঝামেলা বাড়িয়ে। আমাদের অন্ততঃ শান্তিতে থাকতে দাও।

ঠাঁই নেই। ঠাঁই নেই! মস্ত অপরাধ, ওরা বাঙালী। সুতরাং আবার পথ।

আর মিছে কেন হরিদ্বারে পড়ে থাকা? চল, এবারে বৃন্দাবনের পথের পথিক হই। চল মুসাফির চল।

বৃন্দাবনে পৌঁছলেন ওঁরা। কিন্তু প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায় পাণ্ডার উপদ্রবে। কোথায় যাবেন। আমাদের এখানেই আসুন। ভাল ব্যবস্থা! ভাল ঘর! ভাল খাওয়া!

সুভাষ বললেন, আমরা গুরুকুল যাব।

কোন হিন্দু কি সেখানে যেতে পারে? ছিঃ ছিঃ ও কথা মুখে আনাও পাপ।

গুরুকুল আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত আশ্রম। ওরা হিন্দু নয়। ওরা মূর্তি পূজার বিরোধী।

তা হোক। তবু আমরা যাবই।

বৃন্দাবনের সাধ মিটে গেল ওদের। বৃন্দাবন থেকে এলেন আগ্রা, তারপর কাশী, সবশেষে এলেন ওঁরা গয়ায়; এসে পৌঁছালেন গয়ার মঠে। ঠিক সময়েই এসেছেন। পাতা পেতে খেতে বসেছনে অনেকেই।

মঠাধ্যক্ষ আতিথেয়তায় প্রসারিত হয়ে এগিয়ে এলেন, আপনারা কাশী হতে আসছেন ত? সেখানকার মঠাধক্ষ চিঠি লিখে জানিয়েছেন আপনাদের কথা।

হেমন্ত মাথা নেড়ে জানালেন—আমরাই।

আপনারা এখানেই থাকুন। কোন অসুবিধা হবে না। আর এখন নিশ্চয়ই

আপনারা ক্ষুধার্ত। খাবার জায়গাও হয়ে গেছে, একেবারে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিন।

সুভাষ আর হেমন্ত একবার চোখে চোখে কথা বললেন। মন্দ কি! এগিয়ে এলেন আর একজন সন্ন্যাসী! জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি ব্রাহ্মণ?

কেন বলুন তো? সুভাষ বিস্মিত এ প্রশ্নে।

তার মানে ব্রাহ্মণ যাঁরা তাঁরা এই দিকে খেতে বসবেন, আর যাঁরা ব্রাহ্মণ নন তাঁরা ঐ দিকে বসবেন।

হেমন্ত আতঙ্কিত। সুভাষ গম্ভীর।

এখানেও জাত! সন্ন্যাসীর আবার জাত আছে নাকি?

যাক বাবা খেয়ে আর লাভ নেই। পথই ভাল।

কিন্তু তৃষ্ণায় জলের যে বড় প্রয়োজন?

পথ বলতে গিয়ে তাঁরা সন্ধানও পেলেন একটা কূয়োর। পাশেই একটা বালতি। দড়িও বাঁধা আছে। সুভাষ দড়িটা ধরতে যাচ্ছেন এমন সময় ছুটে এল গার্ডমতন একজন লোক।

আপনি কোন্ জাত? আপনি বামুন হলে এ দড়িতে ছুঁতে পারেন তা না হলে নয়।

আর নয় ভাই। খুব হয়েছে। এবার চলো বাড়ী ফিরে যাই। এ ছুৎমার্গ লেবেল আঁটা সন্ন্যাস আমাদের পোষাবে না।

অতএব এবার ঘরে ফেরার পালা। কৃষ্ণনগর।

এলগিন রোডের মোড়ে ট্রাম থেকে নামলেন সুভাষ। তারপর মাথা উঁচু করে শংকাশূন্য সুভাষ বাড়ি ফিরলেন। যেন কোন কিছুই ঘটেনি। সুভাষ এমনি ধারা নির্বিকার।

প্রভাবতী দেবী সংবাদ পেলেন। সুভাষ নিজেই ফিরে এসেছেন!

সুবি, ফিরে এসেছিস! মা জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে। তুই আমাকে কষ্ট দিবি বলেই জন্মেছিস। কাঁদলেন প্রভাবতী দেবী।

আর কাঁদছ কেন মা? আমি তো ফিরে এসেছি।

জানকীনাথ এসে দাঁড়ালেন। গম্ভীর, কিন্তু স্নেহ যেন সর্বত্র প্রকাশিত। সুভাষ প্রণাম করলেন বাবাকে। বাবা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কাঁদবেন

না ভেবেও কেঁদে ফেললেন।

ছেলে ফিরে আসার এ যে আনন্দাশ্রু !

আর একজনও সুভাষ ফিরে আসায় খুব খুশী। সে ঝি সারদা।

সুবি, তুই এসেছিস। আর আমাদের ছেড়ে যাস না। তোর জন্য আমরা ভেবে ভেবে অস্থির।

এখন তো ফিরে এসেছি। এবার সুস্থির হও।

কিন্তু তুই আর কখনো এরকম পাগলামী করিস না।

সুতরাং পড়াশুনায় মন দিতে হল সুভাষকে।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল।

কিন্তু পরীক্ষার ফল আশাপ্রদ নয়। প্রথম বিভাগে পাশ করেছেন এইমাত্র। কিন্তু গুণানুসারে তাঁর স্থান একশো চব্বিশ জনের পর। পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ায় মনঃক্ষুণ্ণ অনেকেই কিন্তু অতীতের কথা নিয়ে দুঃখ বিলাসে আত্মমগ্ন হওয়া মূল্যহীন। বরং আগামী দিনের জন্য প্রস্তুত হওয়াই ভাল।

ঠিক করলেন এবারে মন দেবেন পড়াশোনায়।

শুধু পড়া—আর পড়া।

বিগত পরীক্ষার ফলের ঘাটতিটুকু এবার পূরণ করে নিতেই হবে কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া বুঝি তার ভাগ্যে নেই।

দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া বেশ জটিল। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ঘোষণা করলেন 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটা রাজদ্রোহী মূলক, সুতরাং ও গান গাওয়া চলবে না।

হিন্দু হোষ্টেলের ছাত্রেরা মিলিত হল হোষ্টেলের ঘরে। সুভাষও সে সময় সেখানে এসেছিলেন কি যেন একটা কাজে। তিনিও যোগ দিলেন ছাত্রদের এ সভায়। একজন ছাত্র বললেন—আমাদের হোষ্টেলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে সরকারের নিষিদ্ধ 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটাই আমরা গাইব।

সুভাষ সমর্থন জানালেন, নিশ্চয়ই গাইবে। এ গানই তো অনুষ্ঠানে গাইবার মত গান।

এবার প্রশ্ন উঠল অনুষ্ঠানের সভাপতি কে হবেন ?

স্থির হল, হিষ্ট্রির প্রফেসর মিঃ ওটেন।

সাইকোলজির প্রফেসর খগেন মিত্রের কাছ হ'তে গানের তালিম নেওয়া হল।

ইংরেজির প্রফুল্ল ঘোষ, সায়েন্সের মিষ্টার পিক—সবাই এসেছিলেন ছাত্রদের আয়োজিত এই সভায়।

সভা শুরু হল। ছেলেরাও খগেন মিত্তিরের পরিচালনায় গান গাইলেন ব্রিটিশ সরকারের নিষিদ্ধ সেই গানটিই।

অস্বস্তি বোধ করলেন মিঃ ওটেন সভাপতির আসনে বসে! আর মনে মনে যে প্রতিহিংসা সঞ্চিত হচ্ছিল তাই বুঝি প্রকাশিত হল তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করার পরই প্রকাশিত হল তাঁর শোধ তোলবার বাসনা। বললেন, ইউ বেঙ্গলিজ আর বার্বেরিয়ান্স—প্রকাশ্য সভায় এ অপমান!

ছাত্রেরা চঞ্চল। দেখা গেল চাপা বিক্ষোভ। খগেন মিত্র সভা থেকে বের হয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধবৎ সমস্ত ছাত্রই সভা ছেড়ে বের হয়ে এল। মিঃ ওটেনের ভাগ্যে বক্তৃতা শেষ করার সুযোগ এল না সেদিন।

কিন্তু ছাত্রদের বিক্ষোভ চাপা রইল না। চিরকাল নীরবে সমস্ত অপমান সহ্য করার দিন আর নেই। এখন শুরু হয়েছে পালা বদল। এর প্রতিবিধান করতেই হবে।

সুভাষের বক্তব্য, প্রতিশোধ নিতেই হবে। চুপ করে বসে থাকা চলে না। ক্লাসে ছেলেদের তো অপমান করেছেই, এ একেবারে সমগ্র বাঙালি জাতি ধরে অপমাস! স্থির হল প্রিন্সিপ্যাল এইচ, আর জেমসের সঙ্গে দেখা করবে ছেলেরা।

দেখাও করল ওরা। সুভাষই মি: জেমসের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন ছাত্রদলের প্রতিনিধি হয়ে। কিন্তু পণ্ডশ্রম। প্রিন্সিপ্যালের বক্তব্য: ছেলেরাই দোষ করেছে সভা পরিত্যাগ করে।

চমৎকার! সাহেব বলে, মিঃ ওটেনের কোন অপরাধই থাকসে পারে না।

সুভাষ দৃপ্ত হয়ে উঠলেন। এর প্রতিবাদ আমাদের জানাতেই হবে। অন্যায় সহ্য করার মত পাপ আর অন্য কিছুতে নেই। ধর্মঘট করব আমরা।

ছাত্ররা রাজী। সুভাষ নেতৃত্ব দিলেন।

প্রেসিডেন্সির মত কলেজে ধর্মঘট। সারা কোলকাতা শহর বিস্ময়াবিষ্ট। প্রথমদিন চলল ধর্মঘট—দ্বিতীয় দিনও।

টনক পড়ল কলেজ কর্তৃপক্ষের। প্রিন্সিপ্যাল ডেকে পাঠালেন দলনেতাকে। সুভাষচন্দ্র এলেন প্রিন্সিপ্যালের ঘরে। মিঃ ওটেনও রয়েছেন। ওটেনের সঙ্গে মোকাবিলার জন্যেই ডেকে পাঠানো।

ওটেন দুঃখ প্রকাশ করলেন। সুভাষ এলেন প্রিন্সিপ্যালের ঘর হ'তে। ছাত্রদল উচ্ছ্বসিত। তাহলে আর ধর্মঘট কেন? ছাত্রেরা যোগ দিল ক্লাসে।

কিন্তু নিবন্ধঃ যেন কর্মণা। কয়েকটা দিন পার হতে না হতেই ওটেন আবার একটা দৃশ্য সৃষ্টি কোরলেন। মিঃ ওঠেন তখন পড়াচ্ছিলেন। পাশের বারান্দা দিয়ে কমল বসু নামে একটি ছাত্র হেঁটে চলে গেল। পায়ের জুতোর শব্দটা যেন একটু অস্বাভাবিক। ওটেন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে পড়া থামিয়ে একবার তাকালেন কমল বসুর দিকে। শব্দটা অস্পষ্ট হয়ে এল, মিঃ ওটেন আবার পড়ানোয় মন দিলেন।

কমল যেন কাকে খুঁজতে এসেছিল। তাই আবার সে ফিরল সেই পথ দিয়েই। আবার সেই অস্বাভাবিক শব্দ। ওটেন আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। তাঁর ধারণা তাঁকে ব্যঙ্গ করেই বুঝি বা ছেলেটির যাতায়াত। ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে দুহাতে কমল বসুকে প্রবল ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন মিঃ ওটেন। কমল মাটিতে পড়ে গেল। আর একজন ছাত্র এগিয়ে এসেছিল কমলকে সাহায্য করতে। তাকেও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন মিঃ ওটেন।

এ কী দুর্ব্যবহার! ছেলের দল বের হয়ে এল ক্লাস থেকে। কমলকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তখন ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই। অনেকে আবার দ্বিতীয় ছাত্রটিকেও।

শুরু হল ছাত্রদের শলা-পরামর্শ।

সুভাষ বললেন, এবারে ধর্মঘট নয় এবার অন্য ব্যবস্থা।

সেই নতুন ব্যবস্থাটা যে কি তা অত্যন্ত গোপনে আলোচিতও হয়ে গেল নিজেদের মধ্যে। প্রেসিডেন্সি কলেজের সিড়ির নীচে অপেক্ষা করছে ছেলের দল।

মিঃ ওটেন সিড়ি বেয়ে নিচে নামছেন। বাসায় ফিরবেন এবারে। ছেলের দল দুই দিক থেকে তাকে ধরেছে। কোলাহল উঠল সকলের মধ্যে—'এই যে' —'হিয়ার হি কামস।' শুরু হল মিঃ ওটেনের উপর বেদম প্রহার। যারা মারল তারা কারা ঠিক চিনতে পারলেন না মিঃ ওটেন। প্রহারে প্রহারে জর্জরিত মিঃ ওটেন মাটিতে পড়ে গেছেন। আর ছেলের দল? ওরা মুহূর্তের মধ্যে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

কেঁপে উঠল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আসন। ইংরাজের গায়ে হত।

প্রিন্সিপ্যাল জেমস ডেকে পাঠালেন প্রতিটি ক্লাসের প্রতিনিধিদের। কে মেরেছে মিঃ ওটেনকে? সিড়ির নিচে কারা ছিল? গর্জন করে উঠেন প্রিন্সিপ্যাল মিষ্টার জেমস্।

ছাত্রনেতা হিসেবে শুধু ডাক পড়ল একক সুভাষের।

মিঃ জেমস জিজ্ঞেস করলেন সুভাষকে, তুমি তো ঐ ঘটনার সময় ঐ স্থানে ছিলে ?

হ্যাঁ, স্যার।

ওটেনকে তুমি মেরেছ ?

কখনই না।

মায়ের সময় তুমি ওখানে ছিলে ?

ছিলাম।

তাহলে কে কে মেরেছে তাদের নামগুলো বল তো ?

মাপ করবেন। পরের নাম বলা আমার অভ্যেস নেই। তা আমি পারব না।

মিঃ জেমস বললেন, আমি বলছি তুমি দোষী। আমি তোমাকে সাসপেণ্ড করলাম।

ধন্যবাদ।

সুভাষ বের হয়ে এলেন প্রিন্সিপ্যালের ঘর হতে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে সাসপেণ্ড করা হল সুভাষকে।

প্রভাবতী দেবী বললেন, মোড়লি করার ফল ফলেছে। বেশ হয়েছে।

মেজদা শরৎচন্দ্র বোসের অভিমত কিন্তু ভিন্ন।

প্রিন্সিপ্যালের অর্ডার বের হওয়ার আগেই গভর্ণমেণ্ট একটা কমিশন বসিয়েছে এ ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত বিচার করার জন্যে। সুতরাং কমিশন যখন বসেছেই তখন কমিশনের রায় বের হওয়ার আগে প্রিন্সিপ্যালের অর্ডার বিশেষতঃ কোন ছাত্রকে সাসপেণ্ডের অর্ডার দেওয়ার অধিকার নেই।

এখানে অধিকার-অনধিকারের প্রশ্ন। আইনের সূক্ষ্ম মারপ্যাচ। এ সব ব্যাপারে একজন আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মনে পড়ল সি. আর. দাশের কথা। চিত্তরঞ্জন দাশই একমাত্র যিনি নিরপেক্ষ ভাবে মতামত দিতে পারেন।

সুভাষ ঠিক করলেন তিনি নিজেই যাবেন সি. আর. দাশের সঙ্গে দেখা করতে।

চিত্তরঞ্জন দাশ তখন রাত্রে ডিনার খেতে বসেছেন। পাশেই রয়েছেন স্ত্রী বাসন্তী দেবী। বেয়ারা একটা চিরকুট হাতে নিয়ে প্রবেশ করল। চিত্তরঞ্জনের হাতে পৌছাল সেই চিরকুটটা। পড়লেন তিনি চিরকুটটা।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, থার্ডইয়ার, প্রেসিডেন্সী কলেজ।

তুমিই সুভাষ? তুমি ঔদ্ধত্য ওটেনকে শিক্ষা দিয়েছিলে?

আমি দলে ছিলাম, আমি তা বলে মারিনি। সুভাষের কণ্ঠে কেমন যেন কুণ্ঠা।

আমি তো সে কথা জানতে চাইনি। তুমি দলে ছিলে তার মানেই দলপতি হওয়ার যোগ্যতা তোমার আছে। যাক সে কথা। তোমাদের কলেজের গণ্ডগোল মিটে গেছে?

প্রিন্সিপ্যাল আমাকে সাসপেণ্ড করেছে।

সাসপেণ্ড! চিত্তরঞ্জন একটু বিমর্ষ মুখে তাকালেন সুভাষের মুখের দিকে। চিন্তার ছায়া পড়েছে সেখানে।

কিন্তু আমি এসেছি আপনার কাছে একটা আইনের বিষয় জানতে। এর আগেই গভর্ণমেণ্ট একটা তদন্ত কমিশন বসিয়েছেন। কমিশনের রায় বের হওয়ার আগে প্রিন্সিপ্যালের সাসপেণ্ড করার কোন অধিকার আছে কিনা সেটা জানা দরকার।

তোমার যুক্তিটা সুন্দর! দেখি আগে কমিশনের রায়। যদি ওদের রায় তোমার পক্ষে আসে নিশ্চয়ই আমি চেষ্টা করব প্রিন্সিপ্যালের অর্ডার নাকচ করার জন্য।

আচ্ছা, তাহলে আসি।

সুভাষ প্রণাম করল আর একবার।

শুরু হল তদন্ত কমিশনের কার্যকলাপ। স্যার আশুতোষ কর্ণেল আর মহলানবিশকে নিয়েই গড়া হয়েছে তদন্ত কমিটি।

কমিটি ডেকে পাঠালেন সুভাষকে। কমিটির তরফ থেকে প্রশ্ন করা হল সুভাষকে, একেবারে সরাসরি প্রশ্ন।

মিঃ ওটেনকে ছাত্রেরা দলবদ্ধ হয়ে মেরেছে। তুমি কি তা সমর্থন কর?

সুভাষ অবিচলিত। উত্তর দিলেন ধীর নম্রকণ্ঠে, অথচ তা স্পষ্টতায় ভাস্বর। ছাত্রদের এ আচরণ নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু ছাত্রেরা কোন

পরিবেশে পৌছে প্ররোচিত হয়েছিল এ কাজ করতে তারও বিচার করার প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের বিগত কয়েক বছরের ইতিহাস-ইংরেজ অধ্যাপকদের অনাচার আর অত্যাচারের ইতিহাস। যদি সেই ইতিহাস আমাকে প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে আপনারা অত্যন্ত অনায়াসেই বুঝতে পারবেন সেদিন ছাত্ররা ছিল অত্যন্ত নিরুপায়।

কমিশন শুনলেন সে কথা। লিখলেন। রায়ও দিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে বহিষ্কারের দণ্ডই বহাল রেখেছেন কমিশন।

সুভাষ চলে এলেন কটকে।

জানকীনাথ অবাক। কি রে, তুই হঠাৎ চলে এলি?

কি আর করবো? কোলকাতার কোন কলেজেই তো নেবে না।

সব কথা শুনলেন জানকীনাথ। চিন্তিত তিনি এখন। গম্ভীর হয়ে উঠলেন—আমি জানতাম এই পরিণামই হবে। নেতৃত্ব করতে গেলে এই পুরস্কারই হয়।

সুভাষ বললেন, একজনকে তো নেতা হতে হবে।

তা এখন কি করবে? ভেবেছিলাম বি. এ. পাশ করলেই তোমাকে বিলেতে পাঠিয়ে দেব।

সুভাষ বললেন, তাহলে আমাকে বিলেতেই পাঠিয়ে দিন আমি সেখানেই পড়াশুনা কোরব।

তার আগে রাষ্টিকেশনের কলঙ্ক মুক্ত হও। ওটাও তো ইংরেজদের রাজত্ব। বিদেশের কলেজে গিয়ে মুখ দেখাবে কি করে?

সুভাষের মুখ বেদনাহত।

জানকীনাথ বললেন, আগে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি. এ. পাশ করার ব্যবস্থা কর—বি. এ. পাশ কর তার পর বিলেত।

সুভাষ আবার ফিরে এলেন কোলকাতায়।

ঠিক করলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করবেন।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নয় শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি তো মহৎ, বদান্য, শিবভদ্র। এমন লোকের সঙ্গে দেখা করতে সঙ্কোচই বা কিসের।

সরাসরি আশুতোষের ভবানীপুরের বাসায় হাজির হলেন সুভাষ। ঘরে ঢুকে প্রণাম করলেন আশুতোষকে।

আমি আপনার কাছে এসেছি।

আশুতোষ চিনতে পেরেছেন আগন্তুক ছেলেটিকে।

তুমি সুভাষ না ?

সুভাষ নীরবে মাথা নাড়লেন।

এতদিন কি করছিলে ?

বসেছিলাম। ইউনিভার্সিটি বাধা সরিয়ে না দিলে আমি তো কোন কলেজেই ভর্তি হতেপারছি না।

তুমি তো ম্যাট্রিকুলেশনে সেকেণ্ড হয়েছিলে ?

হ্যাঁ স্যার।

আর আই. এ. তে ?

ভাল ফল করতে পারিনি। কিন্তু আমাকে বি. এ. পড়ার সুযোগ দিন, নিশ্চয়ই ফল এবার ভাল কোরব। ফার্স্ট ক্লাস পাবই।

কী করে বুঝলে ?

আমার অন্তর পুরুষের নির্দেশেই বলছি স্যার।

কিন্তু আবার কোন গোলমাল বাধাবে না তো ?

আমি বুঝি মিছেমিছি গোলমাল বাধাই ?

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রসন্ন সুভাষের উত্তরে।

বেশ আমি রাষ্টিকেশনের অর্ডার প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। কিন্তু মনে থাকে যেন আমার কামনা শুধু ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট নয়, সত্যিকারের মানুষ হতে হবে তোমাকে।

সুভাষ ভর্তি হলেন স্কটিশচার্চ কলেজে।

পিছিয়ে পড়েছেন দু'বছর। সুতরাং কলেজে ঢুকেই মন দিলেন পড়াশুনায়। শুধু পড়াশুনা আর পড়াশুনা। কিন্তু এল একঘেয়েমি। তবু কলেজের একঘেয়ে জীবনের মধ্যে তিনি খুঁজে নিলেন বৈচিত্র্য।

খবর এল ইণ্ডিয়া ডিফেন্স কোর্সে একটা ছাত্রবাহিনী গঠন করা হবে এই মর্মে গভর্ণমেণ্ট অনুমতি দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়কে।

সুভাষ ঠিক করলেন এই বাহিনীতে যোগ দেবেন। সেনাবাহিনীতে যোগ

দেবার সুযোগ পেলেন অবশেষে। এর আগে সরাসরি বেঙ্গল রেজিমেন্টে ঢোকার চেষ্টা করেও তিনি ছাড়পত্র পাননি একমাত্র চোখের দোষের জন্য। তাই এবারে আগে হতেই ডাক্তার সুরেশ সর্বাধিকারীর সঙ্গে দেখা করলেন। ফিট সার্টিফিকেট তার কাছ হতে নিতেই হবে। ডাঃ সর্বাধিকারী হাসিমুখে ফিট সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন সুভাষকে।

সন্ন্যাসী আর সৈনিককে তিনি একই সূত্রে বেঁধে দিতে চাইলেন।

চাই সন্ন্যাসীর নির্বেদ, চাই সৈনিকের দুঃসাহস। আমি যে সন্ন্যাসী, সৈনিক-সন্ন্যাসী।

পরীক্ষায় অবহেলা করেন নি।

বি. এ. পরীক্ষার ফল বেরুল। সুভাষ দর্শনে ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছেন। ফার্স্ট হয়েছেন প্রেসিডেন্সির সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দু'বছর দেরী হয়ে গেল সুভাষের। উনিশ শ' সতের সালে বি. এ. পাশ করার কথা। কিন্তু তিনি পাশ করলেন উনিশ শ' উনিশে। শুধু পরীক্ষার ফল দেখে খুশী সবাই। বাবা-মা-বাড়ীর সবাই খুশী। খুশী চিত্তরঞ্জন, খুশী স্যার আশুতোষও।

ডেকে পাঠালেন সুভাষকে জানকীনাথ।

তুমি তো বিলেত যেতে চেয়েছিলে পড়াশুনার জন্য। যাবে?

যাব। সুভাষ এক বাক্যে রাজী।

আই. সি. এস. পাশ করে ফিরে আসতে হবে।

আই. সি. এস. ইংরেজের অধীনে চাকরী। সুভাষ কেমন যেন বিমর্ষ।

জানকীনাথের এক কথা, হ্যাঁ চাকরী। তবে সেরা চাকরি।

সুভাষ মনস্থির করে নিয়েছেন এর মধ্যেই। তিনি আই. সি. এস. পড়তে বিলেতে যাবেন।

শেষ পর্যন্ত লণ্ডনে পৌঁছালেন সুভাষ। জাহাজ মন্থরগতি হলেও অবশেষে পৌঁছাল লণ্ডনে।

নতুন দেশ, নতুন অনুভূতি, নতুন স্বপ্ন এখন সুভাষের দু'চোখে।

লণ্ডনে পৌছেই সুভাষ ছুটে গেলেন, শুনলেন সেখানে হয়তো বা ভর্তি হওয়ার আশা আছে। তবে অনেক কথার শেষে।

প্রভোস্ট রেডএওয়ের এক কথা, অনেক দেরী হয়ে গেছে। চলতি সেশন দু' সপ্তাহ আগেই শুরু হয়ে গেছে! সেই ক্ষতি পূরণ করবে কি করে? কিন্তু সুভাষের এক কথা দেরী হওয়ার জন্য দায়ী আমি নই। জাহাজ দেরী করে এসেছে ইংলণ্ডে—কয়লা ধর্মঘটের জন্যেই। এর জন্য আমার কি অপরাধ?

রেডএওয়ে কোন কথাই শুনতে চান না। শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন সুভাষের মিলিটারী ট্রেনিং আছে জেনেই ভর্তি করে নিতে।

বন্ধু দিলীপও তখন বিলেতে। বললেন—তুমি বিদেশীর চাকরী করবে?

চাকরী আমি কোরব না দিলীপ। চাকরী ছেড়ে দেব।

হেসে উঠলেন দিলীপ।

বলা খুব সহজ। চাকরী পাওয়ার আগে আমরা অনেক চাকরীই ছাড়তে পারি কিন্তু চাকরী পেয়ে চাকরী ছাড়া অসম্ভব।

কিন্তু সেই অসম্ভবই শেষ পর্যন্ত সম্ভব করলেন বহু অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার নায়ক।

আই. সি. এস. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করলেন সুভাষ। এ সংবাদ এসে পেঁছাল বিলেত হতে ভারতে। উৎসব মুখর জানকীনাথের গৃহ। আনন্দে আত্মহারা বিলেতে সুভাষের বন্ধু-বান্ধবরাও।

কিন্তু সুভাষের এক কথা। না, ইংরেজের গোলামি আমি কোরব না।

বন্ধুরা অবাক হয়ে বললে, বাড়ীতে জানিয়েছ?

হ্যাঁ ভাই, বাড়িতেও জানিয়ে দিয়েছি এ কথা।

তাঁরা জবাব দিয়েছেন? তাঁদের জবাবের জন্যও কিন্তু তোমার অপেক্ষা করা উচিত।

জবাব পেয়েছি—মনঃক্ষুণ্ণ তাঁরা।

সে তো স্বাভাবিক!

কিন্তু সবাই মনঃক্ষুণ্ণ হননি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আমাকে চিঠি লিখেছেন।

সি. আর. দাশ?

হ্যাঁ ভাই। তিনি কিন্তু আশীর্বাদ করেছেন আমার সিদ্ধান্তকে। আহ্বান জানিয়েছেন আমাকে। আমি যেন ফিরে এসে তাঁর পাশে দাঁড়াই।

এরপর আর কোন বাধা অর্থহীন, মূল্যহীন। সুভাষ পদত্যাগ পত্র দাখিল করলেন আই. সি. এস. চাকরীতে।

ভারত তাঁকে ডাকছে। তাঁকে ডাকছে হাজার হাজার অসহায় মানুষ—পরাধীন দেশের নাগরিক।

ডাকছেন চিত্তরঞ্জন। ফিরে এলেন সুভাষ।

দীক্ষা নিলেন চিত্তরঞ্জনের কাছে।

শুরু হল তাঁরই নির্দেশে নতুন পথে নতুন কাজ।

দেশ গঠনের কাজ—স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজ।

উনিশ শ' একুশ সালের কথা। বিলিতি বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসবের মাধ্যমে সুভাষের পদক্ষেপ। আর তা ঘটল চিত্তরঞ্জনের রসারোডের বাড়ীতেই।

সতেরই নভেম্বর। ইংলণ্ডের যুবরাজ এলেন ভারত পরিদর্শনে।

যুবরাজ এসে পেঁছিবেন বোম্বে বন্দরে। সুতরাং সরকার পক্ষ থেকে সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজনের ত্রুটি নেই বিন্দুমাত্র। কিন্তু কংগ্রেস ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত পরিদর্শনে আগমনের প্রতিবাদ জানাতে ধর্মঘটের ডাক দিলেন—সম্বর্ধনা উৎসবে আমরা ভারতীয়রা যোগ দেব না—সম্বর্ধনা উৎসব আমাদের বর্জন করতেই হবে। সারা দেশ সেদিন পালন করবে হরতাল।

বোম্বে হতে দিল্লী এলেন যুবরাজ। দিল্লী থেকে কোলকাতা।

কিন্তু সব নগরীরই এ কী চেহারা!

এ যে মহাশ্মশানের স্তব্ধতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কর্মব্যস্ত কোলকাতা যেন জনমানবশূন্য মরুভূমি। পথে লোক নেই ট্যাক্সি নেই, নেই ঘোড়ার গাড়ী।

কোলকাতায় নেতৃত্ব দিয়েছেন সুভাষচন্দ্র বসু কোলকাতার এই সার্থক হরতালের সব কৃতিত্ব সুভাষচন্দ্রেরই।

এমন সুশৃঙ্খল হরতাল কোলকাতায় এই প্রথম। দুর্জয় গঠন শক্তির অধিকারী সুভাষচন্দ্রের পক্ষে এ সম্ভবপর হয়েছে।

গভর্ণমেণ্ট ভাল চক্ষে নিতে পারলেন না এ ধর্মঘট। ঘোষণা করলেন গভর্ণমেণ্ট, কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বে-আইনী।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র মুখর হয়ে উঠলেন প্রতিবাদে।

এ ঘোষণা মানব না। স্বেচ্ছাসেবকরা পাঁচজন করে দল বেঁধে রাস্তায় খদ্দর বিক্রি করবে। প্রথম দলে থাকবো আমি নিজেই।

দেশবন্ধু সমর্থন করলেন সুভাষকে।

তিনি এক লক্ষ ভলান্টিয়ার চেয়ে প্রচারপত্র ছাপালেন।

পাঁচজন করে স্বেচ্ছাসেবক দল হাজারে হাজারে চাই। সুভাষকেই নিতে হবে সব দায়িত্ব। দেশবন্ধু তখন ব্যস্ত রয়েছেন তিলক স্বরাজ ভাণ্ডার নিয়ে। বাংলার বরাদ্দ লক্ষ টাকা তুলে দেওয়ার দায়িত্ব পড়েছে দেশবন্ধুর উপরে। কি করে তিনি টাকা সংগ্রহ করবেন।

সেদিন খাওয়া দাওয়ার পরে গোপনে ডেকে চিত্তরঞ্জন সুভাষকে বললেন, পুলিশ কখন এসে এ্যারেষ্ট করবে কোন ঠিক নেই। তার আগে তুমি আমার কাজ করে দাও সুভাষ।

এ আবার কী কথা! হুকুম করলেই তো সুভাষ সব সময় প্রস্তুত।

বলুন কী করতে হবে?

আমাকে একলক্ষ টাকা জোগাড় করে দিতে পার সুভাষ?

পারব। কত দিন সময় দেবেন বলুন?

সময় আমি দিতে পারব না সুভাষ। এই মুহূর্তেই আমার টাকাটা চাই।

কিন্তু এই মুহূর্তে আমি একলক্ষ টাকা কোথায় পাব বলুন তো?

তুমি রাজী হলেই টাকার ব্যবস্থা হতে পারে।

কি করে? কিসের রাজী হওয়ার কথা বলছেন?

তুমি বিয়ে করতে রাজী হলেই এ টাকার ব্যবস্থা হয়।

সুভাষ চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ।

তারপর বললেন, আপনি আমায় পরীক্ষা করতে চাইছেন? আপনি তো জানেন, সংসারের জন্য আমি নই। আমি মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গীকৃত বলি— যদি চান আমি ভিক্ষে করে আপনাকে এ টাকা সংগ্রহ করে দিতে পারব নিশ্চয়।

আশীর্বাদ করলেন চিত্তরঞ্জন সুভাষকে।

সেদিনই বিকেলে চিত্তরঞ্জন রসারোডের বাড়িতে বসে চা খাচ্ছেন। চিত্তরঞ্জনের ছোট মেয়ে এসে জানালে, বাবা, পুলিশ সার্জেন্ট এসেছে।

চিত্তরঞ্জন এরকমই আশা করেছিলেন। বললেন, এখানে নিয়ে এস।

পুলিশ কমিশনার মি: কীড নিজেই এসেছেন।

কি খবর মিঃ কীড ? জিজ্ঞেস করলেন চিত্তরঞ্জন।

আমি আপনাকে এ্যারেষ্ট করতে এসেছি।

আমি প্রস্তুত। কিন্তু সুভাষ কোথায় ?

পুলিশ কমিশনার সে সংবাদও জানালেন চিত্তরঞ্জনকে। পুলিশ তাকে এ্যারেষ্ট করতে গেছে।

ছ'মাসের জন্য জেল হল সুভাষের। চিত্তরঞ্জনেরও মেয়াদ ছয় মাসের।

এই প্রথম কারাবরণ সুভাষের।

১৯২০ সাল।

মহাত্মা গান্ধী বললেন, এক বছরের মধ্যে আমি স্বরাজ এনে দেব। গান্ধীজীর কথায় হয়তো বা খানিকটা আস্থা প্রকাশ করেছিলেন সেদিন ভারতীয় বিপ্লবী দল। কিন্তু বছর ঘুরে গেল অথচ স্বরাজের কোন সম্ভাবনাই লক্ষ্য করা গেল না। সুভাষের মনে জিজ্ঞাসা, গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের পথ কি স্বরাজ আনতে পারবে ?

স্বরাজ আসেনি, কিন্তু দেশ আন্দোলনের পথে এগিয়ে গেছে অনেকখানি।

গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা অচল করে দেওয়া। ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা না করলেই তাদের শাসন ব্যবস্থা অচল হতে বাধ্য। এই ছিল সেদিন গান্ধীজীর বিশ্বাস। তাই বর্জন করা হল বিদেশী পণ্য, আইন অমান্য করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এও ঘোষণা করলেন, কর দেবেন না। কংগ্রেসের এই অহিংস নীতির মোকাবিলা করতে এলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের চণ্ডনীতি নিয়েই। হাজার হাজার দেশসেবককে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হল কারাগারের অন্ধকার কক্ষে। আর সেই কারাগারে চলতে লাগল নির্যাতন আর অত্যাচার। নেতারাও বাদ পড়লেন না। গান্ধীজী, দেশবন্ধু, মতিলাল নেহেরু, মৌলনা মহম্মদ আলি, শৌকত আলি—কেউই ওদের চণ্ডনীতির আওতার বাইরে রইলেন না। সকলকেই ভোগ করতে হল ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর অকথ্য অত্যাচার।

উত্তরপ্রদেশের এই গ্রামে বেরিয়েছিল কংগ্রেসের একটা মিছিল। মিছিলে বাধা দিতে এগিয়ে এসেছিল সেদিন একজন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টার কয়েকজন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে। মিছিলে অংশগ্রহণকারী সাধারন মানুষ সেদিন আর

এদের বেয়াদপি বরদাস্ত করতে পারেনি। পুলিশদল বুঝতে পেরেছিল জনতা মারমুখী হিংস্র। অতএব মিছিল ভেঙে দেওয়ার ইচ্ছাটিকে সংবরণ করে পুলিশ দল ফিরে এল নিকটবর্তী থানায়। কিন্তু মারমুখী জনতা শান্ত হল না। অনেক নির্যাতন সয়েছে ওরা, এবার যোগ্য জবাব দিতেই হবে। থানাটাকে ঘিরে ফেলেছিল চতুর্দিক থেকে। আর তারপর দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। প্রতিহিংসার লেলিহান শিখায় সেদিন পুড়ে মরল থানায় আশ্রয় গ্রহণকারী পুলিশ দল। চৌরিচৌরার ঘটনার সংবাদ গান্ধীজীর কাছে এসে পৌছাল। গান্ধীজী মর্মাহত। বারদৌলিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসল। আর সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, অনির্দিষ্ট কালের জন্য আন্দোলন তুলে নেওয়া হোক।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তখন জেলে। জেলে তখন সুভাষচন্দ্রও। কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের সংবাদ দেশবন্ধু জেলে বসেই পেলেন। ক্ষোভে দুঃখে ভেঙে পড়লেন তিনি। গান্ধীজী এ কি সিদ্ধান্ত নিলেন। আন্দোলন বন্ধ।

ক্ষুব্ধ সুভাষচন্দ্রও। চৌরিচৌরার ঘটনা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমস্ত আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়া অযৌক্তিক। একটা ঘটনার জন্য সমস্ত দেশ শাস্তি পাবে কেন?

সুতরাং আবার কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল। এই বৈঠকে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় গান্ধীজীকে আক্রমণ করা হল। আন্দোলন প্রত্যাহার করার কোন অর্থই হয় না। আমরা শক্তিহীন দুর্বল নই, আমরা ভয়ে কোন কারণেই মাথা নত করতে পারি না। ক্লীবতার পরিচয় দিয়ে দেশের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে খর্ব করার কোন অধিকার গান্ধীজীর নেই।

কিন্তু ইংরেজ সরকার গান্ধীজীকে বাইরে থাকতে দিলেন না বেশি দিন। উনিশ শ' বাইশের মার্চ মাসে তাই গান্ধীজী গ্রেফতার হলেন। ব্রিটিশ কারাগার হতে মুক্তি পেলেন সুভাষচন্দ্র, মুক্তি পেলেন চিত্তরঞ্জন। মাঝখানে কয়েকটা দিনের ব্যবধান।

তখন উত্তরবঙ্গ বন্যার করাল গ্রাসে কবলিত। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জিলা বন্যা প্লাবিত—ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ করা যায় না। তখনও দশবারো ফুট উঁচুতে জল দাঁড়িয়ে। ঘরবাড়ির চিহ্ন মাত্র নেই। মানুষ আজ গৃহহারা, গবাদি

পশু মৃত্যু সম্মুখীন। মারাও গেছে অনেক পশু, অনেক মানুষ। বন্যা পীড়িত অঞ্চলে ত্রাণ-সাহায্য পাঠানোর প্রয়োজন। কংগ্রেসের তরফ থেকে ত্রাণ ও সাহায্যের ব্যবস্থা করা হল। কংগ্রেসের তরফ থেকে সুভাষচন্দ্র ও ডাক্তার জে. এম. দাশগুপ্ত রওনা হলেন উত্তর বঙ্গ অভিমুখে।

সেবা ত্রাণের ব্রত নিয়ে সুভাষচন্দ্র ঘুরতে লাগলেন উত্তর বঙ্গের নানা স্থানে- আদমদিঘি, কুশুম্বি, বগুড়া, মদনপুর আরও নানা স্থানে। বিপন্নদের সাময়িক আশ্রয় দিতে হবে, দিতে হবে খাদ্য, বস্ত্র। দেশের মানুষ বিপন্ন—দেশের মনীষীদের চোখে ঘুম নেই বিন্দুমাত্র। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ত্রাণ ভাণ্ডারের অর্থ সংগ্রহের জন্য তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। অর্থও পেলেন আশাপ্রদ। প্রায় চার লক্ষ টাকা চাঁদা উঠল। খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধও পেলেন তিনি আশানুযায়ী।

অথচ শাসক সম্প্রদায়? ওরা নির্বিকার। ওদের সাহায্য হাত প্রসারিত হল না বিন্দুমাত্র। কিন্তু কেন? দেশ শাসন কোরব, শোষণ করব অথচ সে দেশের সাধারণ মানুষের ত্রাণের বিন্দুবিসর্গ ব্যবস্থা কোরব না। অবশ্য ভারতবাসীর প্রতি আক্রোশের একটা কারণ ছিল। কারণ ভারতবাসী তখন জেগে উঠেছে ঘুম থেকে। আর নিজেদের ন্যায্য দাবী স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনে মেতে উঠেছে, সেটা শাসকবর্গ সহজভাবে মেনে নিতে পারে না— যেন তাদের কাছে এসব অর্থহীন।

কিন্তু এদেশের মানুষই এদেশের মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারবে। কংগ্রেসের ত্রাণ ও সেবার কাজ সফল হল পরিপূর্ণভাবে। দেশবাসীর কাছে কংগ্রেস পেল বিশেষ মর্যাদা। কংগ্রেস নির্যাতিত মানুষের কথা ভাবছে—এ বিশ্বাস সাধারণ মানুষের মনে তখন সঞ্চারিত হয়েছে আর তার ফলে এ বিশ্বাসটুকুও সেদিন সাধারণ মানুষের মনে দানা বেঁধেছিল কংগ্রেস নির্যাতিত অত্যাচারিত সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

উনিশ শ' বাইশ সালের ডিসেম্বরে গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। চিত্তরঞ্জন এলেন, সুভাষচন্দ্রও এলেন এ অধিবেশনে।

গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধুর ভাষণ পেল সভ্যদের অকুণ্ঠ সমর্থন। কিন্তু সভায় প্রস্তাবিত বিষয় নিয়ে দেখা দিল দ্বিমত। দেশবন্ধুর বক্তব্য: আমাদের একমাত্র পথ কাউন্সিলে ঢুকে সরকারকে আঘাত করা।

গান্ধীজী প্রথমেই বিরোধিতা করলেন এ বক্তব্যের। নির্বাচিত প্রতিনিধি যাঁরা কাউন্সিলে যাবেন তাঁরা কোনদিনই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারবে না অতএব সে চেষ্টা করা মূল্যহীন।

কিন্তু দেশবন্ধু সে কথা মানতে রাজী নন, কাউন্সিলে যাওয়ার কোন প্রত্যক্ষ ফললাভের সম্ভাবনা না থাকলেও পরোক্ষ লাভ এতে আছে বৈকি। সরকারের প্রতিবাদ জানাতে, সমালোচনা করতে তো পারবে কাউন্সিলে প্রবেশ করে। এতে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। আন্দোলন আরও জোরদার হবে এতে। কিন্তু মানতে রাজী নন গান্ধীজী, রাজী নন গান্ধীজীর অনুগামীরাও।

শুরু হল বিভেদ। ভাগ হয়ে গেল কংগ্রেস।

দেশবন্ধুর দলে সুভাষচন্দ্র, মতিলাল নেহেরু, বিঠলভাই প্যাটেল, হাকিম আজমল খাঁ, যতীন সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল—আরও অনেক দেশনেতাই তো সেদিন এসেছিলেন, তবু ভোটে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল। দেশবন্ধু পদত্যাগ করলেন সভাপতির পদ থেকে। কিন্তু কংগ্রেস ছাড়লেন না তিনি। গঠন করলেন তিনি নতুন দল। স্বরাজ্য পার্টি। মতিলাল নেহেরুও কংগ্রেস সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিয়ে এই স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ দিলেন। কোলকাতায় ফিরে এলেন চিত্তরঞ্জন।

কথা হচ্ছিল সেদিন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে।

বললেন চিত্তরঞ্জন, জয়লাভ আমাদের সুনিশ্চিত। কিন্তু বর্তমানে প্রচার চাই। দেশের মানুষকে প্রচারের মাধ্যমে বোঝাতে হবে আমাদের উদ্দেশ্য, বোঝাতে হবে আমরা কি চাই। তাহলেই সাধারণ মানুষের সমর্থনও পাব আমরা।

আমাদের দেশের পত্রিকা মারফৎ তো গান্ধীবাদের কথাই প্রচারিত হচ্ছে—সুভাষচন্দ্র বললেন চিত্তরঞ্জনকে।

আসলে সেদিন স্বরাজ্য পার্টিকে সমর্থন জানাতে পারেনি এদেশীয় পত্রিকা সমূহ। কারণ ব্রিটিশ-ভয়!

তাই চিত্তরঞ্জন জানালেন, আমরা একটা বাংলা দৈনিক কাগজ বের করব। 'বাংলার কথা' স্বরাজ্য পার্টির অভাবটুকুও পূরণ করতে পারবে আশা করি।

কিন্তু সম্পাদক ?

সম্পাদক হবে তুমিই, সুভাষ।

প্রকাশিত হল বাংলার কথা। সম্পাদক সুভাষচন্দ্র বসু।

জেলখানায় বসে চিত্তরঞ্জন একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন, জেল থেকে বের হয়ে এসেই তিনি একখানি ইংরাজী দৈনিক বের করবেন 'ফরওয়ার্ড'।

সেই 'ফরওয়ার্ড' প্রকাশেরও সময় এসেছে আজ।

'ফরওয়াড´ প্রকাশিত হল। সর্বময় কর্তা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নিজেই। এ পত্রিকার প্রচার সচিব হলেন সুভাষচন্দ্র বসু।

দেশবন্ধু বললেন, সুভাষ, এবার কোলকাতা গড়ার পালা।
কোলকাতা জাগলেই সারা বাংলা জেগে উঠবে।

বাংলা দেশ যদি একবার জেগে ওঠে তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর মসনদ কেঁপে উঠতে বাধ্য।

সুভাষকে আজ শপথ নিতে হবে সেই ব্রিটিশ বেনিয়ার মসনদ টলিয়ে দেওয়ার।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর অক্লান্ত প্রচেষ্টা অবশেষে সফল হল।
বিধিবদ্ধ হল ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট।
সেটা উনিশ শ' তেইশ সালের কথা।

কর্পোরেশন শাসন পরিচালনা করবে। দেখবে সুখ-সুবিধা, শান্তি স্বাচ্ছন্দ্য আনবে জনজীবনে। অভাব অভিযোগ মেটাবার চেষ্টা করবে ওরা। ছড়াবে দেশের মানুষের দ্বারে দ্বারে শিক্ষা।

স্বরাজ্য দল নির্বাচনে প্রার্থী দিল। আর বিপুল ভোটে বত্রিশটি ওয়ার্ড থেকে বত্রিশ জন প্রার্থী মনোনীত হলেন—জনসাধারণের নির্বাচিত কাউন্সিলার ওঁরা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নির্বাচিত হলেন কোলকাতার প্রথম মেয়র, ডেপুটি মেয়র

শহীদ সুরাবাদী আর চিফ একজিকিউটিভ অফিসার সুভাষচন্দ্র। সাতাশ বছরের এক যুবক একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ পেলেন।

মাসমাহিনা তখন তিন হাজার টাকা। কিন্তু সুভাষচন্দ্র নিতেন দেড় হাজার টাকা—অর্ধেক বেতন।

কাউন্সিলার, অল্ডারম্যান, মেয়র, ডেপুটি মেয়র সকলের পরিধানে খদ্দর। সুতরাং কর্পোরেশন অফিসের অন্যান্য কর্মীরাও খদ্দর পরে আসতে শুরু করলেন। পাল্টে গেল কর্পোরেশনের চেহারা। একটা গৌরবময় যুগ এসে গেল কর্পোরেশন অফিসে।

শুরু হল কোলকাতা কর্পোরেশনের কর্মময় অধ্যায়।

কর্পোরেশনের প্রথম লক্ষ্য হল, শিক্ষা বিস্তার। শহরের নানা স্থানে স্থাপিত করা হল অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। শহরের ছেলে মেয়েরা শিক্ষার অমৃতময় ফলের সন্ধান পেল। স্বাস্থ্য বিভাগ হল স্থাপিত, বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়ার ব্যবস্থা হল এই বিভাগ হতে। দেওয়া হল পর্যাপ্ত পানীয় জলের সরবরাহ, বস্তি উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ কোরল কর্পোরেশন।

নতুন শহর কোলকাতা। নতুন রূপে কোলকাতা শহর এখন বড় উজ্জল।

আর কোলকাতা শহরের এই নতুন রূপশিল্পী স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু।

কিন্তু ব্রিটিশ শাসক সুভাষচন্দ্রের এই কর্মযজ্ঞকে ভাল চোখে নিতে পারল না। ওদের ধারণা বিপ্লবী যুবকদের সঙ্গে সরাসরি সুভাষের যোগসাজস রয়েছে। কারণ বিপ্লবীদের কর্ম প্রচেষ্টা ও কর্ম সাফল্য তখন তুঙ্গে।

গোপীনাথ সাহা টেগার্টকে হত্যা করতে গেলেন, কিন্তু ভুল হল তাঁর। টেগার্ট তার আয়ু নিয়ে বেঁচে রইল, পরিবর্তে মারা গেল সে দিন আর্নেস্ট ডে। ধরা পড়লেন গোপীনাথ সাহা। অতএব ব্রিটিশ বিচারকের কাঠগড়ায় তাঁকে দাঁড়াতে হল। বিচারক রায় দিলেন ফাঁসির। ফাঁসি হল গোপীনাথের।

গোপীনাথের ফাঁসিকে কেন্দ্র করে হরিশ পার্কে যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হল তাতে ঘোষিত হল সুভাষচন্দ্রের দৃপ্ত কণ্ঠ:

ব্রিটিশ বেনিয়াদের স্বার্থে আঘাত হানতে হবে আজ। যদি তাদের হাতে

মারবার সামর্থ্য আমাদের না থাকে, যদি ভারতবর্ষের অস্ত্রবল না থাকে তবে বিকল্প পথই আমাদের বেছে নিতে হবে—তা বিদেশী পণ্য সম্ভার বয়কট করা। ওদের হাতে না মারতে পারলেও ভাতে মারবার ক্ষমতা তো এক্তিয়ারের মধ্যেই।

সুভাষচন্দ্র নিজেই উদ্যোগী হয়ে গিয়েছিলেন গোপীনাথের মৃতদেহ নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু মৃতদেহ তিনি পেলেন না। ব্রিটিশ সেদিন গোপীনাথের মৃতদেহ সুভাষের হাতে তুলে দিতে ভয় পেয়েছিল। ভেবেছিল মৃতদেহ পেলে বাংলার তরুণ শক্তি হয়তোবা নবতর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে। কিন্তু একথা ভাবেনি, বাংলার তরুণ শক্তি তার অনেক আগেই জেগে উঠেছে। মৃতদেহের পরিবর্তে বিদ্রোহী গোপীনাথের একটি কাপড়ের টুকরো দেওয়া হল সুভাষচন্দ্রকে। সুভাষচন্দ্র তাই মাথায় করে নিয়ে এলেন সগর্বে। ব্রিটিশ, তোমার সাধ্য কোথায় মাতৃভক্ত সন্তানের শেষ স্মৃতিটুকু কেড়ে নেবে? গোপীনাথ যে সেদিন বাংলার মানুষের মনের মণিকোঠায় আপন স্থান করে নিয়েছে। তা কি কেড়ে নিতে পার, কেড়ে নেওয়া সম্ভব?

তাই বোধ হয় চক্ষুশূল হয়ে উঠল সুভাষচন্দ্রের উচ্চপদ। তাই বোধ হয় তোমরা শাসক গোষ্ঠী একেবারে খড়্গহস্ত হয়ে উঠলে সুভাষচন্দ্রের উপর, তাই না?

তা না হলে হঠাৎ উনিশ শ' চব্বিশের পঁচিশে অক্টোবর একটা গ্রেপ্তারের পরোয়ানা নিয়ে কেন হাজির হল তোমাদের পুলিস বাহিনী সুভাষচন্দ্রের এলগিন রোডের বাড়িতে?

সুভাষচন্দ্র গ্রেফতার হলেন। কিন্তু বাংলাদেশ গ্রেফতার মেনে নিতে পারল না সেদিন। তাই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল বাঙ্গালী। ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন চিত্তরঞ্জন। দেশবন্ধু তখন সিমলায়। ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় তিনি এখানে এসেছেন, তাঁর কাছেও এসে পৌঁছাল এ সংবাদ। ক্ষোভে আক্রোশে ফেটে পড়লেন তিনি, আমিও গভর্ণমেণ্টকে ছাড়ব না। সুভাষের গ্রেফতারের জবাবদিহি করতে হবে ব্রিটিশ বেনিয়াকে।

চিত্তরঞ্জন ফিরে এলেন কোলকাতায়। রইল পড়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার।

কর্পোরেশনের আহূত সভায় সরকারের নিন্দা করলেন কর্পোরেশনের মেয়র রূপে—তীব্র সে নিন্দা।

মাতৃভূমিকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয় তাহলে সেই অপরাধে আমিও অপরাধী। যদি সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের প্রধান কর্মসচিব হিসেবে অপরাধী হয় তাহলে মেয়রও সম অপরাধী হবে না কেন?

ঊনিশ শ' চব্বিশে প্রথম প্রকাশিত কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদকীয় কলমে মন্তব্য করা হল:

'প্রধান কর্মসচীব গ্রেফতারে কর্পোরেশনে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে—যাহারা ইহার বহির্ভাগে অবস্থিত তাহাদের পক্ষে তাহা পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। শ্রীযুক্ত বসু শুধু কর্মসচিব ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রত্যেক প্রয়োজনীয় কার্যের বা পরিকল্পিত কার্য সম্পাদনের নিয়ন্ত্রণকারী।'

সত্যই তো তাই মিউনিসিপ্যাল গেজেট প্রকাশের পরিকল্পনাও তো সুভাষেরই। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাঙ্গালীর এই গেজেট প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই তাঁকে যেতে হল ব্রিটিশ বেনিয়াদের কারাগারে।

কিন্তু ভয় পেয়েছিল সেদিন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠি।

তা না হলে সেদিন সাত তাড়াতাড়ি সুভাষচন্দ্রকে আলিপুর সেন্টাল জেল হতে বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করতে হলই বা কেন? সুভাষচন্দ্র আলিপুর সেন্টাল জেলে বসেই কর্পোরেশনের কাগজপত্র দেখতেন, নির্দেশও দিতেন। আলোচনা করতে আসলেন সেক্রেটারী রামায়া, ইঞ্জিনিয়ার কোটস—এ সবকিছু তোমরা ভাল চোখে নিতে পারলে না—সহ্য করতে পারলে না কোলকাতার মানুষের সুখ সুবিধা আসুক। তাই না ব্রিটিশ শাসক?

কিন্তু নিশ্চিত হতে পারলে না। তাই খুঁজতে হল নিশ্চিন্ততার অবকাশ। অতএব একেবারে ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে নির্বাসনে পাঠাতে হল সুভাষচন্দ্রকে।

মান্দালয় জেলে এলেন সুভাষচন্দ্র।

দেশবন্ধুর উদ্বেগ আরও বাড়ল। অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি আরও।

তিনি অসুস্থ শরীর নিয়েই এলেন পাটনা।

ফরিদপুর অধিবেশনেও যোগদান করলেন অসুস্থ শরীর নিয়েই।

এই ফরিদপুর অধিবেশনেই দেশবন্ধু ঘোষণা করলেন :

কারারুদ্ধ দেশ-সেবকদের মুক্তি চাই। সুভাষ-সত্যেন-আর অনিলবরণ সম্পূর্ণ নির্দোষ। এদের অবিলম্বে মুক্তি চাই।

ডাক্তার বারবার বলছেন, দেশবন্ধু, আপনার বিশ্রাম চাই।

কিন্তু গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে চান না ডাক্তারের উপদেশ।

শেষ পর্যন্ত আর তিনি বইতে পারলেন না নিজের দেহ। বুঝতে পারলেন অসুস্থতা ক্রমশঃ বাড়ছেই। উনিশ শ' পঁচিশের মে মাসের এগারো তারিখে তিনি রওনা হলেন দার্জিলিং। কিন্তু হায়। ইন্দ্রপতন ঘটল। ষোলই জুন মঙ্গলবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণ।

সুভাষচন্দ্র তখন মান্দালয় কারাগারে।

কারাপ্রাচীরের অন্তরালে নির্বাসিত সুভাষের কাছে এ সংবাদ পেঁছাল। ভেঙ্গে পড়লেন সুভাষ। শোকে স্বজন বিয়োগ ব্যথায় মূহ্যমান সুভাষ। তাঁর এই শোকদীর্ণ হৃদয়ের আর্তি প্রকাশিত হয়েছে তাঁরই লেখা চিঠিতে।

সুভাষ লিখলেন :

"তাঁর জীবনের মাত্র একবৎসর কাল আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম এবং অনুচর হয়ে তাঁর কাজ করেছিলাম। এই সময়ের মধ্যে কষ্ট করলে তাঁর কাছ থেকে কিছু শিখতে পারতাম। কিন্তু চোখ থাকতে কি আমরা চোখের মূল্য বুঝি?

দেশবন্ধুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। আরোগ্য লাভের জন্য এবং বিশ্রাম পাবার ভরসায় তিনি সিমলা পাহাড়ে গিয়েছিলেন। আমাদের গ্রেফতারের সংবাদ পেয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ সিমলা থেকে রওনা হয়ে চলে আসেন কলকাতায়। আমাদের দেখতে তিনি দুবার আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আসেন এবং আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয় বহরমপুর জেলে বদলী হবার আগে।

প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হলে আমি তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বললাম— আপনার সঙ্গে আমার বোধ হয় অনেক দিন দেখা হবে না।

তিনি তাঁর স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ও উৎসাহের সঙ্গে বললেন—না, আমি শীগগির তোমাদের খালাস করে আনছি।

হায়। তখন কে জানত যে ইহজীবনে আর তাঁর সাক্ষাৎ পাব না...তাঁর সেই স্মৃতিটুকু আমার প্রাণের সম্বল হয়ে আছে।"

বাংলা দেশের কণ্ঠ এখন সোচ্চার।

সুভাষকে চাই। সুভাষের মুক্তি চাই।

আর সুভাষ? সুভাষ তখন অতন্দ্র প্রহর গুণছেন মান্দালায় কারাগারের লৌহকপাটের অন্তরালে। তিনি জানেন না, কবে এ প্রহর গোনার শেষ যাম এসে পেঁছাবে? কবে ঘটবে মুক্তির নতুন সূর্যোদয়?

বাংলার কংগ্রেস নিল নতুন পরিকল্পনা।

আগামী নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র আর সত্যেন দুজনকে প্রার্থী করা হবে। একজন বাংলার কাউন্সিলের আর অন্যজন দিল্লীর ভারতীয় এসেম্বলির। নির্বাচিত হলেন দুজনেই বিপুল ভোটাধিক্যে। দেশবাসীর পক্ষ থেকে এবার দাবি উঠল, সুভাষকে ফিরিয়ে দাও। তাঁর মুক্তি আমরা চাই-ই চাই।

কিন্তু সাধারণ মানুষের এ আবেদন বধির ব্রিটিশ শাসকের কর্ণে পৌছাল না। পৌছাবেই বা কেন? আসলে ওরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চায় নি কোন আবেদন।

কিন্তু স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল সুভাষচন্দ্রের। নানা ব্যাধি এসে জড়িয়ে ধরল তাঁকে। জেলের স্বাস্থ্য পরিক্ষক নির্দেশ দিলেন সুভাষচন্দ্রকে রেঙ্গুন মেডিক্যাল বোর্ডের সামনে হাজির হতে। হাজির হলেন তিনি। বোর্ড স্পষ্ট ভাষায় রিপোর্ট দিল এ হেন বন্দী জেলখানার মধ্যে আটকে রাখা শাস্ত্র-সম্মত নয়।

তাহলে কি মুক্তি আসন্ন? সুভাষ স্বপ্ন দেখেন মুক্তির। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, মুক্তি মিলল না; বরং সুভাষকে তখন পাঠিয়ে দেওয়া হল ইনসিন জেলে।

আবার পরিচিত জেলের সম্মুখীন হলেন তিনি—মেজর ফিণ্ডলে।

তোমাকে এখনো মুক্তি দেয়নি?

না।

সত্যি দীর্ঘ সময়। আমি কিছু ব্যবস্থা তোমার মুক্তির জন্য করতে পারি কিনা দেখছি।

ফিগুলে লিখলেন। আর সরকার তাঁর চিঠির উত্তরে জানালেন যে বন্দী যদি নিজ খরচায় সুইজারল্যাণ্ডে যেতে রাজী থাকে তাহলে তাকে সেখানে যেতে দেওয়া যেতে পারে। তবে কোলকাতায় কোনক্রমেই সুভাষকে আসতে দেওয়া যেতে পারে না।

চমৎকার ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসক।

কিন্তু কি অস্থির মস্তিষ্ক তোমার! তাই আবার নতুন আদেশ জারি করলে, সুভাষকে আলমোরায় স্থানান্তরিত করা হবে।

জাহাজ আলমোরা যাত্রার পথে এসে দাঁড়াল ডায়মণ্ডহারবারে।

এগিয়ে এলেন একজন অফিসার।

এখানে একবার নামতে হবে আপনাকে।

কেন? বিস্ময়ের অন্ত নেই সুভাষের।

সরকার পক্ষ থেকে লঞ্চে মেডিক্যাল বোর্ডের ডাক্তাররা এসেছেন। আপনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে এখানে।

সুভাষচন্দ্র নেমে এলেন জাহাজ থেকে লঞ্চে।

ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল স্যাণ্ডস, মেজর হিংসটন—এরা সবাই রয়েছেন বোর্ডে। পরীক্ষা হল। সুভাষকে অপেক্ষা করতে হল এই লঞ্চেই আরও একটা দিন।

আর পরদিনই এসে পৌছাল বোর্ডের স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্টের জবাব টেলিগ্রাম মারফৎ।

সুভাষ মুক্ত।

মুক্তির আদেশ মিলেছে তাঁর।

উনিশ শ' আঠাশের ডিসেম্বর কোলকাতায় আহূত জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে সুভাষ প্রস্তাব করলেন আমরা চাই স্বাধীনতা, পূর্ণ স্বাধীনতা।

জওহরলাল সমর্থন জানালেন সুভাষের প্রস্তাবে।

কিন্তু গৃহীত হল না সে প্রস্তাব।

সুভাষ জানতেন, হতাশাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না প্রস্তুতি-পর্ব এখন। সুযোগ একদিন আসবেই।

অগ্নি যুগের ইতিহাস রচিত হচ্ছে তখন অত্যন্ত দ্রুত। বাঙালী তখন মৃত্যু পাগল। মৃত্যুভয়ে ভীত নয় বাঙালী। প্রমাণ চাও?

প্রমাণ যতীন দাস লাহোর জেলে তেষট্টি দিন অনশন করে মৃত্যুবরণ করলেন। আর যেদিন যতীন দাসের মৃতদেহ কোলকাতায় নিয়ে আসা হল সেইদিন যে শোক মিছিল কোলকাতায় বের হয়েছিল তাই তো প্রমাণ করে বাংলার দামাল ছেলেদের মৃত্যু-ভয়শূন্যতার কথা।

পাঞ্জাবের ছাত্রসম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে এলেন সুভাষচন্দ্র লাহোরে। ব্রাডল হলে এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সংরক্ষিত আসন। অথচ দেখা গেল সভায় জনতার ভিড়ে মাথা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেক ব্রিটিশ পুলিস। প্রবেশপত্র ছাড়া এরা এল কেন?

সুভাষচন্দ্র প্রতিবাদ জানালেন।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বলিষ্ঠ কণ্ঠ ঘোষিত হল, সঙ্গে যাদের প্রবেশপত্র নেই তাঁরা দয়া করে সভা ত্যাগ করুন।

চঞ্চল হয়ে উঠল পুলিশ দল। তবু ওরা জিদ ধরল আমরা পুলিস, আমরা থাকব এ সভায়।

না, পুলিশই হোন আর যেই হোন না কেন সংরক্ষিত আসনের সভায় আপনাদের প্রবেশের কোন এক্তিয়ার নেই।

মাথা নীচু করে বের হয়ে এল পুলিশের দল। এছাড়া উপায়ই বা কি।

লাহোর থেকে মীরাট। উদ্দেশ্য, এখানকার বন্দীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা।

কিন্তু ফিরতে হল তাঁকে, বাংলা দেশে বন্দী দিবস উৎযাপনে শোভাযাত্রায় যোগদান করেছিলেন যারা সেইসব ধৃত বন্দীদের বিচার শুরু হয়েছে তখন। কোলকাতায় ফিরে এলেন সুভাষ। দেখলেন বাংলার কংগ্রেস দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। বামপন্থী আর দক্ষিণ পন্থী। একদল সুভাষচন্দ্রকে নেতৃত্বে স্বীকৃতি দিতে চান আর অন্যদল গান্ধীজীর অনুবর্তী। ওঁরা নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে।

উনিশ শ' ঊনত্রিশের লাহোর কনফারেন্সে সুভাষচন্দ্র আবার তাঁর পূর্ব প্রস্তাবই রাখলেন। তিনি চান পাল্টা সরকার গঠন করতে। কিন্তু কংগ্রেস তা চায় না। গান্ধীজী তো চানই না। অতএব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি হতে বাদ পড়লেন সুভাষচন্দ্র।

দুঃখ নেই এর জন্যে।

সুভাষচন্দ্র তাঁর বাষট্টিজন সমর্থক নিয়ে গঠন করলেন নতুন দল—কংগ্রেস ডেমোক্রেটিক পার্টি।

লাহোর অধিবেশনে স্বাধীনতার সংকল্প ঘোষিত হোল আর তারপর? তারপরই ২৩শে জানুয়ারী তাঁরই জন্মদিবসে বন্দী দিবস পালনের অভিযোগে এক বছরের কারাদণ্ডের হুকুমে আবার তাঁকে আসতে হল ব্রিটিশ কারাগারে।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী হলেন সুভাষচন্দ্র।

ব্রিটিশ শাসক কিন্তু তখন নিশ্চিন্ত। তারা একবারও ভাবতে পারল না ১৯২১-এর আইন অমান্য আন্দোলন ১৯৩০-এ পৌঁছে এমন জোরদার হয়ে উঠবে।

আলিপুর সেণ্টাল জেল পূর্ণ হতে লাগল রোজই সত্যাগ্রহীদের আগমনে।

জেলসুপার তখন মিঃ সোমদত্।

ব্রিটিশ শাসক এই আইন অমান্যকারীদের রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দিতে চাইল না। এদের করল তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের সমগোত্রীয়।

মিঃ সোমদত্ শুরু করলো নির্লজ্জ অত্যাচার এই সত্যাগ্রহীদের ওপর। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের পোষাক পরতে হবে সত্যাগ্রহীদের। প্রতিবাদ জানালেন সত্যাগ্রহীরা।

কিন্তু সে প্রতিবাদে জেলসুপার কান দেন না। গর্জন করে ওঠেন তিনি।

কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী বাংলার তরুণেরা ভীত নয় মিঃ সোমদত্তের গর্জনে। ওরা চীৎকার করে উঠল সঞ্জীবনী মন্ত্রে, 'বন্দে মাতরম।'

বেজে উঠল পাগলা ঘণ্টি। ছুটে এল সশস্ত্র পুলিস দল।

সুভাষচন্দ্র, জে, এম, সেনগুপ্ত, সত্য বক্সী প্রমুখ নেতারা বেরিয়ে এলেন নিজ নিজ ওয়ার্ড ছেড়ে। ওরা সবাই অবাক। কী ব্যাপার! হঠাৎ পাগলা-ঘণ্টি কেন?

জেলসুপার ওদের দেখেই ক্ষেপে উঠলেন, নিজ নিজ ওয়ার্ডে ফিরে যাও।

কিন্তু কেউ গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে চায় না সোমদত্তের আদেশ। ব্রিটিশ গোলাম সোমদত্ ব্যর্থ আস্ফালনে চীৎকার করে উঠলেন, চার্জ।

শুরু হল লাঠি চার্জ। আহত হলেন অনেকেই। আহত হলেন সুভাষচন্দ্র আর সারা শহরে সেদিন বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে লাঠি চার্জের সংবাদ। সুভাষচন্দ্রের আঘাত অত্যন্ত বেশী। জীবন সংশয়। ক্ষেপে উঠল বিপ্লবী দল।

না, জেলসুপার মিঃ সোমদত ক্ষমা পেতে পারে না। দলীয় নির্দেশ পেলেন বারীন ঘোষ। সুভাষচন্দ্রের রক্তের ঋন মিঃ সোমদত্‌কে শোধ করতে হবে। রক্তেব বিনিময়েই।

বের হলেন বারীন ঘোষ। পকেটে রিভলবার সঙ্গে একজন সুযোগ্য সহকর্মী। মৃত্যুই সোমদত্তের একমাত্র যোগ্য শাস্তি। কিন্তু কোথায় সোমদত্ ?

ব্রিটিশ শাসন সেদিন বুঝেছিলেন সোমদত্তের ভাবী পরিণতি সম্পর্কে। তাই বদলী করা হল সোমদত্তকে। এলেন মেজর পাটনি।

আর মেজর পাটনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে সহযোগিতা কামনা করলেন সুভাষচন্দ্রের।

সহযোগিতা করতে সুভাষচন্দ্র রাজী, কিন্তু কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় তিনি দেবেন না।

উনিশ শ' তিরিশের বাইশে আগষ্ট সুভাষচন্দ্র কোলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হলেন। কিন্তু তখনও তিনি জেলখানায়। অল্‌ডারম্যানের বিশ্বস্ততার শপথ তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। তখন পর্যন্ত পদ শূন্যই। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাংলার ত্রিমুকুট ধারণ করেছিলেন যতীন্দ্র মোহন, কিন্তু তিনি অন্তরীণ। তাই তিনি অল্ডারম্যানের শপথ গ্রহণ করতে পারেন নি। সুভাষ মুক্তি পেলেন তেইশে সেপ্টেম্বর। আর পরদিনই নিলেন অল্ডারম্যানের বিশ্বস্ততার শপথ।

উল্লাসে ফেটে পড়ল বাংলাদেশ।

আইন অমান্য আন্দোলন তখন ভাটার দিকে। অথচ ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ঘোষণা করল, কংগ্রেস বে-আইনী। আগামী যে কোন আন্দোলনের পথ বন্ধ করে দেওয়ার সে কি প্রচেষ্টা।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বললেন, তা বলে বসে থাকলে আমাদের চলবে না।

গোপনে অ্যাকশন কমিটি গঠিত হোল। পূর্ণ দাস, যতীন দাশগুপ্ত, রাজেন দেব, কিরণশঙ্কর এই কমিটির সভ্য। সুভাষচন্দ্র এবার নিশ্চিন্ত মনে বের হলেন কোলকাতার বাইরে। জনমত সংগঠনের বড় প্রয়োজনীয়তা।

সাড়া দিয়েছিল সেদিন সমগ্র বাংলাদেশ, সমগ্র ভারতবর্ষ।

হিজলী বন্দী শিবিরে সান্ত্রীরা গুলি করেছে বন্দীদের।

সুভাষচন্দ্র জানতে পারলেন সে কথা।

উনিশ শ' একত্রিশের সেপ্টেম্বর মাস।

পেছনে পড়ে রইল সব কাজ। সুভাষচন্দ্র ছুটে এলেন হিজলী। নিহত বন্দীদের নিয়ে শোক মিছিলের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিবাদ জানাতে হবে ব্রিটিশ শাসকের অযথা অত্যাচারের।

ব্রিটিশ শাসক সহ্য করতে পারল না সুভাষচন্দ্রের কার্যকলাপ।

অতএব বন্দী কর সুভাষকে। নিক্ষেপ কর কারাগারের অন্ধকারে।

উনিশ শ' বত্রিশের ২রা জানুয়ারী আবার সুভাষ গ্রেফতার হলেন। বোম্বাইয়ের কাছাকাছি একটা শহরে।

কারা প্রাচীরের অন্তরালে, বন্দীশালার বদ্ধ দ্বারের ওপারে অধিককাল থাকার ফলে ভেঙে পড়ল সুভাষের স্বাস্থ্য।

আহা! কি মহানুভব বৃটিশ শাসক।

সুভাষকে হারানো স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের অনুমতি দেওয়া হল। উনিশ শ' তেত্রিশের জানুয়ারী মাসে।

অনুমতি যখন মিলেছে তখন আর দ্বিধা করে লাভ নেই।

রওনা হলেন সুভাষ য়ুরোপ।

ভিয়েনায় এসে পেঁছিলেনও শেষ পর্যন্ত। সেদিন ৮ই মার্চ।

এই ভিয়েনাতে এসে সুভাষ পেলেন তাঁর পরিচিত জন—ভি. জে. প্যাটেলকে।

প্রেসিডেন্ট প্যাটেল—ভারতীয় আইন সভার সভাপতি হিসেবেই সকলের পরিচিত। সুভাষচন্দ্র দেখলেন প্যাটেল অসুস্থ।

ভেঙে পড়েছেন প্যাটেল। তাঁর যে অনেক স্বপ্ন ছিল, আশা ছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন ভারতবর্ষ গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে এমন আকাঙ্ক্ষা। সুভাষচন্দ্রের কাছ হতেই জানতে পারলেন প্যাটেল গান্ধীজী প্রত্যাহার করেছেন আইন অমান্য আন্দোলন। সমর্থন জানাতে পারলেন না প্যাটেল। সুভাষের সঙ্গে একমত তিনিও। যুক্ত বিবৃতির মাধ্যমে সুদূর ভিয়েনা থেকে সমালোচনা করলেন গান্ধীজীর এই সংকল্প গ্রহণের।

রুগ্ন প্যাটেলের পরিচর্যার দায়িত্ব নিলেন সুভাষ নিজে।

কিন্তু কাল ফুরোল প্যাটেলের।

যাত্রা করলেন তিনি অমর লোকের পথে।

বিঠল ভাই উইল করে তাঁর নিজের একলক্ষ টাকা সুভাষচন্দ্রকে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বল্লভভাই প্যাটেল মামলা রুজু করলেন। বাতিল করে দিলেন সেই উইল।

দুঃখ নেই সুভাষের সে জন্য।

নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তো তিনি এ টাকা চাননি, টাকাটা পেলে জাতীয় আন্দোলনের প্রচার কার্যের সুবিধা হত, এই যা।

কিন্তু ক্ষুদ্র টাকা তো সুভাষের আন্দোলনের গতি পথের অন্তরায় হতে পারে না।

পিতা জানকীনাথ মৃত্যু শয্যায়।

সংবাদ পেয়েই চঞ্চল হয়ে উঠলেন সুভাষ। দেশে তাঁকে ফিরতেই হবে। হাতে সময় নেই। বিমান যোগে ভারতে এসে পৌছালেন তিনি।

কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস।

করাচী বিমান বন্দরেই তিনি পেলেন পিতার মৃত্যু সংবাদ। ভগ্ন হৃদয়ে পৌছালেন দমদম বিমান বন্দরে।

কিন্তু অহঙ্কারী ব্রিটিশের কাছে পিতার জন্য পুত্রের কান্নার তো কোন মূল্য নেই।

অতএব আদেশ জারী হল নতুন করে।

সুভাষচন্দ্র অন্তরীণ হলেন এলগিন রোডের বাড়িতে। সর্ত আরোপ করা হলো সাতদিনের মধ্যেই সুভাষকে য়ুরোপে নিয়ে যেতে হবে।

কি চমৎকার তোমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা!

পিতার পারলৌকিক কার্যে পুত্র উপস্থিত থাকতে পারবে না এ কেমন কথা।

মায়ের মন মানতে চায় না সে কথা। সুভাষ একবার তাকালেন মায়ের মুখের দিকে। তারপর ঠিক করলেন, শ্রাদ্ধাদি চুকে না গেলে তিনি য়ুরোপে ফিরবেন না।

ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হল সেদিন সুভাষচন্দ্রের এ ঘোষণা মেনে নিতে।

শ্রাদ্ধ মিটে গেল। আবার য়ুরোপে ফিরে আসতে হল।

রোমে অনুষ্ঠিত এশিয়াটিক ষ্টুডেন্টস কনফারেন্স উদ্বোধন করলেন সিনর মুসোলিনী। আলাপ হল দুই দেশের দুই নায়কের মধ্যে। পরিচয় হল ডি. ভ্যালেরার সঙ্গেও—আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তিদাতা ইনি।

ভ্যালেরা সুভাষকে জানালেন আমন্ত্রণ।

কিন্তু ইংলণ্ড রাশিয়া আর আমেরিকা যাওয়ার ছাড়পত্র তাঁর নেই।

যেন সমগ্র য়ুরোপ খণ্ডে অন্তরীণ হয়ে আছেন সুভাষচন্দ্র।

ভাল লাগল না এ ব্যবস্থা।

ফিরে এলেন তিনি উনিশ শ' ছত্রিশের আটই এপ্রিল বোম্বাইয়ে। পুণার যারবেদা জেলে বন্দী হলেন তিনি।

সুভাষচন্দ্র বন্দী হয়েছেন এ সংবাদ আবার বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে। ভারত আজ বিক্ষুব্ধ—প্রতিবাদমুখর।

স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে সুভাষের। যক্ষ্মারোগের সুস্পষ্ট লক্ষণ।

অতএব মুক্তি পেলেন সুভাষ একেবারে বিনা শর্তেই। উনিশ শ, সাঁইত্রিশ সালের সতেরই মার্চ।

স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন। এখনও যে তার অনেক কাজ বাকী।

এলেন পাঞ্জাবের ডালহৌসী পাহাড়ে।

চলতে লাগল চিকিৎসা।

ডাক্তার ধরমবীর উপদেশ দিলেন অষ্ট্রিয়ায় যেতে।

উপায়হীন সুভাষ যাত্রা করলেন সেখানে।

তখন অখণ্ড অবসর। বিশ্রাম আর বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে চলল তাঁর আত্মচরিত রচনা 'ভারত-পথিক'।

ফুরিয়ে গেল দেড় মাস।

ফিরে এলেন লণ্ডনে। আর এখানেই তিনি খবর পেলেন—আগামী হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে তিনিই নির্বাচিত হয়েছেন সভাপতি।

অতএব আর নয়।

এবার আবার দেশে ফেরার পালা।

উনিশ শ' আটত্রিশের চব্বিশে জানুয়ারী তিনি আবার ফিরে এলেন ভারতে।

হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশন।

সুভাষ ১৩ই ফেব্রুয়ারী পৌঁছালেন বার্দোলী।

দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর সম্বর্ধনা।

কেনই বা পাবেন না? তাদের জননায়ক, প্রিয়নেতা আজ তাদেরই অতিথি। সুতরাং আতিথ্যের ঘাটতি থাকবে কেন?

উনিশে ফেব্রুয়ারী প্রকাশ্য অধিবেশনে তিনি স্মরন করিয়ে দিলেন, দেশবাসীকে তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে। প্রকাশ পেল তাঁর কথায়, সুচিন্তিত অভিমত।

ভারতের জন্য চাই পূর্ণ স্বাধীনতা, চাই সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, চাই বৈজ্ঞানিক পন্থায় দেশের কৃষি উৎপাদন শক্তি।

সুভাষচন্দ্র আজ সভাপতি।

সারা দেশে লাগল দোলা। নতুন আলোর দোলা। নতুন মন্ত্রে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠার দোলা।

জেগে উঠল দেশীয় রাজ্যগুলি। শুরু হল গণ-আন্দোলন। তালচের, রাজকোট, মহীশূর, হিন্দোল, জয়পুর সর্বত্র।

কিন্তু কংগ্রেসে শুরু হয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্ব।

এক বছরের মেয়াদী সভাপতি-পদ তো শূন্য হবেই বছর ঘুরলে। এবার কে সভাপতি হবেন?

প্রস্তাব এল, সুভাষচন্দ্রই পুনর্বার সভাপতি হবেন। সমর্থন জানান হল। কিন্তু এত নির্লজ্জ হয়ে প্রকাশ পাবে কেন কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব। প্রস্তাবিত হয়েছে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নাম, প্রস্তাবিত হল ডাক্তার পট্টভী সীতারামিয়ার নামও।

মৌলানা আজাদ সরে দাঁড়ালেন। সীতারামিয়ার অনুকূলে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করলেন তিনি।

শেষ পর্যন্ত সীতারামিয়াই রইলেন সুভাষের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে। অতএব নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু হেরে গেলেন সীতারামিয়া।

গান্ধীজী বললেন, ডাক্তার সীতারামিয়ার পরাজয় আমারই পরাজয়।

জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তিতেই কিন্তু সব মিটে গেল না।

শুরু হল ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র, শুধু নেতৃত্বের দাবিতেই।

অতএব পদত্যাগ পত্র দাখিল করলেন সুভাষচন্দ্র। স্বেচ্ছায় এ পদত্যাগ।

এ ছাড়া সেদিন আর উপায় ছিল না নতুন সভাপতি হলেন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

সুভাষের ডাকে সাড়া দিল বাংলার তরুণ সম্প্রদায়। এগিয়ে এল ওরা আত্মভোলা হয়ে।

মৃত্যুকে ভ্রূকুটি হেনে ওরা আসতে লাগল দলে দলে, হাজারে হাজারে।

যোগ দিতে হবে সুভাষচন্দ্র স্থাপিত ফরওয়ার্ড ব্লকে।

আসরফ উদ্দিন চৌধুরী, সত্যরঞ্জন বক্সী প্রমুখেরা পাশে এসে দাঁড়ালেন সুভাষের।

সুভাষচন্দ্র নেতৃত্ব দিলেন। এবারে দাবী: হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ করতে হবে।

শুরু হল হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত আন্দোলন।

তুমি এ আন্দোলনে ভয় পেলে ব্রিটিশ সরকার।

তাই বাধ্য হলে শেষ পর্যন্ত হলওয়েল মনুমেন্ট সরিয়ে নিতে।

জয় হল সুভাষচন্দ্রের।

কিন্তু ছুতো খুঁজতে লাগলো কি করে তোমাদের ভাষায় এই মারাত্মক লোকটিকে আবার কারাগারে আটক করা যায়।

মহম্মদ আলি পার্কে সুভাষ বক্তৃতা দিলেন, ফরওয়ার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত হল 'হিসাব নিকাশের দিন।'

আর তোমরা রাজদ্রোহিতার পরোয়ানা নিয়ে গ্রেফতার করলে সুভাষকে। কিন্তু পারলে না বেশীদিন তাকে রাখতে।

সুভাষের ভগ্ন স্বাস্থ্য দেখে বাধ্য হয়েই এলগিন রোডের বাড়ীতে অন্তরীণ করে রাখলে।

আর সুভাষ। সুভাষ তখন নতুন পরিকল্পনায় ব্যস্ত।

সুভাষ বুঝতে পেরেছিলেন ব্রিটিশ ভারত হতে তাঁকে পালাতে হবে। পেতে হবে বিদেশের সাহায্য। তাছাড়া তাঁর যে স্বপ্ন ভারতকে স্বাধীন করার তা সফল হবে না।

সুতরাং করতে হল নিখুঁত পরিকল্পনা।

সুভাষ ঘোষণা করলেন, তিনি মৌনব্রত পালন করবেন। তাই কারুর সাথে তিনি দেখা করবেন না কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা তো নয়ই। নিজেকে অন্তরাল করে রাখলেন একটা বিশেষ ঘরের মধ্যে। মাত্র একজনের যাওয়ার অনুমতি ছিল ঘরের ভিতর। তিনি শরৎচন্দ্র বসুর তৃতীয় পুত্র শিশির বসু। কারণ পুলিশের কোন সন্দেহ দৃষ্টি শিশিরের উপর ছিল না।

রহস্যজনক ভাবে একদিন সুভাষচন্দ্র নিরুদ্দেশ হলেন।

আর এই নিরুদ্দেশ হতে প্রধান সহায় হলেন শিশির। তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু এই নিরুদ্দেশের সংবাদ প্রকাশিত হল অনেক—অনেক পরে।

মাষ্টার তারা সিংহের মতে সুভাষ বসু নিরুদ্দেশ হলেন উনিশশ' চল্লিশের ডিসেম্বর আর উত্তম চাঁদের মতে উনিশ শ' একচল্লিশের পনেরই জানুয়ারী। তবে একথা সত্য সুভাষ বসু ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর চোখে ধুলো দিয়ে উধাও হয়ে গেলেন ভারতবর্ষ থেকে।

নির্দিষ্ট দিন। গভীর রাত্রি। বাড়ির দক্ষিণদিকে সন্তর্পণে একটা গাড়ী এসে দাঁড়ালো। আর আরও সন্তর্পণে বের হয়ে এলেন সুভাষচন্দ্র উত্তর ভারতীয় মুসলমানী পোষাকে। ড্রাইভার স্বয়ং শিশির। সুভাষকে দেখে হয়তো বা একবার চমকে উঠেছিলেন শিশির। কে বুঝতে পারবে এই মৌলবীর ছদ্মবেশের অন্তরালে আত্মগোপন করে আছেন বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বপ্ন সুভাষচন্দ্র! গাড়িতে উঠে বসলেন সুভাষ। একভাবে তাকালেন পেছনে ফেলে আসা বাড়ির দিকেও। মনে মনে পৌছে দিলেন তাঁর প্রাণের প্রণাম। মার সাথে আর দেখা করা হয়ে উঠল না।

উধাও হয়ে গেল গাড়িটা বিদ্যুৎগতিতে। জনহীন নগরীর রাজপথ অতিক্রম করে পৌছাল জি. টি. রোডে।

গতি বাড়ল আরও। এখনও যে অনেক পথ যেতে হবে।

ভোর হয় হয়।

গাড়ি পৌছেচে ধানবাদ। এর পরেই বারারি। শিশিরের বড়দা অশোক-বোস এখানেই থাকেন। তিনি আগেই খবর পেয়েছেন।

গাড়িটা থেমে গেল হঠাৎ।

নেমে পড়লেন সুভাষ। শিশির গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন।

পায়ে হেঁটে মৌলবী সাহেবের ছদ্মবেশে সুভাষ এলেন ডাক্তার বোসের বাড়ীতে। পরিচিত অথচ সর্বত্র রচনা করা হয়েছে অপরিচিতের ব্যবধান। মৌলবী সাহেবকে থাকতে দেওয়া হল বাইরের ঘরে। পরিচয় দেওয়া হোল ইনসিওরেন্স এজেন্ট হিসাবে।

ডাঃ বোসের সঙ্গে কথাবার্তা হয় ইংরাজীতে। দুপুরের আহারপর্ব সমাধা হল বাইরের ঘরেই। বাড়ির চাকর বাকরদের সন্দেহ করার সুযোগ দেওয়া হবে না বিন্দুমাত্র।

সন্ধ্যায় মৌলবী সাহেব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, আমি তাহলে উঠি। আমার ট্রেনের সময় হয়ে এল।

ট্যাক্সি ডেকে দিই একটা? জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার বোস। না, ধন্যবাদ।

বের হয়ে গেলেন মৌলবী সাহেব।

আর তার কিছুক্ষণ পরেই গাড়ি নিয়ে বের হলেন শিশির। সঙ্গে তাঁর বড়দা ও তাঁর বৌদি।

গাড়িটা এসে দাঁড়াল একটা নির্দিষ্ট স্থানে।

মৌলবী সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন পূর্ব হতেই। গাড়িটা থামতেই উঠে পড়লেন তিনি।

আর ঠিক তখনই শিশিরের বৌদি চমকে উঠলেন মৌলবী সাহেবের দিকে তাকিয়ে। এ যে আমাদের রাঙা কাকা বাবু।

মৌলবী সাহেব তাকালেন তাঁর দিকে।

কিন্তু কোন কথা নয়। যেন একটা বোবার রাজ্য পার হয়ে যাচ্ছেন ওরা সকলেই।

গাড়ী পৌছাল গোমা ষ্টেশনে।

এখান হতেই মৌলবী দিল্লী-কালকা মেল ধরবেন।

নৌশেরা পৌছাল অবশেষে দিল্লী-কালকা মেল।

আকবর শা আগেই পেশোয়ায় এসেছেন। সুভাষের অন্তর্ধানে শিশিরের মতই আর একজন সাহায্যকারী। মোটর ড্রাইভার কাবেদ খাঁ আকবর শা'র নির্দেশে হাজির নৌশেরা ষ্টেশনে।

মৌলবী সাহেব নামবেন গাড়ি থেকে। আবেদ খাঁর ভুল হয়নি মৌলবী সাহেবকে চিনতে। একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখাল সে। মৌলবী সাহেব বুঝতে পারলেন এ ব্যক্তিই তাঁর প্রার্থিতজন। কোন কথা না বলে উঠে বসলেন তাঁর গাড়িতে।

নিরাপদ এখন অনেকটা। এ তল্লাটে পুলিশও ভয় পায় আবেদ খাঁকে। অতএব গাড়ি নিরাপদে যাত্রা কোরল পেশোয়ারের উদ্দেশ্যে। অবশেষে পেশোয়ারে এলেন সন্ধ্যার একটু আগেই।

পেশোয়ারে রাত্রি কাটানো ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। অতএব সরাইখানাই ভাল। আবেদ খাঁর গাড়ি এল শহরের এক প্রান্তে। সরাইখানার কাছেই থানা। খুব সাবধানে থাকতে হবে।

সুভাষ কম্বলে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়েন, সতর্ক তিনিও।

ভোরের আলো তখনও ফোটেনি। ঘুম থেকে উঠে পড়লেন সুভাষ। উঠে পড়েছেন আবেদ খাঁ। এবার যাত্রা হবে শুরু।

পার হয়ে এল সবকদর। পেশোয়ার জেলার শেষ ঘাঁটি। তার পরে মেমান্দ অঞ্চল। ইংরাজ প্রভাব বিন্দুমাত্র নেই এখানে। আফগানিস্তানের সীমানা সামনেই। পরেই রাশিয়া।

প্রথম লক্ষ্য কাবুল। তারপর ভাবা যাবে পরবর্তী অভিযাণের কথা। কাবুলে একটু নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ফেলা যাবে কিনা কে জানে? ওখানেও তো বিভিন্ন দেশের গুপ্তচরেরা রয়েছে ওৎ পেতেই। অতএব সাধু সাবধান!

পাঠানের পোষাক পরলেন তিনি। স্যুটকেসেই ছিল এ পোষাক। মূখ আর বধিরের ভূমিকা এবার। সঙ্গে সঙ্গে নামটাও পালটে গেল। মৌলবী সাহেব এখন জিয়াউদ্দিন। কাবুলে পৌছেই আবের খাঁর দায়িত্ব শেষ। দায়িত্ব এবার নওজোয়ান ভারত সভার সম্পাদক ভকৎরামের। ভকৎরাম এলেন সময় মতই। তিনিও মুসলমান পাঠানের পোষাক পরেছেন। তিনি রহমৎ খাঁ। ছুটতে শুরু কোরল মোটর। যাত্রা শুরু করলেন জিয়াউদ্দিন আর মহরৎ খাঁ। গাড়িটা হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে পাকা রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় নেমে পড়ল।

গাড়িটা ছেড়ে দিতে হল গ্রামে পৌছেই। আর পথ নেই, গাড়ি চলবে না। অতএব হাঁটা ছাড়া উপায় নেই।

কে, কোথায় যাও?

অপরিচিত একজন লোক পথ আগলে দাঁড়াল। রহমৎ সতর্ক। কারণ এসব পথে ভুলচুক করা চলেনা। ভুলের কোন ক্ষমা নেই।

গরীব মানুষ। বোবা আর কালা ভাইকে সঙ্গে নিয়ে পীরের দরগায় যাচ্ছি ভাই। পীরের দয়া আর আল্লার করুণাই একমাত্র ভরসা। নিখুঁত এ ছদ্মবেশ। অবকাশ নেই সন্দেহের।

পায়ে হেঁটে ওরা দুজনেই এখন পৌছেচেন আফগানিস্তানের লালপুরায়। এখন খানিকটা উদ্বেগহীন নিশ্চিন্ততা। পথশ্রমে স্বভাব বড় ক্লান্ত। অতএব আশ্রয়ের বড় দরকার। আশ্রয় মিলল ধনী সর্দার খাঁর বাড়ীতে। ব্যবস্থা করলেন খা সাহেবই। লিখে দিলেন পরিচয় পত্র—এই পরিচয় পত্রই ওদের ছাড়পত্র।

'এই পত্রবাহক রহমৎ খাঁ ও জিয়াউদ্দিন পার্বত্য প্রদেশের অধিবাসী। এরা

সাখি সাহেবের দরগায় যাচ্ছেন। এদের চরিত্র সম্পর্কে আমি সম্যক জ্ঞাত এবং সে দায় আমারই। এদের যাত্রাপথে কেউ কোন প্রকারেই এদের উত্যক্ত করবেন না—এই আশা নিয়েই আমি এই পরিচয়-পত্র লিখে দিলাম।

নীচে সই করলেন সর্দার খাঁ।

সর্দার খাঁ দুজন সশস্ত্র প্রহরীর ব্যবস্থাও করে দিলেন।

এবার ওঁরা রওনা দিলেন কাবুলের পথে। পৌছালেনও সর্দার খাঁর নির্দেশমত কাবুল নদীর তীরে। নদী পার হলেন কি করে? শেষপর্যন্ত পাহাড়ী ব্যবস্থা অনুযায়ীই নদী পার হলেন।

খান আফগান রাজ্যে পৌছে গেছেন রহমৎ আর জিয়াউদ্দিন। প্রহরী দুজনকে বিদায় দিতে হল এখানেই। অস্ত্র বহনের অনুমতি নেই আফগান রাজ্যে।

সোজা পথে যাওয়া চলে। কিন্তু খানাতল্লাসী ব্যাপারটিকে এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অতএব ঘুরপথে যাওয়াই ভাল। পৌছালেন ওরা ঠাণ্ডী। এখান হতেই ধরতে হবে ওদের কাবুল যাওয়ার বাস। বাস পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল একটা লরী। লরীই সই। উঠে বসলেন ওঁরা দুজনে।

পরদিন লরীটা এসে দাঁড়াল বাট্-খাক্ এ। এখানে পরীক্ষা করে দেখা হবে পাসপোর্ট।

সুভাষকে প্রশ্ন করলেন অফিসার পাসপোর্ট কোথায়?

নিরুত্তর সুভাষ। তিনি তো এখন মূক বধিরের ভূমিকায়।

এগিয়ে এলেন রহমৎ। রহমৎ জানালেন, পাসপোর্ট তাঁদের নেই তাঁরা সাখি পীরের দরগায় যাচ্ছেন। অগত্যা সর্দার খাঁর লিখিত পরিচয়-পত্রখানাই দেখে যাওয়ার অনুমতি দিল অফিসার।

এবার লরীর গতিটা যেন আরও একটু দ্রুত। অবশেষে ওরা পৌছালেন কাবুল। দুপুর গড়িয়ে তখন বিকেল।

বাজারের নিকটবর্তী একটা সরাইখানার আশ্রয়প্রার্থী হয়ে দাড়ালেন ওঁরা। ঘর একটা মিলল ভাগ্যের জোরে।

রহমৎ খাঁ বললেন, নওজয়ান ভারত সভার প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারী উত্তমচাঁদ মালহোত্র। যিনি উনিশ শ তিরিশে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তিনি

এই কাবুলেই থাকেন। ক্ষীণ একটা আশার আলো। রহমৎ সন্ধান করলেন উত্তমচাঁদ মালহোত্রের।

সন্ধান পেলেনও। কিন্তু কয়েকদিন আরও এই সরাইখানায় অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কয়েক দিন নিরাপদেই কাটল। সেদিনও রহমৎ ফিরে এলেন। সরাইখানার কাছাকাছি এসেই অন্যদিনের মত আজও চমকে উঠলেন, আজও সেই লোকটা সাদা পোষাকে সরাইখানার উল্টো দিকের রুটির দোকানে বসে আছে। সদা জাগ্রত দৃষ্টি তাদের উপরেই।

রহমৎ খাঁ যেন একটু দ্রুতই পা চালিয়ে সরাইখানায় ঢুকে পড়লেন। বললেন জিয়াউদ্দিনকে, মনে হয় সাদা পোষাকে একজন পুলিস আজ কদিন থেকেই আমাদের অনুসরণ করছে।

সরাইখানার সেই ছোট্ট ঘরটায় সাদা পোষাক পরা সেই লোকটা হাজির হয়েছে।

আপনারা কে? এখানেই বা কেন এসেছেন?

রহমৎ বিনয়ে ভেঙে পড়লেন।

বোবা ও কালা ভাইকে নিয়ে সাখি সাহেবের দরগায় যাচ্ছি, পথঘাট সব বন্ধ হয়ে গেছে বরফ পড়ে, তাই অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছি এখানে।

পুলিস বিশ্বাস করে না। আমার সঙ্গে থানায় চলুন।

প্রমাদ গণলেন এবার ভকৎরাম, প্রমাদ গণলেন সুভাষচন্দ্রও। সমস্ত পরিকল্পনা এখানে এসে নষ্ট হয়ে যায় বুঝি। একটা সামান্য পুলিশের মোকাবিলা করার ক্ষমতা ওদের আছে, কিন্তু তারপর?

রহমৎ এবারে কিছু টাকা পুলিসের হাতে জলপানি খেতে গুঁজে দিয়ে বললেন, আমি যাব থানায়। কিন্তু আমার অসুস্থ ভাই সঙ্গে যেতে পারবে না।

পুলিশের সুর এখন অনেক নরম। উপরি পাওনার অনেক গুণ।

বের হয়ে পড়লেন রহমৎ। উত্তমচাঁদের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। হাজির হলেন উত্তমচাঁদের রেডিওর দোকানে।

একজন আগন্তুক দেখেই জিজ্ঞেস করলেন উত্তমচাঁদ, কাকে চাই?

আপনার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কয়েকটা কথা আছে।

উত্তমচাঁদ কিছু ভেবে রহমৎকে নিয়ে গেলেন নিভৃতে।

আমি মর্দান জেলার ভকৎরাম। নওজোয়ান ভারত সভার কর্মী ছিলাম। উত্তমচাঁদ এবারে চিনতে পেরেছেন ভকৎরামকে।

কি ব্যাপার বলুন তো ?

সুভাষ বাবুর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন, তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিদেশী কোন শক্তির সঙ্গে মিলিত হবেন বলেই ভারত ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন এখানে একটা সরাইখানায় তিনি আছেন। কিন্তু বড়ই উৎপাত করছে পুলিস। সুভাষবাবু আপনার আশ্রয় চান।

সে তো আমার সৌভাগ্য। তবে একটা অসুবিধাও আছে তাতে। আমি হিন্দু পাড়ায় থাকি। ওরা দুজনেই মুসলমানের ছদ্মবেশে। এ অবস্থায় আমার ওখানে উঠলে সন্দেহ জাগতে কতক্ষণ ?

হতাশায় ভেঙে পড়লেন ভকৎরাম। তাহলে উপায় ?

উত্তমচাঁদ বললেন, আমার এক মুসলমান বন্ধুর সাহায্য নেবো। সেখানে থাকলে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকবে না।

কিন্তু—নিরাপত্তার একটা প্রশ্ন ওঠে ভকৎরামের মনে।

না কোন কিন্তু নেই এতে ভকৎরামবাবু। আমার মুসলমান বন্ধু হাজি সাহেব নামেই পরিচিত। বয়স্ক ভদ্রলোক। তাঁর স্ত্রী একজন জার্মান মহিলা। তা ছাড়া হাজি সাহেব ব্রিটিশ বিদ্বেষী—ভারত স্বাধীনতা লাভ করুক এ ইচ্ছা তিনি পোষণ করেন।

রাজী হলেন ভকৎরাম। এছাড়া অন্য উপায় নেই।

হাজি সাহেব রাজি হলেন না একজন পলাতক আসামীকে ঠাঁই দিতে। সুতরাং মনস্থির করে নিলেন উত্তমচাঁদ, সুভাষবাবুকে নিজের বাড়িতেই রাখলেন। তারপর যা ঘটে ঘটুক।

সুভাষ এখানে পেলেন আত্মীয়-সমাদর। উত্তমচাঁদের স্ত্রী জার্মান মহিলা স্বাধীনতার মর্যাদা বুঝতেন। তাই স্বাধীনতা কামী সুভাষচন্দ্রের প্রতি ছিল সস্নেহ পরিচর্যা।

সুভাষের ইচ্ছা ছিল তিনি মস্কো যাবেন। ভকৎরাম কথাবার্তা চালাবার চেষ্টা করলেন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে। কিন্তু কিছু ফল হল না। অবশেষে ইতালির রাষ্ট্রদূতকে জানানো হল এ বিষয়। রাষ্ট্রদূত সালের ক্যারনী ও মিসেস ক্যারনী

আগ্রহী হয়ে উঠলেন এ ব্যাপারে, রোম থেকে সুভাষচন্দ্রের পাসপোর্ট যেন মঞ্জুর হয়ে আসে সে চেষ্টা করতে লাগলেন। অপেক্ষা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

দিন কেটে যায়। সুভাষ আবার উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। ভাবতে লাগলেন অন্য কোন ব্যবস্থার কথা। চেষ্টাও চালালেন।

হাজির হলেন সেদিন হঠাৎ মিসেস ক্যারোনী।

এই নিন আপনার পাসপোর্ট। ইতালী ও জার্মানী মঞ্জুর করেছে আপনার পাসপোর্ট। আমার ও মিঃ ক্যারনীর শুভেচ্ছা রইল।

সুভাষচন্দ্রের মুখ উজ্জ্বল। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রইলেন মিঃ ও মিসেস ক্যারনী।

আঠারই মার্চ। কাবুল ছাড়লেন সুভাষচন্দ্র।

না, এখন তিনি আর সুভাষচন্দ্রও নন, জিয়াউদ্দিনও নন। এখন তিনি ইতালির অধিবাসী অরল্যাণ্ডো ম্যাজোটা। এবারে সঙ্গী একজন ইতালীয় ও দুজন জার্মান।

কাবুল থেকে যাত্রা করে রাশিয়ার সীমান্ত অবধি মোটরে পৌছালেন পুল খুমড়ী। রাতটা এখানেই কাটাতে হল।

পরদিন ওরা এলেন রাশিয়ায়। ট্রেনে মস্কো। কিন্তু রাশিয়ায় সরকারী ভাবে কোন সাহায্য পাওয়া সম্ভবপর হল না সুভাষের পক্ষে। কিন্তু সুভাষের সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি দিলেন রাশিয়া সরকার। ইংরেজের সঙ্গে সোভিয়েটের তখন নূতন আলোচনা শুরু হয়েছে—মধ্যস্থতা করেছেন ক্রীপস। যদি শেষ পর্যন্ত আলোচনা সফলতা লাভ করে তাহলে জার্মানীর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রইবে না সোভিয়েটের—এ কথা অত্যন্ত সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন সুভাষচন্দ্র। অতএব অযথা মস্কোতে কালক্ষেপ করা বৃথা।

সুভাষ রওনা হলেন জার্মানীর দিকে। লক্ষ্য : বার্লিন।

আর উত্তমচাঁদ!

তিনি ধরা পড়ে গেলেন পুলিশের শ্যেন দৃষ্টিতে। প্রমাণ কোরল ওরা উত্তমচাঁদই সুভাষকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন।

অতএব উত্তমচাঁদের হল দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ড। সমস্ত সম্পত্তি হল সরকারের বাজেয়াপ্ত। তা হোক উত্তমচাঁদ।

তোমার মহাপ্রাণতার কথা, তোমার উদার হৃদয়ের কথা তো বাঙালীর মনের মনি-কোঠোর অক্ষয় সামগ্রী। আমরা তো জানি, তোমার সাহায্য না পেলে সুভাষ-বাবুর পক্ষে কোন পরিকল্পনাই বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হ'ত না।

য়ুরোপ সেদিন মৃত্যু-ভোলা। ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে ইংরাজ শক্তি। দুই মহানায়ক সেদিন সারা ইউরোপকে জাগিয়েছেন। একজন জার্মানীর হিটলার আর অন্যজন ইতালির মুসোলিনী।

বার্লিনে পেঁছেছেন সুভাষচন্দ্র। এখন শুধুমাত্র সুযোগের অপেক্ষা। সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করেন: ভারতবর্ষ আজ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত, শুধু প্রয়োজন প্রারম্ভিক পর্বের সাহস।

স্বপ্ন দেখেন তিনি: একবার যদি জার্মানী কিংবা ইতালী কিংবা জাপান ভারত সীমান্তে গিয়ে দাঁড়ায় তাহলে ভারতীয় সৈন্য ইংরাজ পক্ষ ছেড়ে আসবে। বিদ্রোহ করবে সাধারণ মানুষ। আর অবসান ঘটবে এতদিনের পরাধীনতার।

জার্মান বৈদেশিক দপ্তরে দেখা করতে এলেন ইটালিয়ান পাস পোর্ট হাতে অরল্যাণ্ডো ম্যাৎসোটা নামে এক আগন্তুক।

কিন্তু আশ্রয় মিলল না জার্মান বৈদেশিক দপ্তরে।

হতাশ হলেন অরল্যাণ্ডে ম্যাজোটা ওরফে সুভাষচন্দ্র। কিন্তু হতাশাকে প্রশ্রয় দিলে তো চলবে না। অগত্যা ব্রিটিশ দূতাবাসেই আশ্রয় নিতে হল। হিটলার তো জানতেন সুভাষচন্দ্র ভারতের বিদ্রোহের বিপ্লবের অগ্রদূত। তিনি তো জানতেন সুভাষচন্দ্র ইংরাজ বিদ্বেষী। তাহলে বিশ্বাস করবেন না কেন তিনি তাঁকে? সুভাষচন্দ্র জানতেন হিটলারের ভুল একদিন ভাঙবেই।

সুভাষচন্দ্র দাখিল করলেন—জার্মান বৈদেশিক দপ্তরে আজাদ হিন্দ সংঘ গঠন করার পরিকল্পনার খসড়া। কিভাবে নানা ভাষায় বেতার মারফত আজাদ হিন্দ সংঘের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রচার চালানো হবে সব কিছুর একটা নিখুঁত পরিকল্পনা এই খসড়া-পত্রটি।

য়ুরোপের নানাস্থানে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী ভারতবাসীদেরই তিনি এই কর্মযজ্ঞে যোগদানের আহ্বান জানাবেন।

সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা সম্পর্কে এঁদের কোন দ্বিমত নেই।

স্থাপিত হল আজাদ হিন্দ সংঘ। শুরু হল কর্মসূচীর রূপায়ণ।

জার্মানীর আন্না বুর্গ ক্যাম্প। বহু ভারতীয় সৈন্য যারা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল, তারা বন্দী জীবন যাপন করছে এই ক্যাম্পে।

তিনি ঠিক করলেন এই বন্দী সৈন্যদের কাজে লাগালেন।

সুযোগ বুঝে তিনি কথা পাড়লেন এদের কাছে।

জানালেন ভারতবর্ষের কথা—ভারতীয়দের দুর্দশা আর লাঞ্ছনার কথা। তারপর প্রকাশ করলেন তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্যটিকে।

এবার অভূতপূর্ব সাড়া পেলেন ঐ যুদ্ধবন্দীদের কাছ হতেই। সুভাষচন্দ্র হলেন সর্বাধিনায়ক। গঠিত হল তিনটি ডিভিসন নিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী।

আজাদ হিন্দ ফৌজের অধীনে রইল বার্লিন ও রোম বেতারকেন্দ্র।

তারপর চলল দীর্ঘ প্রস্তুতি। অনুশীলন।

অবশেষে ফৌজ গঠনের কথা ঘোষণা করলেন সুভাষ স্বাধীন ভারতীয় ফৌজের সম্মেলনে ভাষণ দিয়ে। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের ছাব্বিশে জানুয়ারী। জার্মানীর অধিনায়ক হের হিটলার সেদিন অভিবাদন জানালেন ভারতের জাতীয় পতাকাকে।

ইতিহাসের গতিরও পরিবর্তন হয়েছে তখন।

তিনি এটুকু বুঝতে পেরেছেন জাপানের সাহায্য ওর একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু হের হিটলার সুভাষকে ছাড়তে রাজী নন।

তখন সুভাষের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী ট্রট এগিয়ে এলেন।

আলোচনায় বসলেন হিটলারের সঙ্গে। চলল বাকবিতণ্ডা। শেষ পর্যন্ত ট্রটেরই জয় হল। সুভাষ অনুমতি পেলেন জাপান যাত্রার। সুভাষের মনটা আবার আনন্দে নেচে উঠল। ওখানে রয়েছে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু আর রাসবিহারী প্রতিষ্ঠিত আজাদ হিন্দ বাহিনী।

সুভাষ রওনা হলেন জাপান। উনিশ শ' তেতাল্লিশের জুন মাসে সাবমেরিনে মাত্র একজন সঙ্গী নিয়ে পৌঁছালেন জাপানে।

এখানে সম্বর্ধনা আর সম্বর্ধনা। রাসবিহারী সুভাষের হাতে তুলে দিলেন ওঁর আজাদ হিন্দ বাহিনী। সুভাষ অভিবাদন করলেন ওঁদের।

বললেন দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ—চলো দিল্লী। আপসে স্বাধীনতা

আসবে না—আসতে পারে না। আমাদের দাবি স্বাধীনতার দাবি। আর এ দাবি পূরণের জন্যই আমাদের এ সংগ্রাম।

রিক্ত আমি, সর্বহারা আমি, তোমাদের হয়তো আমি আজ কিছুই দিতে পারব না। তবে আমাকে রক্ত দাও, আমি স্বাধীনতা দেব।

জাপানের প্রধান মন্ত্রী তেজো এলেন সিঙ্গাপুরে।

প্রধান মন্ত্রী তেজো নেতাজীর সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানালেন ভারতের জাতীয় পতাকাকে। গ্রহণ করলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিবাদন।

দিকে দিকে জাগল সাড়া।

সাড়া দিয়েছে আজ ভারতীয় ললনারাও।

সুভাষের সঙ্গে দেখা করলেন ক্যাপটেন লক্ষী স্বামীনাথন।

আমাকে কাজ দিন!

কি কাজ দেব?

দেশ সেবার কাজ। যুদ্ধে যোগদানের সুযোগ।

যুদ্ধে? চমকে উঠলেন সুভাষ।

হ্যাঁ। যুদ্ধেই আমরা সমান অংশ গ্রহণ করতে চাই।

অবাক সুভাষ! বীরাঙ্গনা এঁরাই।

গঠিত হল আজাদ হিন্দ ফৌজের নারী বাহিনী ক্যাপ্টেন লক্ষী স্বামীনাথনের পরিচালনায়।

তাঁরই পরিচালিত বাহিনীর নতুন নামকরণ হল, ঝাঁন্সির রানী বাহিনী। যোগ দিল একশত ছাপান্ন জন নারী এ বাহিনীতে।

ওদের লক্ষ্য যে স্বাধীনতা! ওরা যে মরণ পণ করেছে!

একুশে অক্টোবর।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল তিথি।

আজাদ হিন্দ রাষ্ট্র ঘোষিত হল; 'আমি সুভাষচন্দ্র ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আমি আমার মাতৃভূমি ভারতবর্ষ আর আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর স্বাধীনতা লাভের জন্য জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাব।'

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জনসভায় দাঁড়িয়ে নেতাজী উচ্চারণ করলেন এই শপথ বাণী।

শপথ গ্রহণ করলেন একে একে আজাদ হিন্দ্ সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীরাও। এগিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন লক্ষী স্বামীনাথন, ঝাঁন্সির রাণী বাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজের নারী শাখার নেত্রী। এগিয়ে এলেন প্রচারমন্ত্রী এস. এ. আয়েঙ্গার, অর্থমন্ত্রী লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল এ. সি. চ্যাটার্জী, সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ কর্ণেল শাহনওয়াজ, অন্যান্য সদস্যরাও। এস. এস. ভগৎ, জে. কে. ভোঁসলে, গুলজার সিং, এম. জেড. কিরানি, এ. ডি. লোকনাথন, ঈশান কাদির, আজিজ আবেদ—সকলেই শপথ বাক্য পাঠ করলেন। পাঠ করলেন সেক্রেটারী এ. এম. সহায়ও।

ঈশ্বর আর জন্মভূমির নামে মাতৃভূমি মুক্তির জন্য সংগ্রামের শপথ।

অতুলনীয় শক্তি ও মর্যাদা সম্পন্ন আজাদ হিন্দ সরকার স্থাপিত হল বিধিবদ্ধ ভাবে।

এ সরকার স্বীকৃতি পেল ইতালি, জার্মানী, ক্রোটিয়া, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, চীন, ফিলিপাইন ও মানচুরিয়ার কাছ হতে।

উনিশ শ' তেতাল্লিশ সাল, ২৫ শে অক্টোবর।

বেজে উঠল যুদ্ধ সংকেত। আজাদ হিন্দ সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে, যুদ্ধ ঘোষণা আমেরিকার বিরুদ্ধেও।

স্বাধীন ভারতবর্ষের শপথে এই প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা। বিস্ময়কর এ যুদ্ধ। আরাকান ফ্রণ্টে পৌছেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হলে চলবে না। প্রবেশ করতে হবে ভারতবর্ষে।

লক্ষ্য : দিল্লী। হটাতে হবে ইংরাজশক্তিকে এদেশ থেকে।

আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করতে হবে ভারতবর্ষে পৌছেই।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ তখন স্বাধীন। ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হল হল এ দ্বীপ দুটি। জাপান অধিকৃত এ দ্বীপদুটি প্রত্যার্পিত করা হল আজাদ হিন্দ সরকারকে।

নেতাজী আজ আনন্দে উদ্বেল। হওয়াই তো স্বাভাবিক।

এই প্রথম আজাদ সরকারের হাতে এল ব্রিটিশ শাসন মুক্ত ভারতীয় ভূখণ্ড। এ কী কম আনন্দের কথা!

এল উনিশ শ' চুয়াল্লিশের ফেব্রুয়ারী।

আর দেরী নয়। এবার ভারতভূমি আক্রমণ করতে হবে।

নির্দেশও সেই রকমই দিলেন নেতাজী।

কিন্তু প্রমাদ গণল আমেরিকাও।

ওরা সেদিন অত্যন্ত অনায়াসেই এটুকু বুঝতে পেরেছিল, আজাদ হিন্দ ফৌজ যদি তার বিরাট শক্তি নিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তাহলে সেই শক্তিকে রুখবার ক্ষমতা তাদের নেই।

অতএব ভারতে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হবে না আজাদ হিন্দ ফৌজকে। ঝুঁকি তোমরা নিতে চাইলে না। শুরু হল প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ। কিন্তু এতে কি ওদের গতি স্তব্ধ করা যায় ব্রিটিশ ?

ওরা তো মাতৃমুক্তিপণ করে 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনা হীন' ভেবেই যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছে। সুতরাং ওরা এগিয়ে চলেছে। বর্মা বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করছে ইংরেজ। মরিয়া আজ জাপানও।

হাকোয়াং উপত্যকায় ইংরেজদের আক্রমণ তখন দুর্বার। চিন্দুইন নদী যে কোন সময়েই অতিক্রম করে আসতে পারে ইংরেজ ফৌজ। ব্যস্ত হয়ে উঠল জাপান। ওরা নিল নতুন পরিকল্পনা। ইম্ফল দখলের লড়াই লড়তে এখন তারা বদ্ধ পরিকর।

কিন্তু সুভাষ তা মেনে নিতে পারলেন না।

জাপানীরা ভারত আক্রমণ করুক, আজাদ হিন্দ ফৌজ তা মেনে নেবে না, নিতে পারে না।

অবশ্য ইম্ফল যুদ্ধে প্রধান ভূমিকা নিল আজাদ হিন্দ ফৌজই। যুদ্ধে অংশ নিল তিনটি সুগঠিত সামরিক বাহিনী। সুভাষ ব্রিগেড, গান্ধী ব্রিগেড, আজাদ ব্রিগেড। নেতৃত্ব দিলেন কর্ণেল শাহ নওয়াজ, কর্ণেল ইনায়াৎ কয়ানি আর কর্ণেল মোহন সিং। এগিয়ে চলেছে তিনটি বাহিনীই।

বাহাদুর শাহ, আত্মঘাতী বাহিনী, বালসেনা বাহিনী, তাদের অনুসরণ করছে। আরও পেছনে রয়েছে গুরুবক্স সিং ধীলনের নেতৃত্বে নেহেরু ব্রিগেড।

এগিয়ে চল। এগিয়ে চল। সুভাষের কণ্ঠে ধ্বনিত হল।

Give me blood, I will give you freedom

শুরু হল ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম।

রণক্ষেত্রে সব সময় সঙ্গ দিচ্ছেন সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র। তদারক করছেন, খবর নিচ্ছেন, শোনাচ্ছেন সান্ত্বনার বাণী।

মুমূর্ষু সৈনিকরাও আজ নতুন উৎসাহে উদ্দীপিত—তাদের সর্বাধিনায়ককে পাশে পেয়ে। এগিয়ে চলে আজাদ হিন্দ বাহিনী বর্মা অভিমুখে। অবশ্য প্রধান লক্ষ্য, দিল্লী।

মণিপুর এখন ঘিরে ফেলেছে আজাদ হিন্দ ফৌজ। চতুর্দিক থেকে। বিস্ময়কর তাদের সাফল্য।

ওরা মরণ পণ নিয়েছে, রাজধানী ইম্ফলের পতন ঘটাতেই হবে।

আর ইম্ফলের পতন ঘটলেই তো বাংলা বিহার উড়িষ্যার সমতল ক্ষেত্র পর্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের গতি রোধ করে এমন শক্তি কার?

কিন্তু এ কী দুর্দৈব। সাফল্যের মুখে কেন এমন অন্তরায়, বাধার প্রাচীর। প্রবল পাহাড়ী বৃষ্টির ঢল নেমেছে তখন।

জাপান সরকার ইতস্ততঃ করছে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহে।

খাদ্য চাই, রসদ চাই—সব ফুরিয়ে আসছে। এ অবস্থায় সুমুখপানে এগিয়ে যাওয়ার ঝুকি নেওয়া কি সম্ভব? চিন্তান্বিত নেতাজী।

আপাততঃ যুদ্ধ স্থগিত রেখে পশ্চাদপসরণ করতে হবে।

আজ আজাদ হিন্দ বাহিনীর সম্মুখে আর কোন পথ উন্মুক্ত নেই।

রেঙ্গুনের অদূরেই শত্রু-সৈন্য পৌছে গেছে। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তারপরই শত্রু নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে রেঙ্গুনের বুকে। নেতাজীকে এই নেকড়ের পালের মুখে ছেড়ে দেওয়া যায় না।

ব্যস্ত হয়ে ওঠেন ভোঁসলে, কিয়ানি, আয়ার। নেতাজী, আপনি সত্বর রেঙ্গুন থেকে চলে যান।

বিদায় বর্মা। বিদায়। কিন্তু বর্মা ছেড়ে যাবেন কোথায়?

প্রথমে ব্যাঙ্ককে, তারপর সিঙ্গাপুর। ব্যাঙ্ককে পৌছেই নেতাজী জানতে পেরেছিলেন, আত্মসমর্পণ করেছে জার্মানী।

আরও সংবাদ এল রাশিয়া জাপান আক্রমণ করেছে।

এবারে জাপানের পরাজয়ও অনিবার্য।

খবর এল সিঙ্গাপুর থেকে। অবিলম্বে সেখানে নেতাজীর উপস্থিতি প্রয়োজন।

নেতাজীকে সিঙ্গাপুর রওনা হতেই হবে। সমশের সিং, মেজর জেনারেল আলাগপ্পান, কর্ণেল নাগায় অনুসরণ করলেন নেতাজীকে।

নেতাজীকে কোন কারণেই একা ছেড়ে দেওয়া চলে না।

সিঙ্গাপুর পৌছলেন নেতাজী।

শুরু হল কর্ণেল হাবিবুর রহমনের সঙ্গে গোপন পরামর্শ।

জাপানের আত্মসমর্পণের সংবাদ রেডিও মারফৎ প্রচারিত হয়েছে।

যদি সে কথা সত্য হয় তাহলে এখন তাদের অনুসরণীয় কর্ত্তব্য কি ?

সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রিসভা : নেতাজীকে শত্রু সৈন্তর হাতে কোন কারণেই ধরা পড়লে চলবে না।

সতেরই আগস্ট। নেতাজী এলেন ব্যাঙ্ককে।

আজাদ হিন্দ সংঘের শিবির পরিদর্শনে এলেন তিনি।

জাপানীরা আত্মসমর্পণ করে থাকলেও আমরা আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যরা কিন্তু আদৌ আত্মসমর্পন করিনি।

নেতাজী অবাক। এত বড় বিপর্যয়ের পরেও সৈন্য বাহিনীর কি অটুট মনোবল! তিনি মেজর জেনারেল ভোঁসলের হাতে তুলে দিলেন নেতাজীর আত্মসমর্পণের নির্দেশনামা। যথা সময়ে নেতাজীর স্বহস্ত স্বাক্ষরিত নির্দেশ নামা এসে পৌছাল সৈন্য দলের কাছে।

এ অবিশ্বাস্য! অথচ তারা তো শুধু মাত্র দুর্বার স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষাটুকু সম্বল করেই যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পিছু হটতে চায় নি। জাপানীরা পিছু হটলেও তারা তো পিছু হটে নি।

তাহলে নেতাজী কেন এমন নির্দেশনামা তাদের দিলেন।

কেন ? কেন ? কে দেবে সে প্রশ্নের উত্তর ?

একমাত্র যিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন তিনি তো তখন রওনা হয়ে গেছেন টোকিও। উদ্দেশ্য জাপান সরকারের সঙ্গে আলোচনা, পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত।

কিন্তু উন্মোচিত হল না রহস্য-অবগুণ্ঠন। শুধু ইথারে ইথারে ভেসে এল

একটি নিদারুণ দুঃসংবাদ। জাপানী নিউজ এজেন্সী প্রচার করছে সুভাষচন্দ্র বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।

কিন্তু তাইহোক দুর্ঘটনার কথা আমরা আজও বিশ্বাস করি না।

আমরা আজও প্রতীক্ষা করে আছি—কবে তিনি আবার ফিরে আসবেন আমাদের মাঝে।

আমরা ডাকছি—তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না আমাদের আহ্বান?

॥ আমাদের কথা ॥

কৃষাণের জীবনের শরিক হয়ে, কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা অর্জন করে মাটির কাছাকাছি পৌঁছে যে কবি সাধারণ মানুষের কানে শোনাতে পেরেছেন তাদের মর্মবেদনার ইতিহাস, শোনাতে পেরেছেন নতুন দিনের গান, যিনি সাধারণ মানুষকে বিপ্লবের সামিল হওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাতে পেরেছেন তিনি সুকান্ত।

সুকান্ত দিন বদলের কবি।

অথচ ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে এই কবি মাত্র একুশ বছর বয়সে মারা গেলেন। কিন্তু এই একুশ বছর বয়সে সুকান্ত রেখে গেলেন বাংলা সাহিত্যে তাঁর নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর। একটি বিশেষ আসনের অধিকারী হলেন সুকান্ত। এই আসন সুকান্ত হারাবেন না কোনদিনই। এ অনড়, অটল, অক্ষয়, অব্যয়।

সমাজে যারা অবহেলিত, যারা নিঃপেশিত, যারা নিতান্ত সাধারণ মানুষ তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিছেন সুকান্ত। তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সুকান্ত যেমন দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, সেই সৎসাহস আধুনিক কবিদের কোথায়?

সুকান্ত আজ ইতিহাস, বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস, তাই সুকান্তকে বার বার স্মরণ করতেই হয়।

ইতি—

শ্রদ্ধেয় সুনীলকুমার গুপ্তকে—

এসেছে নতুন শিশু তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান ;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ আর ধ্বংসস্তূপ পিট
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি—
এ জাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে,
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাবো আশীর্বাদ,
তারপর হবো ইতিহাস।

[ছাড়-পত্র]

কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য সত্যই ইতিহাস, সুকান্ত সম্পূর্ণ একটি নতুন যুগ।

মাত্র একুশ বছর বয়সেই কবি সুকান্তকে চির-বিদায় নিতে হল বাংলার শ্রমিক, কৃষক, মুটে, মজুরের কাছ হতে, চির-বিদায় নিতে হল বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণ হতে, অবশ্য তার আগেই রচনা করেছেন একটি নয়া ইতিহাস।

স্বপ্নভঙ্গের কবি সুকান্ত, পুনরভ্যুত্থানের কবি সুকান্ত অগ্নি অক্ষরে লিখে গেছেন কৃষক-মজুরের দুঃখ আর দুঃস্থতার সামিল হতে চেয়ে তাদেরই কথা। তাই ভঙ্গী দিয়ে, শুধুমাত্র চোখ ধাঁধিয়ে দেন নি স্থান করে নিয়েছেন সাধারণ মানুষের মনের মণি কোঠায়।

তেরোশত তেত্রিশ সালের শ্রাবণ সংক্রান্তি তিথিতে কবি সুকান্তের জন্ম।

কালীঘাট অঞ্চলের বিয়াল্লিশ নম্বর মহিম হালদার ষ্ট্রীটের দোতলার ছোট একটি ঘরে নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুনীতি পুত্র জন্ম নিল মহিম হালদার ষ্ট্রীটের বাড়ীটা সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের। ইনি নবজাতক শিশু দাদামশাই নবজাত শিশুর জন্মলগ্নে গোটা বাড়ীটা জুড়ে যে আনন্দের রোল উঠেছিল সে যে অত্যল্পকালের আয়ু নিয়ে এসেছে তা সে দিনের কেউ ভাবেনি বলেই হয়তো বা বিধাতা অলক্ষে বসে হেসেছিলেন। হাসিকান্নার দোল দোলানো পৌষ-ফাল্গুনের পালার শেষে শুধু কান্না আর শোক পুঁজি রেখে গেলেন সর্বহারার কবি, দিন বদলের কবি সুকান্ত। শুধু সান্ত্বনা রইল অমর।

সুকান্তের জন্ম কলিকাতায়, কিন্তু তার পূর্ব পুরুষেরা ছিলেন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার কোটালী পাড়ার অধিবাসী। সুকান্তের পিতা নিবারণ ভট্টাচার্যকে আশৈশব দারিদ্র্যের সংগে সংগ্রাম করতে হয়েছে। শৈশবেই তিনি পিতাকে হারিয়েছিলেন ওঁরা তখন নাবালক, সুতরাং নিবারণবাবুর ভাগ্যে উচ্চশিক্ষা লাভ সম্ভব হল না। অথচ শৈশব ও কৈশোর ঘিরে তখন কত না মধুর স্বপ্নই তিনি রচনা করেছিলেন। দারিদ্র্য আর অভাব অনটন সেই মধুর স্বপ্ন ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। নিবারণবাবু বুঝলেন এ-ই তাঁর ভাগ্যের পরিণতি। ভাগ্য বা ভাগ্যের নির্দেশকে মেনে নেওয়ার মতো মনোবল তিনি কোন দিনই হারান নি। তাই ভগবানে বিশ্বাস রেখে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্য প্রস্তুত হলেন মনেপ্রাণে।

বৃত্তি হিসেবে বেছে নিলেন পৌরোহিত্যের কাজ।

একান্নবর্তী পরিবার ওঁদের।

ওঁরা ফরিদপুর থেকে কোলকাতায় চলে এসেছেন। উত্তর কোলকাতার বাগবাজারের নিবেদিতা লেনের একটা সাধারণ ভাড়া বাড়ীতেই ওদের একান্নবর্তী

সংসার। এ সংসার সুকান্তের পিতা নিবারণ ভট্টাচার্য ও জ্যেঠামশাই কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের। এই বাগবাজারের নিবেদিতা লেনের বাড়ীতেই সুকান্তের শৈশব অতিবাহিত হয়েছিল।

সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন সুকান্তের জ্যেঠামশায়। ইনি শুধু মাত্র সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন তা নয়, সাহিত্যসেবা মনেরও অধিকারী ছিলেন। তাই তাঁর পরিচালিত সাহিত্যচক্রের আসরে জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তির আগমনের কমতি ছিল না, অবশ্য এরা সকলেই সাহিত্যচক্রের আসরে সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা করতেন। আর একটি নব্য সাহিত্যচক্র গড়ে উঠেছিল এই একই বাড়ীর একই ছাদের তলে। যার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সুকান্তের জ্যেঠামশাই কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র রাখাল ভট্টাচার্য এবং সুকান্তের এক দূর সম্পর্কের কাকা। বাড়ীর এই সাহিত্যের আবহাওয়ার মধ্যেই শিশু সুকান্ত বড় হয়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছিলেন।

'রমলা' খ্যাত সাহিত্যিক মণীন্দ্রলাল বসুর 'সুকান্ত গল্প পড়ে সুকান্তের নাম রেখেছিলেন তাঁর রাণীদি। এই জ্যেঠতুতো দিদি রাণী সুকান্তকে ভালবাসতেন খুব। শিশু সুকান্ত রাণীদির কোলে কাটিয়েছেন অধিকাংশ সময়। সুকান্তকে কোলে নিয়ে রাণীদি আদর করতেন, শোনাতেন তাঁকে হরেক রকম ছড়া ও কবিতা এগুলোর মধ্যে প্রধান পেয়েছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনীর' কবিতাগুলো। রাণীদির সঙ্গে সুর মেলাতেন শিশু সুকান্ত। সুকান্ত তার আধো-বোলে রাণীদির সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করতেন।

হয়তো বা তাঁর অবচেতন মনে কবি হওয়ার আকাঙ্খার বীজ অঙ্কুরের পাখা মেলেছিল তখনই। সুকান্তের কবিসত্বার বিকাশে রাণীদির এই ভূমিকাটুকু লক্ষ্য করবার মত।

রাণীদি আর রাণীদি।

এছাড়া শিশু সুকান্ত আর কিছু জানে না।

তখন ওঁরা নিবেদিতা লেনের বাড়ী ছেড়ে বেলেঘাটার চৌত্রিশ নম্বর হরমোহন লেনের নিজের বাড়ীতে উঠেছেন।

সুকান্তের দিনগুলো রাণীদির অপত্যস্নেহে বেশ কাটছিল!

কিন্তু হঠাৎ কি যেন হল। সব যেন একেবারে ওলট-পালট হয়ে গেল।

সারা বাড়ী জুড়ে কান্নার রোলে সচকিত হয়ে উঠেন সাত আট বছরের বালক সুকান্ত।

মা কাঁদছেন, জ্যেঠামশাই কাঁদছেন, গোটা বাড়ীটা কাঁদছে। কাঁদছেন সুকান্তও।

রাণীদি নেই।

রাণীদি সকলকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন।

রাণীদির মৃত্যুশোক সকলের হৃদয়েই বড় বেজেছিল। রাণীদি, যে ছিল সকলের প্রিয়। রাণীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে ভেঙে পড়লেন সুকান্তের জ্যেঠামশাই। কন্যার মৃত্যু পিতার বুকে শেলসম বিঁধেছিল। তাই নতুন বাড়ীর মোহ তার আর রইল না।

রাণীদির মৃত্যুর কেন্দ্র করে ওদের একান্নবর্তী পরিবার ভেগে গেল সুকান্তের বাবা আর তাঁর জ্যেঠামশায়ের পরিবার পৃথক হয়ে গেল। সুকান্তের জ্যেঠামশাই কৃষ্ণচন্দ্র বেলেঘাটার বাড়ী ছাড়লেন! তিনি হুগলী জেলার উত্তরপাড়ায় চলে এলেন। আর সুকান্তের বাবা আশ্রয় নিলেন কলেজ ষ্ট্রিটের একটা ভাড়া বাড়ীতে।

এই নতুন পরিবেশে পোঁছে হাঁফিয়ে উঠলেন সুকান্ত। একান্নবর্তী পরিবারে থাকতে অভ্যস্ত, সুকান্তের ভাল লাগত না পৃথকভাবে থাকতে। তা ছাড়া তাঁর বারবার মনে পড়ত রাণীদির কথা। রাণীদির কোলে ওঠার সুযোগ তার আসে না। আর তিনি এ সুযোগ পাবেন না, ভাবতে গিয়েই তাঁর দুচোখ জলে ভরে আসত। এ কথা বসে বসে ভাবতেন আর কাঁদতেন তিনি। এই নিঃসঙ্গতার হাত থেকে অবশেষে সাময়িক মুক্তি পেলেন সুকান্ত। উত্তর কলকাতায় প্রাথমিক বিদ্যামন্দিরে ভর্তি হলেন তিনি।

তাঁদের পাড়ায় থাকতেন এই বিদ্যালয়েরই একজন শিক্ষক অহীন বাবু অহীনবাবু সঙ্গে তাঁদের পরিবারের একটা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল, স্থাপিত হয়েছিল প্রীতি মধুর সম্পর্ক।

একদিন সুকান্তের বাবা অহীনবাবুকে তাঁর ছেলে দুটিকে ওঁদের স্কুলে ভর্তি করার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছিলেন। অহীনবাবু রাজী হয়েছিলেন।

দিনক্ষণ পাঁজি দেখা হল। আর দেখা হইবে বা না কেন? ভাগ্য আর ভগবানে বিশ্বাসী নিবারণবাবুর কছে এগুলোর মূল্য কম ছিল না। শুভদিন শুভক্ষনে অতীনবাবু সুকান্তদের দুই ভাইকে ভর্তি করে দিলেন কমলা বিদ্যামন্দিরে।

শীর্ণ শ্যামবর্ণ মুখচোরা লাজুক সুকান্ত চোখে মুখে প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি নিয়ে বিদ্যালয় জীবনে শুরুতেই পেয়েছিলেন শিক্ষক মহাশয়ের স্নেহ আর উৎসাহ, আদর আর সহানুভূতি।

সুকান্তের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহপাঠি শৈলেন সরকার লিখেছেন "মাষ্টার মশাইরা বলতেন বাংলা যদি কেউ লিখতে পারে তো সে সুকান্ত। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্য সম্পর্ক ছেলেবেলা থেকেই ওকে আগ্রহান্বিত দেখেছি এবং ভালো রচনা লিখতে পারার প্রশংসাটাও ছিল ওর একার পাওনা।"

স্কুল পাঠ্য সুকান্তকে তৃপ্তি দিতে পারে নি। সুকান্ত তৃপ্তি পান নি। পৃথিবীকে জানতে চান তিনি। অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার, অপাওয়াকে। পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সুকান্তের মনে জেগেছিল ছোটবেলা হতে। তিনি বিভুতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী' সম্পর্কে তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে সমান আদরে এ বই বাংলার ঘরে ঘরে রাখা উচিত।

সুকান্ত কমলা বিদ্যামন্দিরের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। ক্লাসের সহপাঠিরা সবাই মিলে ঠিক করলেন একটা হাতে লেখা পত্রিকা বের করবেন সব দায়িত্ব সুকান্তর। পত্রিকাটির নাম রাখলেন—'সঞ্চয়'। পত্রিকায় সম্পাদকের লেখা থাকবে না এটা বড় বেশী বেমানান। সুতরাং সুকান্ত লিখলেন একটা ছোট্ট হাঁসির গল্প। সুকান্তর এই গল্প নির্ণয় ছাত্র মহলে হৈ হৈ পড়ে গেল। ছাত্রেরা সকলেই পড়লেন সুকান্তের এই গল্প। মাষ্টার মশাইরাও বাদ পড়লেন না। তাঁরা সুকান্তের এ গল্প পড়ে অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন, সুকান্ত একটি প্রতিভা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠকালে সুকান্তের রচনায় স্থান পেয়েছিল মণীষীদের জীবনী। বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শিখা' পত্রিকার প্রথমে সুকান্তের লেখার ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হল। গদ্যে লেখা বিবেকানন্দের জীবনী।

কমলা বিদ্যামন্দিরেই সুকান্ত তখন পড়ছেন। ঠিক হল বিদ্যালয়ে ‘ধ্রুব নাটকটি মঞ্চস্থ করা হবে। নাম ভূমিকাটি দেওয়া হল সুকান্ত সেদিন সু-অভিনয়ের মাধ্যমে প্রমাণ করলেন যে অভিনয় দক্ষতাও তাঁর আছে।

দিন গড়িয়ে গেল।

সুকান্ত শেষ করলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ। বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন তিনি নতুন স্কুল নতুন পরিবেশ। তা ছাড়া এখানে সহপাঠিদের সান্নিধ্যে বালক সুকান্ত তখন দিশেহারা। ঠিক ঠিক মন বসাতে পারছেন না স্কুলের পড়াশুনায়, খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন না নতুন সহপাঠি আর শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে।

সেই সময়ে বোধহয় বিধাতা প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকালেন সুকান্তের দিকে। তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর সহপাঠি অরুণাচল বসুকে। দেখতে দেখতে উভয়ের হৃদ্যতা গাঢ়তর হয়ে উঠল। ক্লাসে দুই বন্ধু পাশাপাশি বসেন। একে অপরের হৃদয় সান্নিধ্যের উত্তাপ বড় কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন—এই কাছাকাছি আসাটা ছিল সুকান্ত জীবনে শেষ দিন পর্যন্ত যখন একে অন্যের কাছ থেকে দূরে গেছেন তখন কিন্তু সেই ফাঁকটুকু পূরণ করার চেষ্টা করেছিলেন চিঠি লিখে।

এই স্কুলেই সুকান্ত পেয়েছিলেন একজন মাস্টার মহাশয়কে, যিনি সুকান্তকে প্রেরণা দিয়াছিলেন কবিতা লেখায়। বহু দুষ্প্রাপ্য বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করে সুকান্তকে দিয়েছিলেন ইনি। শুধু বাংলা ও সংস্কৃতই নয়, ইংরাজী সাহিত্য ও সেই সাহিত্য ও সাহিত্যের অনুবাদ শোনাতেন সুকান্তকে এই মাস্টার মশাই। ফলে বালক সুকান্তের মনে সেক্সপীয়ার ব্রাউনিং, কীটস ও শেলীর লেখার একটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। সুযোগ ও সুবিধে পেলেই সুকান্ত হাজির হতেন এই মাষ্টার মহাশয়ের বাড়িতে হাজির না হয়ে সুকান্তর উপায়ও ছিল না। মাষ্টার মশাইও যে সুকান্ত-প্রাণ হয়ে উঠেছিলেন।

অথচ এই মাস্টার মশাই সুকান্তকে আবিষ্কার করলেন একটা অদ্ভুত ঘটনার মাধ্যমে। ক্লাসেই।

সেদিন ইতিহাসের ক্লাসেও সুকান্ত একখানা কি বই যেন অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে পড়ছেন। ক্লাসে মাস্টার মশাই এসেছেন, পড়া জিজ্ঞেস করছেন—সে সব দিকে সুকান্তের বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। তিনি পড়ছেন তো পড়ছেনই।

সুকান্ত শোনেন নি সে প্রশ্ন।

সহপাঠি অরুণাচল বসুর কনুইয়ের ধাক্কায় সম্বিত ফিরে পেলেন সুকান্ত। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কিন্তু উত্তর কি দেবেন ছাই প্রশ্নই তো শোনেন নি।

মাস্টার মহাশয়ের গুরুগম্ভীর স্বর শোনা গেল, কি বই পড়ছিলে শুনি ?

সুকান্ত আর লুকিয়ে রাখতে পারল না গল্পের বইটা। ওটা বের হয়ে পড়েছে। মাস্টার মশাই বইটা হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে রাগে গর গর করে ফুটতে লাগলেন, ক্লাসে বসে তুমি এ কোন বই পড়ছিলে ?

সুকান্ত লজ্জায় আধোবদন কি উত্তর দেবেন তিনি। পাশের ছাত্রটি জানালেন, সুকান্ত কবিতা লেখে তো, তাই বাইরের বই-ই বেশী পড়ে।

বারুদে যেন অগ্নি সংযোগ হল।

মাস্টার মশাইয়ের ব্যঙ্গ স্বর শোনা গেল, কি বললে ? উনি কবিতা লেখেন ? কবি ?

হাঁ স্যার। খুব ভাল কবিতা লেখা। এবারের স্কুল ম্যাগজিনে ওর একটা কবিতা আছে।

ঘণ্টা বাজল। টিফিন পিরিয়ড।

মাস্টার মশাই বের হয়ে এলেন ক্লাস থেকে।

টিফিনে শেষে ডেকে পাঠালেন সুকান্তকে। সুকান্ত এলেন টিচার্স রুমে ভয়ে ভয়ে দুরু দুরু বুকেই তিনি এসেছিলেন। কিন্তু এ কী মাস্টার মশাই তাঁকে ডাকলেন তুই কিছু মনে করিস না সুকান্ত। তোর বই আমি পড়লাম। আমি বিশ্বাস করি তুই নিশ্চয় বড় কবি হবি।

সেই দিন থেকেই মাস্টার মশাইয়ের সহাচর্য পেলেন সুকান্ত পেলেন স্নেহ ভালবাসা।

সুকান্ত তখন ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় প্রস্তুত হচ্ছেন।

রাণীদির মৃত্যুশোক তখনও ভুলতে পারেন নি তিনি। আর একটি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হল তাঁকে। তিনি মাকে হারালেন।

মার মৃত্যু সুকান্তের আরও বেশী একলা করে তুলল। রাণীদির কথা তিনি ভুলতে পারেন নি, তার উপর মা-ও তাঁর শাসন ও স্নেহ তুলে নিলেন তাঁদের উপর থেকে।

তিনি এ পৃথিবীতে আর কোনদিন ফিরে আসবেন না। শুধু সুকান্তর জন্য রেখে গেলেন কর্তব্য আর কর্তব্য।

বাবা নিবারণ ভট্টাচার্যের এমন আর্থিক সঙ্গতি নেই যে বাড়ীর কাজের জন্য বা রান্নার জন্য লোক রাখেন। সুকান্তের ভাইয়েরাও ছোট সুতরাং ছোট ছোট ভাইদের দেখাশুনা করার রান্নার কাজ করার তাদের আব্দার মেটানোর সব দায়িত্ব এসে পড়ল সুকান্তের উপর।

এই দায়িত্ব পালন করছেন তিনি হাসি মুখেই।

সুকান্তের বাবা একদিন সুকান্ত ও তাঁর ছোট ভাইকে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর মামার বাড়ী।

বসে উঠলেন ওঁরা। কণ্ডাক্টর এগিয়ে এসে বলল, টিকিট। নিবারণবাবু একটা টিকিট নিলেন।

কণ্ডাক্টর শিশু দুটির দিকে অঙ্গুল তুলে বলল, একটি শিশুর ভাড়া লাগবে।

নিবারণবাবু আর টিকিট কাটতে রাজী নন। তিনি সুকান্তের দিকে আঙুল তুলে বললেন, মনে করোনা কেন আমার ঐ ছেলেটির অন্য একজন যাত্রীর সঙ্গে যাচ্ছে।

সে সময় আইন ছিল একজন যাত্রী একাধিক শিশু বিনা ভাড়ায় বাসে নিয়ে যেতে পারবেন না।

কণ্ডাক্টর আর কিছু বললে না।

কিন্তু সুকান্ত? সাত-আট বছরের বালক সুকান্তের আত্মসম্মানে বড় লাগল ব্যাপারটা। তাঁর মনে ঝড় বইছে। সেই ঝড় সাইক্লোনে রূপ পেল পরের ষ্টেজে

এসে। বাস থামা মাত্রই সুকান্ত বাস থেকে নেমে হন্ হন্ করে উলটো দিকে হাঁটতে শুরু করে দিলেন। যাবে না তিনি।

মায়ের শোক খানিকটা স্তিমিত হয়ে এল সহপাঠী অরুণাচল বসুর মা সরলা দেবীর সান্নিধ্যে এসে। ঐখানেই সুকান্ত পেলের তাঁর হারানো মাকে। সুকান্ত সরলা দেবীকে মুখে কিছু না বললেও যখন চিঠি লিখতেন তখন মা বলেই সম্বোধন করতেন। আর সরলা দেবী তাঁকে বলতেন 'সাজানো চাচা'—অর্থাৎ—'সৎবাবা'।

কোলকাতায় সাইরেন বেজে উঠলো কিছুদিন পরেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মৃত্যু-ভয়ে ভীত কোলকাতা নগরী। বোমার আতঙ্কে কোলকাতা ছেরে পালাচ্ছে সবাই। সরলা দেবীও তার ছেলে অরুণাচলকে নিয়ে যশোহর জিলার নিভৃত পল্লীতে পালিয়ে এলেন। সুকান্ত চিঠি লিখলেন ওদের, "এই ধ্বংসলীলার পরে পৃথিবীতে আবার বসন্ত আসবে, গাছে ফুল ফুটবে, শুধু তখন থাকবো না আমি ও থাকবে না আমার ক্ষীণতম পরিচয়। তবু জীবন দিয়ে এক নতুনকে শাবক করে গেলাম। এই আমার আজকের সান্ত্বনা।"

সরলা দেবী ফিরে এলেন কোলকাতায়! আসার সময় অরুণাচলের কাছ হতে সুকান্তের ঠিকানাটি আনতে এবার ভুল করলেন না তিনি।

সুকান্তের তখন আবার হরমোহন ঘোষ লেনের বাড়ীতেই ফিরে এসেছেন।

সরলা দেবীও কোলকাতায় ফিরে এসেছেন। তার স্কুল তখন উঠে গেছে অবিনাশ শাসমল লেনে। স্কুলের সময়টুকু ছাড়া অন্য সময়গুলো তার কাছে বড় বেশী বোঝা বলে মনে হত। ছেলেমেয়ে সকলকে বাড়ীতে রেখে এসেছেন—একা একা সময় আর কাটতে চায় না। তিনি ডেকে পাঠালেন সুকান্তকে!

সুকান্ত প্রায়ই আসতেন সরলা দেবীর কাছে। তিনি যে বড় নিঃসঙ্গ। এক মাস তিনদিন স্কুলে বাড়ীতে সরলা দেবী ছিলেন এই সময়েই তিনি সুকান্তকে একান্ত করে কাছে পেয়েছিলেন।

সুকান্ত বাংলাদেশে পল্লীগ্রাম দেখেন নি বাংলার পল্লীর সৌন্দর্য রস পান করার সৌভাগ্য তার জোটে নি। তেমনি সরলা দেবীর কাছ হতে শুনতেন বাংলার পল্লী সৌন্দর্যের কথা, শুনতেন যশোহর খুলনা, পাবনার কথা। সুকান্ত বাংলার

পল্লীগ্রাম না দেখে থাকলেও বিহারের পল্লী গ্রাম দেখছিলেন। তিনি বিহারের পল্লীগ্রামেরই কথা বলতেন। কখন সুকান্ত বক্তা। সরলা দেবী শ্রোতা। আবার কখনও সরলা দেবী বক্তা, আর তখন আগ্রাসী ক্ষুদা নিয়ে শ্রোতার ভূমিকায় দাঁড়াতেন সুকান্ত নিজে।

সুকান্ত সরলা দেবীর লেখা 'ছটি ফাল্গুন সন্ধ্যা, গল্প পড়লেন। প্রশংসাও করলেন উচ্ছ্বসিত হয়ে। তারপর তাকে পড়তে দিলেন সুকান্ত নিজের লেখা 'প্রাত্যহিক' আর মধুমালতী' গল্প। মধুমালতী একখানা মলিন কাগজে লেখা।

বুঝতে পারলেন সরলা দেবী লেখার কাগজেরও অভাব রয়েছে সুকান্তর। সরলা দেবী মধুমালতী সম্পর্কে লিখেছেন, "মধুমালতীকে গল্প বলা চলে না। ছাড়বাক্য বলতে হয়। আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমার ফাল্গুন সন্ধ্যার প্রতিরূপ দেখে। মধু যখন বানের জলে ভেসে যাচ্ছে মালতী তখন ব্যাকুল হয়ে মধুকে ডাকছে মধু স্রোতে ভেসে চলেছে। সেখানে গল্পটি নামের সার্থকতায় পূর্ণ মধুময় দেখলাম সুকান্ত মধুচক্র রচনা করতে জানে।'

নয়-দশ বছরের বালক সুকান্ত ছোটদের জন্য মধুচক্র রচনা করলেন ছড়া লিখে।

বাংলা সাহিত্য শিশু উপযোগী ছড়া ও কবিতা লিখেছিলেন কুমার রায়, সুনির্মল বসু, শিশু ও কিশোর মনকে জয় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথও ছড়া নিয়ে পরীক্ষা খুব কম চালান নি কিন্তু যুগ তো একটি ঠায়ে দাঁড়িয়ে থাকেনি আজকের শিশু মনের হাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে তাই আধুনিক করিয়া সচেষ্ট।

সুকান্তের ছোটদের জন্য লেখা ছড়াগুলো মিটেকড়া নামে সঙ্কলিত মিঠেকড়া আধুনিক-জিজ্ঞাসা শিশু মনে সঞ্চারিত করে দিতে পারে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় মিঠে কড়া সম্পর্কে লিখেছেন :

বুড়োরা অবাক হয় সুকান্তের কবিতা পড়ে। আদিকালের বদ্যিবুড়ির ছড়া নয় একেবারে টাটকা হাতে গরম ছড়া। হাসতে হাসতে হঠাৎ হাত মুঠো হয়ে যাবে চোখ দুটো জ্বলে উঠবে লাল টকটকে সূর্য ওঠার দিনের কথা ভেবে। এমন ছড়া বাংলাদেশে আর কেউ লেখেনি।"

......কোলকাতার রাস্তায় বিষয় এক মেলা। বন্দুকের সঙ্গে শুধু হাতে লড়াই। আশ্চর্য এমন সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড—তার মধ্যে মজা পেয়েছে সুকান্ত। গোটা

বইতে এমনি করে মিঠে রস ভেজানো কড়াপাকের ছড়া! সুকান্ত নিজে তাই তার বইয়ের নাম দিয়ে ছিলেন—'মিঠে কড়া।'

সুকান্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল ছোট বেলা হ'তেই রাণী দিদির কোলে কোলে যখন ঘুরতেন সুকান্ত তখনই তো তিনি রাণীদিদির মুখ থেকে আবৃত্তি শুনাতেন রবীন্দ্রনাথের। ফলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুকান্তের জন্মেছিল একন্তে অনুরাগ।

রবীন্দ্রনাথকে স্বচক্ষে পেলেন কবি সুকান্ত মহাজাতি সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের জন্যে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। কবির শিশুমন তাকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে। তিনি পিতার সঙ্গে মহাজাতি সদনে এলেন নির্দিষ্ট অনেক আগেই! অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন, তার ধ্যান ও স্বপ্নের ধনটির আগমনের অপেক্ষায়। দীর্ঘ প্রতীক্ষা। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ এলেন। মহাজাতি সদনে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হল। ভাষণ দিলেন রবীন্দ্রনাথ। সুকান্তের পিতা সুকান্তকে দেখালেন কবিকে। সুকান্ত দেখলেন তাকে। বালক কবি চিরকিশোর কবির রূপে মুগ্ধ হয়ে পড়লেন।

নয় বছর বয়সেই সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনর্গল আবৃত্তি করে যেতেন। আড়াল থেকে তার আবৃত্তি শুনে অনেকেই ভাবতেন এ রবীন্দ্রনাথেরই আবৃত্তি। হস্তাক্ষরটিও তিনি রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেই তৈরী করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি তার এই অনুরাগ রবীন্দ্র অনুসরণে তাকে নিয়োজিত করেছিল। তাই ছড়ায় তিনি লিখলেন রবীন্দ্রনাথের জীবন কাহিনী। বিশ্ব কবির এ জীবন কাহিনী দুর্লভ মনোহর—

এক যে ছিল আপন ভোলা কিশোর,
ইস্কুল যার ভাল লাগত না,
সহ্য হত না পড় শুনার ঝামেলা।
আমাদের চলিত লেখাপড়া সে শিখল না কোনকালেই।
অথচ সে ছাড়িয়ে গেল সারা দেশের সবটুকু পাণ্ডিত্যকে।
কেমন করে? সে প্রশ্ন আমাকে করো না।

[এক যে ছিল]

কিশোর মনকে তিনি টেনে আনলেন সমস্যা আর সংকটের মধ্যে। কিশোর মন হল আন্দোলিত। জগতের সমস্যা আর সংকট থেকে।

কিশোর মন যে থাকতে পারে না এ কথা সুকান্ত উপলব্ধি করেছিলেন। আর তা-ই তিনি তার উপলব্ধি-জাত সত্যতে প্রকাশ করলেন বিভিন্ন ছড়ার মাধ্যমে।

ভেজাল দেওয়া আমাদের যে একটি মজ্জাগত ব্যাধি, সেই ব্যাধি কে তুলে ধরলেন 'ভেজাল' কবিতায়। শিশুর খাদ্যে এমন কি ঔষধে পর্যন্ত, ভেজালের প্রকোপটিকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন—

ভেজাল, ভেজাল ভেজালের ভাই, ভেজলে সারা দেশটায়
ভেজাল ছাড়া খাঁটি জিনিষ মিলবে নাকো চেষ্টায়।

খাদ্যাভাবের দিন অপচয় আর বিলাস দেখে সুকান্তের মন বেদনায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। সমাজের মুখোসধারীদের মুখোসটাকে খুলে ফেলার চেষ্টা করলেন তিনি 'বিয়ে বাড়ির মজা' কবিতায়—

আসুন, আসুন—বসুন সবাই, আজকে হলাম ধন্য,
যৎসামান্য এই আয়োজন আপনাদেরই জন্য;
মাংস, পোলাও, চপ-কাটলেট, লুচি এবং মিষ্টি।
খাবার সময় এদের প্রতি দেবেন একটু দৃষ্টি।

এর পরেই সুকান্তের 'বিয়ে বাড়ির মজা ছড়ার সুর পরিবর্তন হয়েছে অসামাজিক চিত্র আঁকলেন তিনি। দেশে যখন দুর্ভিক্ষ, যখন খাদ্যাভাব তখন ধনী বিলাসিদের ঘরে অপচয়ের অন্ত নেই; আর তারই দুয়ারে দুর্গতদের দল দাঁড়িয়ে রয়েছে যদি বিড়ালের ভাগ্যে শিকেটা ছিঁড়ে পড়ে এই আশায়।

বললে পুলিশ: এই কি কর্তা ক্ষুদ্র আয়োজন?
পঞ্চাশ জন কোথায়? এই যে দেখছি হাজার জন।
এমনি করে চাল নষ্ট দুর্ভিক্ষের কালে?
থানায় চলো, কাজ কি এখন এইখানে গোলমালে।
কর্তা হলেন কাঁদো কাঁদো, চোখেতে জল আসে,
গেটের পাশে জড়ো হওয়া কাঙালীরা হাসে॥

চিরন্তন সংগ্রামের কাহিনী সুকান্ত শোনালেন একালের ছেলেমেয়েদের ছড়ার মাধ্যমে। পুরোনো ধাঁধাতে তিনি লিখলেন কিশোর কবির মনে সঞ্চিত হয়ে ওঠা হাজারো প্রশ্নের কথা :

বলতে পারো বড় মানুষ মোটর কেন চড়বে ?
গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে ?
বড় মানুষ ভোজের পাতে ফেলে লুচি মিষ্টি,
গরীবরা পায় খোলমকুচি, একি অনাসৃষ্টি ?
বলতে পারো ধনীর বাড়ী তৈরী যারা করছে,
কুঁড়েঘরেই তারা কেন মাছির মতো মরছে ?

এই-ই তো চিরন্তন সত্য রূপ। এই-ই তো আমাদের সমাজ ব্যবস্থার ফল।

দেশ-প্রেম ও স্বাধীনতার কথাও সুকান্ত আমাদের শুনিয়েছেন, শুনিয়েছেন এ যুগের কিশোর কিশোরীকে—

আজকে যখন স্বাধীন হবার শেষ লড়াইয়ের ডঙ্কা,
উঠেছে বেজে, কোনদিনই নেইকো কোন শঙ্কা ;

* * *

নানা সাহেব, তাতিয়া টোপ, ঝাঁন্সীর রাণী লক্ষী,
এদের নামে দৃপ্ত কিশোর খুলবে তোমার চোখ কি ?

পরাধীন ভারতবর্ষের কিশোর-কিশোরীর কাছে তিনি আবেদন জানালেন 'আজব লড়াই'-এর মাধ্যমে।

ডাংগুলির খেলা নয় গুলির খেলা,
রক্ত রাঙানো পথে দুপাশে ছেলের মেলা ;
দুর্দম খেলা চলে, নিষেধ কে কান দেয় ?
ও-বাড়ি ও পাড়ার কালো, ছোট প্রাণ দেয়।

স্বাধীনতার জন্য দীপ্ত হয়ে জেগে উঠতে আহ্বান জানালেন কবি সুকান্ত—

পরের বারেতে ভাই শুনব না কারো মানা,
দেবই, দেবই আমি নিজে জীবনখানা।

সুকান্তের এ ছড়া তো যথার্থ-ই আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ির ছড়া নয়, একেবারে এ কালের টাটকা হাতে গরম ছড়া।

বাল্যকাল থেকেই সুকান্ত ছিলেন আপন ভোলা।

একটা ধুতি আর নীল রঙের সার্ট পরে সুকান্ত যখন মানিকতলা মেন রোড অথবা বেলেঘাটা মেন রোড ধরে রাস্তার ধার ঘেঁষে আপন মনে হেঁটে চলতেন তখনও মনে হত তিনি যে বিশেষ চিন্তামগ্ন। সারা বিশ্বের চিন্তার বোঝাটা যেন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তারই মাথার উপর। আর তিনি পথ চলেছেন চিন্তার জটগুলো খুলতে।

অচেনা অজানা, অপরিচিতির সুদূরের আহ্বান তিনি শুনেছিলেন তাই অনিদেশের পথে পাড়ি দিতে চেয়ে তিনি পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন পরিচিত সংসার হতে বাইরে।

একদিন সত্যই তিনি পালাবার সব বন্দোবস্ত পাকা করে ফেললেন না বাড়ীতে আর নয়, পরিচিতি জনের কাছে থেকে অনেক দূরে চলে যাবেন তিনি।

তখন ছাত্র-বৃত্তি পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছেন।

পাড়ার আর একটি ছেলে তাঁর সঙ্গে জুটে গেল। রবীন ঘোষ সুকান্তের সঙ্গে যাবেনই। কোন কথা শুনতে চান না। প্রথমে সুকান্ত বোঝালেন তারপর ভয় দেখালেন। কিন্তু রবীন যেন চোরা না শোনা ধর্মের কাহিনী।

রবীন আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে বাবার ক্যাশবাক্স হতে কিছু টাকা সরিয়ে নিলেন তারপর সুকান্তের পিছু নিলেন।

সুকান্ত প্রমাদ গণলেন। আর রবীনকে এড়ানো চলে না। অগত্য সঙ্গে তাকে নিতে হল!

একজন চান অজানাকে জানতে, অচেনাকে চিনতে, পরিচিত হতে চান ভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে, আর অন্যতম শুধুমাত্র বাবার শাসনে গতির বাইরে গিয়ে কয়েক দিনের জন্য হাঁফ ছাড়তে চান।

যথা সময়ে ওঁরা হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

দূর পাল্লার গাড়ী করে তাদের যাত্রা শুরু।

স্বকান্ত তখন অজানা দেশে, অচেনা মানুষের সঙ্গে একাত্মবোধের কল্পনার স্বপ্ন রচনায় ব্যস্ত, শহরে বালক স্বকান্ত চোখ দুটো তখন রেল কম্পার্টমেণ্টের জানালার ফ্রেম ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। গাড়ীর গতির সঙ্গে তাল রেখে স্বকান্তের দ্রুত গতিতে চোখ বুলিয়ে চলেছেন প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপর।

দূরে দেখতে পেলে তিনি রাখাল ছেলেদের। "সূর্য যখম লাল টুকটুকে হয়ে দেখা দেয়, ভোরবেলায় যখন সূর্য ডুবে যায়, বনের পিছনে তখন দেখা যায় ফেরার খেপ। একই পথে তার নিত্য যাওয়া আসা।"

অনাহারে অর্ধহার জীর্ণ রাখাল বালক আর তাদের শীর্ণকায় গরুগুলি দেখতে দেখতে কবির মন যেন উধাও হয়ে গিয়েছিল।

একগাড়ী ছেড়ে স্বকান্ত তার সঙ্গীকে নিয়ে আর এক গাড়ীতে উঠে বসেছেন। গাড়ী বদলের খেলায় তখন তারা মত্ত। তারা ঠিক করলেন আসনসোলে স্টেশনে রাতটা কোনরকমে কাটিয়ে আবার আর একখানা গাড়ী ধরবেন। হাজির হবেন আর একটি অচেনা অজানা নূতন জায়গায়।

কিন্তু বিধি বাম। অগ্রহায়ণ মাসের দারুণ শীত, সঙ্গে পোষাক-আশাকও তেমন নেই তার পুলিশের লাঠির গুঁতানি। ঠক্ ঠক্ করে দারুণ শীতে কাঁপছেন স্বকান্তর, কাঁপছেন সঙ্গীটিও।

না, প্লাটফর্মের উপর, থাকা চলবে না।

ভাগো হিঁয়াসে।

অগত্যা দু'জনকে ছাড়তে হল প্লাটফর্মের উপর পড়ে থাকা পোস্টাল ডিপার্টমেণ্টের বড় ব্যাঙ্কের আস্তানাটুকু।

রাত তখন দুটো?

বাইরে এসে মহা বিপদে পড়লেন স্বকান্ত। একে তো শীত তার উপর পুলিশের ভয়ে সঙ্গী রবীনের একেবারে আত্মারাম খাচা ছাড়া জুড়ে দিল কান্না।

বাড়ী ফিরে চল ভাই স্বকান্ত আর যাব না।

রবীন কাঁদছে তো কাঁদছেই। পুলিশের ভয় রয়েছে, স্বকান্তও কাঁদছে। বাধ্য হয়ে নিজের সামান্য জামাটা খুলে রবীনকে দিলেন। তার নিজের না হলেও চলবে। ঐ শীতটুকু সহ্য করবার মতো মানসিক বল তার আছে।

অন্ধকার কেটে ভোর হয়ে এল অবশেষে। সূর্যের আলো আর তাপ পেয়ে রবীন একটুকু ধাতস্থ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু নিজের বায়না তিনি ভোলেন নি।

চল এবার ফেরার ব্যবস্থা কর আর নয়, খুব হয়েছে।

সুকান্ত প্রথমটা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মিষ্টি কথার সান্ত্বনায় বাণীতে ভোলার ছেলে নয় রবীন। আসলে রবীন তো বাবার শাসনের বাইরের কয়েকটা দিন কাটাতে চেয়েছিলেন মাত্র।

আজই ফিরতে হবে, কোন কথা শুনতে চাই না।

অতএব বাড়ী ফিরতে হবে। তা ছাড়া পকেটের যা অবস্থা একেবারে ছুচোয় ডন মারছে। সুতরাং না ফিরে আর উপায়ই বা কী ?

অবশেষে ফেরার গাড়ী ধার শুধুমাত্র জল খেয়ে ওঁরা বাড়ী ফিরলেন। হাওড়া স্টেশনে পা দিয়ে রবীনের দেহে প্রাণ ফিরে এল। আর কোন কথা নয় সুকান্তের সঙ্গে একেবারে সোজা হাওড়া স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেন। কিন্তু সুকান্ত ?

মহা ফাঁপরে তিনি। বাড়ীর সবাই, বন্ধু-বান্ধব—সবাই জানে তিনি বাড়ী থেকে পালিয়ে গেছেন, সুতরাং কি ভাব তিনি সমস্যার সমাধান করবেন ?

মনে পরল তার অরুণাচলকে।

সুকান্ত তাই স্টেশন থেকে সোজা অরুণাচলদের বাড়ী এসেই উঠলেন।

বেলা তখন দুটো আরাইটা।

অরুণাচল অবাক সুকান্তকে দেখে।

কি রে কী ব্যাপার ?

বলছি, একটু ধাতস্থ হয়ে নিই।

সুকান্তের মুখ দেখেই অরুণাচল বুঝতে পেরেছিলেন যে সুকান্তের পেটে বেশ কয়েকদিন কিছু পড়েনি। আর সুকান্ত যা ছেলে নিজের অসুবিধার কথা মুখ ফুট তো কাউকে কোনদিন বলতে শেখেন নি।

অরুণাচলদের মধ্যাহ্নভোজন তখন শেষ হয়ে গেছে! সুতরাং ভাত সুকান্তকে খেতে দেওয়া অসম্ভব। অতএব বিকল্প ব্যবস্থা।

চিঁড়ে দই ফলার করিয়ে সুকান্তের আহারের ব্যবস্থা করে দিলেন অরুণাচল।

এবারে দুই বন্ধুর চলতে লাগল শলাপরামর্শ। বাড়ীতে একটা কিন্তু কৈফিয়ৎ দিতে হবে। আর কৈফিয়ৎ না দিলে ওরা শুনবেনই বা কেন?

আমি কিছু ভাবতে পারি না ভাই অরুণ। তুই একটা যা কিছু হোক মতলব বের করে দে।

অরুণাচল ভাবলেন অনেক কিছুই। কিন্তু কোনটাই যেন লাগসই মনঃপুত হচ্ছে না।

তুই বলবি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলি!

অরুণাচলের প্ল্যানটা ভাল লেগেছিল সুকান্তের। কিন্তু একা যেতে রাজী নন। সুতরাং অরুণাচলকে সঙ্গে যেতে হল। যাই হোক না একজন মধ্যস্থ ব্যক্তি থাকলে ঝক্কি পোয়ানো সহজ। তাই অরুণাচলকে সঙ্গে যেতে হল।

ওরা দু'জন ভয়ে সুকান্তদের বাড়ী এলেন।

সুকান্তর দাদা সুশীল ভট্টাচার্য অসুস্থ। তিনি পায়ের সেপটিকের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন। ডাক্তার এসেছে। এসেছেন আরও অনেকে।

বাড়ী ঢুকেই সুকান্ত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। নিজেকে দোষী ভাবছেন এই সব কিছুর জন্যেই।

চুপচাপ রয়েছেন সবাই! সবাই যেন নিঃশব্দে প্রহর গুণছেন ফেটে পড়ায় অপেক্ষায়। অসহ্য এই নীরবতা।

অরুণই প্রথম কথা বললেন, সুকান্ত শান্তিনিকেতনে গিয়েছিল। আসলে সুকান্তের কবি মনকে বিশ্বকবি টেনেছিলেন। তাই ওর শান্তিনিকেতন যাওয়া।

বাড়ীর সকলে তো জানেন সুকান্ত কবি। অতএব এ আর বেশী কথা কি একজন কবি তো আর একজন সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য উন্মুক্ত হয়ে উঠবেনই। এ তো খুব স্বাভাবিক।

সমস্যা মিটে গেল খুব সহজেই। দুই বন্ধুর আহ্লাদ আর দেখে কে?

উনিশ শ' একচল্লিশ সালের কথা।

সুকান্ত সুযোগ পেলো রেডিওতে!

গল্পদাদুর আসরে প্রথম হলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করলেন।

সেই রেডিও গল্পদাদুর আসরে সভ্য হলেন তিনি। রবীন্দ্রাথের তিরোধানের প্রথম বার্ষিকীতে তিনি যে কবিতা লিখলেন সেই কবিতা তিনি আবৃত্তি করলেন রেডিওতে—

আবার ফিরে এল বাইশে শ্রাবণ
আজ বর্ষা শেষ হে অতীত
কোন সম্ভাসণ
জনাব অলক্ষ্য পানে,
আজ মৃতের গন্ধে ব্যথিত জনতা।
কহিছে নিঃশব্দ সুরে একমাত্র কথা
"তুমি যেথা নাই"
বিস্ময়ে অন্ধকারের মধ্যমান জলস্থল তাই
আধো তন্দ্রা, আধো জাগরণে
দক্ষিণে হাওয়ার ক্ষণে
ফেলেছি নিঃশ্বাস।

শিশুকাল হতে রাণীদির কণ্ঠে রবীন্দ্রথের কবিতা আবৃত্তি শুনে শুনে রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুকান্তের শ্রদ্ধা জেগেছিল। তার স্থান দিয়েছিলেন তারই অন্তরের অন্তঃস্থলে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান পাঠে, শ্রবণে সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার রচনাবলীর সঙ্গে জন্ম নেই হৃদ্যতা।

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে সুকান্ত লিখতেন : -

এবারে নতুন রূপে দেখা দিক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে কণ্ঠে
গণ সংগীতের স্বর,
জনতার পাশ পাশে
উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে হাতে
চলুক নিন্দাকে ঠেলে,

গ্লানি মুছে আঘাতে আঘাতে
যদিও সে অনাগত, তবু যেন
শুনি তার ডাক
আমাদেরই মাঝে তাকে
জন্ম দাও পঁচিশে বৈশাখ।

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্র প্রশস্তি তো অনেকেই গেয়েছেন। কিন্তু সুকান্তের সুর তো ভিন্ন জাতের ভিন্ন স্বাদের। বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে, কণ্ঠে গণ সংগীতের সুর, জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল পতাকা হাতে নিয়ে নিন্দাকে ঠেলে ফেলে, আঘাতে আঘাতে গ্লানি মুছে ফেলে রবীন্দ্রনাথের নূতন ভাবে জন্মের প্রয়োজনীয়তাকে এমন বলিষ্ঠ ভাবে আর কয়জন কবি উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করতে পেরেছেন ?

যখন সময়ের গাঁটগুলো পেরিয়ে তিনি পরিণত বয়সে পৌঁছালেন শিশু থেকে বালকে পৌঁছানোর ছাড়-পত্রখানি যখন তিনি পেলেন তখনই দেখা গেল সুকান্ত পাড়ার সম-বয়স্কদের জুটিয়ে নিয়েছেন বালক মনের ক্ষুধার নিবৃত্তি জন্য।

ঠিক করলেন পাড়ার এই ছেলেদের নিয়ে তিনি ডাকঘর নাটক মঞ্চস্থ করবেন না না, কোন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নয়, রান্নাঘরের বারান্দায় রঙিন কাপড় টানিয়ে নতুন মঞ্চ তৈরী করলেন। নিজে অমলের ভূমিকা নিলেন। তারপর অভিনয়ের সে কি কুশলতা যা শুনলে এবং দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

রবীন্দ্র-শিষ্য সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলি অনুসরণ করে লিখলেন অভিমান নামক গীতিনাট্য। রূপকথার ফ্রেমে বাঁধা রইলেও সেখানে শুধুমাত্র মাথা ঠুকে মরে নি ! বরং রূপকথার অন্তরালে ধরা পড়েছে পঞ্চাশের মনন্তরের কথা তেরশ' পঞ্চাশের বাংলা দেশ দুর্ভিক্ষে প্রচণ্ড দাপটে বাংলা মায়ের যে দুঃসহ যন্ত্রণায় মৃত্যু ব্যাধির প্রকোপে কঙ্কালসার বাঙ্গালীর যে চিত্র সেই চিত্রই তো পরিস্ফুট হয়েছে, এই গীতিনাট্যে।

দুর্ভিক্ষের কবলে কবলিত সংকলিতার দেশ। জনগণ ক্ষুধার তাড়নায় নিপীড়িত। মৃত্যু সুযোগ বুঝে তার প্রচণ্ড দাপট চালাল সাধারণ মানুষের উপর। দুর্দশাগ্রস্থ, অনাহারক্লিষ্ট মানুষ আজ বড় অসহায়।

সংকলিতাও নিঃস্ব, কিন্তু অন্তরে সে পরিপূর্ণা। সে ঠিক করলো নিজেই দুর্দশা-পীড়িত জনগণের দুর্দশা মোচনের, ক্ষুধার্ত জনগণের মুখে আহার্য তুলে দেওয়ার দায়িত্ব নেবে।

পার্শ্ববর্তী রাজ্যে হাজির হল সংকলিতা। দেশের কিশোরকিশোরীরা সংকলিতার সঙ্গে একমত। সুতরাং ওরাও জুটেছে সংকলিতার সংগে।

সংকলিতা এই ছেলের দল নিয়ে একদিন উপস্থিত হলো দেশের রাজার কাছে। কণ্ঠে তার মিনতি সুরে তার মধুঝরা আবেদন—

আমার দেশেতে আজ মরে লোক অনাহারে
এসেছি তাদের তরে মহামানবের দ্বারে
লাখে লাখে তারা আজ পথের দুধার থেকে
মৃত্যু দলিত শবে পথকে ফেলেছে ঢেকে,
চাষী ভুলে গেছে চাষ, মা তার ভুলেছে স্নেহ,
কুটিরে কুটিরে জমে গলিত মৃতের দেহ।
উজার নগর গ্রামে জ্বলে না বাতি,
হাজার শিশুরা মরে দেশের আগামী জাতি।
রোগের প্রাসাদ ওঠে প্রতিটি ঘরে।
মানুষ ক্ষুধিত আর শেয়ালে উদর ভরে।
এখনো রয়েছে কোটি মনণের পথ চেয়ে।
তাই তো ভিক্ষা মাগি এদেশে গান গেয়ে ॥

রাজদূত এসে মহারাজকে জানালেন,
প্রজারা সহসা ক্ষিপ্ত হয়েছে যে মহারাজ,
রাজপ্রসাদের পাশে ভিড় করে আজ।

মহারাজ সংকলিতাকে ডেকে পাঠালেন জানতে চাইলেন উপায়।

বল মেয়ে তোদের আমি শান্ত করি কি দিয়ে।

সংকলিতা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন।

ধনাগার আজ তাদের হাতে এখুনি দাও ফিরিয়ে।

মহারাজ সম্মত। সংকলিতা নিশ্চিন্ত। কিন্তু কুবুদ্ধি দেওয়ার লোকেরও তো আর অভাব নেই। কুবের শেঠ মহারাজকে নিরস্ত করলেন। বোঝালেন, দেশে

দুর্ভিক্ষ নেই ! প্রজারা ছলনায় মায়ার রাজ ধনাগার শূন্য করার মতলব ফেঁদেছে মাত্র। আর দুর্ভিক্ষ যদি হয়েও থাকে এর জন্য দায়ী চাষীরা। ওরাই ইচ্ছে করে ফসল ফলায় নি। সুতরাং দুর্ভিক্ষ তাদের ইচ্ছাকৃত সৃষ্ট পরিকল্পনা। মহারাজ কুবেরের কথায় বিশ্বাস করলেন। কুবের শেঠের ওপর তাঁর অগাধ আস্থা। তার হাতেই তিনি তুলে দিলেন ক্ষুধিত জনগণের রক্ষায় দায় আর দায়িত্ব ! স্বার্থান্বেষী কুবের শেঠ উৎফুল্ল অভীষ্ট সিদ্ধির শেষে মহারাজের জয়গানে তার কণ্ঠ উদ্বেল।

মহারাজের এই নির্বুদ্ধিতায় ব্যথা পেল ইন্দ্রসেন। ন্যায়পরায়ণ পরহিতাকাঙ্ক্ষী ইন্দ্রসেন কোতোয়ালকে সে বলল,

বাঘের ওপর দেওয়া হল ছাগ-পালনের ভার,
কোতোয়াল হে তোমার ব্যাপার চমৎকার !

ইন্দ্রসেনের ঔদ্ধত্য সহ্য করতে পারে না কোতোয়াল। তাই গর্দান যাবে বলে তাকে যখন সে শাসালো তখন সংকলিতা জানাল ছেলের দলের কাছে বীরত্ব জাহির করা সহজ কিন্তু বীরত্ব প্রকাশ পায় না এতে। বীরত্ব প্রকাশ করতে হয় যোগ্য ব্যক্তির কাছে।

কোতোয়াল দায়ী করল সংকলিতাকে কারণ হিসাবে। কারণ সংকলিতার কথাগুলো আর ভাল লাগেনি। আসলে কোতোয়াল চেয়েছিল নিজের দোষ কাঁধ থেকে নামাতে।

কিন্তু উচিৎ বক্তা সত্যকাম জানাল, সংকলিতা যখন এদেশে এসেছিল তখন তো দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ছিল না। চাষীর হাড়ভাঙ্গা খাটুনির সোনার ফসল কোতোয়াল জোর করে নিয়ে গিয়ে রাজকোষে সঞ্চিত করে রেখেছে বলেই তো দেশ জুড়ে এমন দুর্ভিক্ষ।

কোতোয়াল এবার ভিন্ন পথে ধরল। সে জানাল সংকলিতা জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। তাই দেশের লোক কোতোয়ালের আদেশ অমান্য করার স্পর্ধা দেখায়।

সংকলিতা উত্তর দেয়—দেশের তরুন সম্প্রদায় তো চিরকালের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম চালায়—

দরিদ্রের রক্ত করে শোষণ
বিরাট অহংকার করে পোষণ
তুমি পশু, পাষণ্ড বর্বর
অত্যাচারী, তোমার হাত কাঁপে না থর থর্।

কোতোয়ালের আর সহ্য হয় না। তাকে পশু বর্বর বলার অধিকার সংকলি তাকে কে দিল।

আমাকে বলিস্ পশু বর্বর
ওরে দুর্মতি তুই তবে মর!

কোতোয়ালের ভাষায় দুর্মতি সংকলিতা প্রাণ হারাল তারই তীক্ষ্ণ কৃপাণের আঘাতে।

সংকলিতার মৃত্যু প্রজা সাধারণের বুকে জ্বালাল আগুন। ওরা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ক্ষমা নেই কোতোয়ালের, ক্ষমা করা যায় না তাকে। কোতোয়াল জনসাধারণের আদালতে ধরা পড়ল।

সুকান্ত পরোপকারী।

মানুষকে ভালবাসতে হবে, এই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য! মানুষকে ভালবাসতে গিয়ে তুচ্ছ সংসারের বশবর্তী হয়ে পড়েননি তিনি কোনোদিনই। এ যে তাঁর জন্ম সূত্রে পাওয়া, পরের দ্বারস্থ তো তাঁকে হতে হয় নি এর জন্য কোনদিনই।

সুকান্ত একবার তাঁর কয়েকজন বন্ধু নিয়ে একটি কোচিং খোলার ব্যবস্থা করলেন। গরীব ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বিনা মাহিনায় এখানে পড়বে। সব ব্যবস্থা একেবারে পাকা হয়ে গেল। বাড়ীর পেছনের দিকের বড় বারান্দায় তাদের কোচিং ক্লাশ।

শুভদিনে শুভলগ্নে শুরু হয় ক্লাশ। কয়েকজন ছাত্রও জুটে গেল। দুপুর বেলা ক্লাশ বসতো পড়াশুনার চেয়ে হট্টগোল এত বেশী হত যে দুপুরের আমেজে ঘুমে যারা ব্যস্ত রইতেন তাদের ঘুম ভেঙ্গে যেত বারবার। বিরক্ত হতেন সকলেই। কিন্তু ওদের সমাজ কল্যাণের প্রচেষ্টায় বাধা হয়ে দাঁড়ানো অযৌক্তিক। তাছাড়া কত দিনই বা আর এই কোচিং ক্লাশের আয়ু? এমনিতেই সব বন্ধ হয়ে যাবে।

হলোও ঠিক তাই। কয়েক সপ্তাহ পরে ছাত্রেরা বাড়ী ফিরে গেল। পাণ্ডিত্য অর্জনের ষোলা কলা পূর্ণ করে ওরা ঘরের ছেলে ঘরেই আশ্রয় নিল।

শিক্ষকদের প্রতীক্ষার কিন্তু শেষ নেই। হয়তো বা শবরীর প্রতীক্ষা। ওরা বসে থাকেন ছাত্র আসার আশায়। কিন্তু ছাত্রেরা আর ওদিকটা মারতে চায় না। সুতরাং কোচিং ক্লাশ বন্ধ হয়ে গেল—আপনা আপনিই।

বেলেঘাটার ষ্টুডেণ্টস লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হবে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম সুকান্ত। সুকান্ত তাঁর সেবা মনোভাবের প্রচেষ্টাটুকু নিয়ে হাজির হলেন। একজন সহৃদয় বন্ধু একটা পাইন কাঠের আলমারী দিলেন সুকান্ত এবং অন্যান্যরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে বই সংগ্রহ করলেন। পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা বাড়াতেই হবে। নিজের বাড়ীর বই দিলেন সুকান্তের নিজের হস্তে প্রতিষ্ঠিত এই বেলেঘাটার ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী আজও সুকান্তের স্মৃতি বয়ে চলেছে। উনিশ শ' একচল্লিশ সালের সাতই আগস্ট রবীন্দ্র প্রয়াণে শোকাচ্ছন্ন সারা বাংলা, শোকাচ্ছন্ন সমগ্র ভারতবর্ষ।

বিশ্বকবির মৃত্যুকে শোকাচ্ছন্ন মানুষ জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এলেন। এলেন কবি সুকান্তও। শোক মিছিল অংশ নিলেন তিনি। একান্ত প্রিয়জনের মৃত্যুতে সুকান্তের মন প্রাণ তখন যেন বিধ্বস্ত। তিনি তার বেদনাতুর মনের পরিচয় দিলেন :—

> যমৃতলৈকের যাত্রী অমর কবি, কোন মহাপ্রস্থানের
> পথে তোমার একাকী অভিযান। প্রতিদিন তাই
> পৃথিবীর বদ্ধ ভিত্তি নিশ্চিহ্ন করতে বিপুল প্রায়াস
> তবে দিনে দিনে হয়েছে বর্ধিত......

কবি সুকানত রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া দেখেছিলেন, একটি অমর শক্তির ক্ষয়ে কবিকণ্ঠ বেদনায় মথিত হয়ে উঠেছিল,—

> চেয়ে দেখি চিতা জ্বলে যায় অসহ্য
> দহনে জ্বলে যায় ধীরে ধীরে প্রত্যেক অন্তর
> তুমি কবি, তুমি শিল্পী, তুমি যে বিরাট, অভিনব

রবীন্দ্রনাথ সকলকে কাঁদিয়ে গেলেন। কাঁদলেন সকলের সাথে সুকান্তও।

রবীন্দ্রনাথকে ভুলতে পারলেন না তিনি কোনদিনই। তাই দেশের সব দুর্দিনেও তিনি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেছেন লিখেছেন—

কখনও আমার মন তোমার উজ্জ্বল পরিস্থিতি,
প্রল্যোক নিভৃতক্ষণে মত্তরা ছড়ায় যথারীতি,
এখনো তোমার গানে সহসা উল্লেখ হয়ে উঠি
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।
মনের গভীর অন্ধকারে তোমার সৃষ্টিরা থাকে জেগে
তবুও ক্ষুধিত দিন ক্রমশঃ সাম্রাজ্য গড়ে তোলে,
গোপনে লাঞ্ছিত হই হানাদারী মৃত্যুর কবলে,
যদিও রক্তাক্ত দিন, তবু দীপ্ত তোমার দৃষ্টিকে
এখনো প্রতিষ্ঠা করি আমার মনের দিকে।

Man is in existence একথা যেমন প্রামাণিক সত্য তেমনি সত্য একুশ বছরের সুকন্‌তের অবাক করা প্রতিভা। কেউ কেউ তাঁকে এ অপবাদ দিয়ে থাকেন যে তার কাব্য রয়েছে শুধুমাত্র পার্টির শ্লোগান, আবার কেউ কেউ বা বলে থাকেন রাজনীতি করতে গিয়ে সুকান্ত কবি হতে পারলেন না। যারা একথা বলেন তাঁরা সুকান্তের মধ্যে লিম্বিত যথার্থ সত্যটি খুঁজে পান না।

যুগ পরিপ্রেক্ষিতটিকে লক্ষ্য করলেই সুকন্‌তের কাব্য দিনবদলের যথার্থ কারণটিকে আমরা উপলব্ধি করতে পারব। সুকান্ত যে যুগ কবিতা লিখেছিলেন সে যুগে সাম্রাজ্যবাদের পতনের যুগ সাম্রাজ্য বাদের নক্কারজনক রূপ ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ তখন পৃথিবী গ্রাস করার জন্য উন্মুখ। কিন্তু যারা যুগের এই পরিণতটুকুকে বুঝতে পেরেছিলেন তাঁরই উপলব্ধি করেছিলেন যে শ্রমিক কৃষকের এবং প্রগতিশীল মানুষের প্রত্যাঘাতে ফ্যাসিবাদো আক্রমণ চূর্ণবিচূর্ণ হতে বাধ্য তা না হলে ইতিহাস মিথ্যে হয়ে যায়। সুকান্ত বুঝতে পেরেছিলেন দেশে দুর্ভিক্ষ আর কালোবাজার মৃত্যু আর ফ্যাসিবাদ নাৎসীবাদের বিশ্ব আক্রমণ একই গ্রন্থিতে আবদ্ধ।

জমিদারী, তোজদারী, মহাজনী, আড়তদারী—এ সবইত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি। আর এগুলো যখন ফলে ফুলে, পত্রে পুষ্পে পরিপূর্ণ রূপ পেলে তথনই যুদ্ধের সংকট কালে দেশ জুড়ে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। কিন্তু এমন অবস্থা দীর্ঘদিন রইতে পারে না। জমিতে যাদের পা ঠেকে নি তাদের জমিদার বলা বাতুলমাত্র। জনগণকে যারা জোঁকসম শোষণ করে তাকে মহাজন বলা যেতে পারে না। চাষীর হালে জমিকে আনতে হবে। জমিদারী জোদারী মহাজনী প্রথার অবসানের জন্য যে আন্দোলন সেই আন্দোলনই তো গণতান্ত্রিক বিপ্লব। দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতি যুদ্ধের দৌলতে ব্যাঙ্ক ব্যলান্সের অঙ্কটা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে চলল। সুতরাং স্বার্থের কথা ভেবেই এরা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মেলাবে-এ আর বেশী কথা কি সুতরাং দেশের এই সাম্মাজ্যবাদ কে প্রথম হঠাতে হবে, তা না হলে শ্রমিকের উপর শোষণ রোধ করা সম্ভব নয় সুকান্ত ছিলেন এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ভাবে স্বাধীন ভারতের সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারী যোদ্ধা ? বিদেশী অর্থ নৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক শাসনের পতন ঘটাতে সুকান্ত হয়েছিলেন জাতীয় বিপ্লবের সামিল। সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করার জন্য সুকান্ত কমিউনিস্ট হয়েছিলেন।

সুকান্ত বিশ্বাস করতেন, সাম্রাজ্যবাদ সঙ্গে সমাজতন্ত্রের লড়াই এর শান্তি, শ্বাধীনতা একমাত্র লক্ষ্য। তাই সুকান্ত কামনা করেছিলেন শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মৈত্রী। ভারত বিপ্লবের চরিতার্থতার উৎস লেলিন--একথা তিনি যেমন বিশ্বাস করেছিলেন তেমনি তিনি বিশ্বাস করতেন গান্ধীজীর ব্যাপক গণ-আন্দোলন জাতির মুক্তির একমাত্র পথ।

সুকান্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও একনিষ্ঠ ও কর্মী। জ্ঞান উন্মেষের পর হইতে কমিউনিস্ট কার্যকলাপে সঙ্গে ধীরে ধীরে তার পরিচয় ঘটেছিল। কমিউনিস্ট নীতি কার্যকলাপ তার মনের মণিকোঠায় স্থান পেয়েছিল।

শুরু হল তার বেলেঘাটার অফিসে যাতায়াত। এই যাতায়াতের মাধ্যমে তিনি পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেলেন পার্টির অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে। সুকান্তের মনপ্রাণ চায় পার্টির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে। কিন্তু সুযোগ মেলে না।

ষোল বছরের বালক সুকান্তের পক্ষে পার্টির স্বীকৃতি পাওয়া ছিল অত্যন্ত দুরূহ, কিন্তু সুকান্ত ছাড়বেন না তিনি তার বোধের উন্মেসের পূর্ণ জাগরণ চান সুতরাং শুরু হল তর্ক বিতর্ক, বাক্‌বিতণ্ডা। সুকান্তের হারালে চলবে না। তিনি হারতে চান না।

জয়ী হ'লেন অবশেষে। বোঝাতে সমর্থ হলেন পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের যুক্তির মাধ্যমে। সুতরাং স্বীকৃতি পেলেন সুকান্ত কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে কাজ করায়। সুকান্ত নিজেকে ভাবলেন ভাগ্যবান।

সুকান্ত তখন স্কুল ছাত্র। বেলেঘাটার দেশবন্ধু হাই স্কুলে পড়ছেন তিনি। সুকান্তের বয়স অল্প হলে কি কি হয় এই অল্প বয়সেই নিয়মিত পার্টির দেওয়া কাজ করতেন, সেই কাজের হিসাব দাখিল করতেন কর্মীদের মতই পার্টির অফিসের হয়ে আবার নিতেন নতুন কাজের দায়িত্ব। দৈনন্দিনের নিয়ম মাফিক কাজ করতে গিয়ে সুকান্ত কখন ও ক্লান্তি বোধ করেন নি, কোনদিনই গরহাজির হন নি।

কনিষ্ঠ এই কর্মীকে পার্টির সবাই খুব ভালবাসতেন ভালবাসার পাত্র সুকান্তকে তাই জ্যেষ্ঠকর্মীরা কার্যপদ্ধতির ধারগুলো শেখাতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করতেন না।

সুকান্তের কাজ কখনো বা পার্টি অফিসেই পড়ত কখনও বা তিনি পোষ্টার লিখতেন, আবার কখনো সেই পোষ্টারের বাণ্ডিল বগলদাবা করে ছুটতেন এ-পাড়া থেকে ও পাড়া, এক কারখানা হতে আর এক কা খানা, এ দেওয়াল হতে সে দেওয়াল। পোষ্টার লিখলেই তো শুধু চলবে না সেগুলা সাধারণ মানুষের চোখের সামনে মেলে ধরতে হবে! আবার কখনও বা লেবেল আঁটা কৌটা হাতে বেরিয়ে পড়ছেন অর্থ সংগ্রহ করতে। এসব কাজ করতে গিয়ে কোন দ্বিধা সংকোচের বেড়ী তার পায়ে এসে তার গতিকে শ্লথ করে দিতে পারে নি।

সুকান্ত তে: আসলে হুজুগে মেতে ওঠা ছেলে নন। তিনি তো মনে প্রাণে সাধারণ মানুষের লড়াইয়ে, খেটে খাওয়া মানুষের লড়াইয়ে ফ্যাসিবাদ করেছিলেন। তাই বেলেঘাটা অসিসে কর্মী অভাবটিকে পূরণ করার চেষ্টা সুকান্ত দৌড় ঝাঁপ করে নানা কাজ একাই সম্পূর্ণ করে।

ব্রিটিশ সৈন্যের রসদ যোগাতে গিয়ে ভারতে দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। দুর্ভিক্ষ অবশ্য স্বেচ্ছাকৃত আমদানি। তবু অনহার-

ক্লিষ্ট অসহায় নরনারীর পাশে এসে দাঁড়াল সেদিন কমিউনিস্ট পার্টি। পাড়ায় দল বেঁধে চাঁদা তুলল ওরা ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে। দেখা গেল এ দলের পুরোভাগে রয়েছেন কিশোর সুকান্ত। সেদিন নিজের জন্য বিন্দুমাত্র সুবিধা সুযোগের কৃপাপ্রার্থী হন নি প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সেই সুকান্ত কিন্তু অন্যের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে বার বার ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।

এই সময় সমাজ উন্নয়নমূলক কতকগুলি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল, স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রতিরক্ষা বোধটিকে সজাগ করে তোলে। সুকান্ত এই জনরক্ষা সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি সংগঠন কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সাফল্যলাভ করেছিলেন প্রচুর পরিমাণে।

উনিশ শ' চুয়াল্লিশের কোলকাতা বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে বিধ্বস্ত। জনসাধারণের জীবনযাত্রা ব্যাহত। দিনের বেলায় তবু মানুষ নিজের প্রয়োজনে বের হত, কিন্তু ব্লাক-আউটের রাত্রি নামার আগে বাসায় ফিরে আসত বাধ্য হয়েই। হোক্ না যত অসুবিধা, থাক না হত প্রয়োজন, আলো জ্বালাবার উপায় নেই। অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে আদিম জীবন যাপনে মানুষকে তখন অভ্যস্ত হয়ে পড়তে হয়েছে বাধ্য হয়েই।

কোলকাতার এই ব্ল্যাক আউটের সময় সুকান্তের অগ্রজ সুশীল ভট্টাচার্যের বিয়ের দিন স্থির হয়েছিল। বিয়ে হল! বাড়ীতে নববধুর আগমন ঘটল। সুকান্ত এই নতুন বৌদিকে একটা ছোট কবিতা উপহার দেবেন ঠিক করলেন। লিখলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর উপহারটা যথাস্থানে পৌছে দিতে পারলেন না। হয়তো বা শত লজ্জা আর দ্বিধাই তার মনের ইচ্ছাকে আর পুরণ করতে দেয় নি।

সুকান্ত সেদিন লিখেছিলেন,

এ বছর নিস্প্রদীপ আমাদের
জমেছে উদাস ধুলা অনাবৃত বৎসর বৎসর।
এখানে কখনো কেউ পায়নিকো বসন্তের হাওয়া,
তাইতো ব্যর্থ সহৃদয় চাওয়া আর পাওয়া।
বাঁচার আতঙ্ক স্পষ্ট, দারিদ্র্য অবগুণ্ঠিত

সন্ত্রাস ফুলের গন্ধ, এখানে চাঁদও কুণ্ঠিত
বুভুক্ষায় পিষ্ট আশা, তিরোহিত নিষ্ফল নিশ্বাসও
একটি প্রদীপ এনো এখানে যদি আসো।

সুকান্তের সংসারে এই মোটামুটি চিত্র। শুধু মাত্র দারিদ্র্যেই যে ওদের সংসারটা এই হাল করেছিল একথা সত্য নয়। কারণ সাধারণ ভাবে বাঁচার মত অন্নবস্ত্রের অভাব ওদের একান্নবর্তী পরিবারে কিংবা পরবর্তীকালের ওঁদের ভাই ও বাবার সংসারে ছিল না। তবে অভাব একটি ছিল। এ অভাব একজন সু-গৃহিণীর। অতি শৈশবে মাকে হারিয়ে বেঁচে থাকার সাধারণ রীতিগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার সুযোগ পান নি বা সুকান্তের ভাইয়েরা।

অনেকেই ভাবেন ব্যক্তিগত অভাব অনটন সুকান্তকে জনতার কবিরূপে গড়ে তুলেছে, কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। কাব্য জীবনের প্রতি তার যে অপরিসীম নিষ্ঠা ছিল তা-ই তাকে জনতার কবিতে রূপান্তরিত করেছিল। অরুণাচল বসু লিখেছেন।

শূকান্তে জীবনের আশৈশব ছন্নছাড়া পরিপার্শ্বিকতা সাধারণ জীবনকে বোঝাবার পথ খানিকটা সহজ করে দিয়েছিল। এমন কতৃহীন হাল ছেঁড়া সংসারে বেঁচে থাকতে হয়। জীবন সংগ্রামের যাবতীয় দায়িত্ব নিয়ে সমান তালে চলতে হয় সমাজের অন্যান্য গৃহীদের সঙ্গে এতে অপরের জীবন জানাটা ঘটে যায় স্বাভাবিক ভাবে। তাই নিজের বাল্যকাল ও কৈশোরকে শূকান্ত উপভোগ করতে পারল না কখনো। কিশোর কবি আখ্যা দেওয়াতে তাই ক্ষুব্ধ হ'তো সে রীতিমতো। এ কথা হয়ত সকলেই জানেন, সে কবি-কিশোর হ'লেও কিশোর কখনো ছিল না। এই প্রসঙ্গে তার একেবারে বালক বয়সের কবিতার উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

দুর্বল পৃথিবী কাঁদে জটিল বিকারে'
মৃত্যুহীন ধমনীর জলন্ত প্রলাপ,
অবরুদ্ধ বক্ষে তার উন্মাদ তড়িৎ—
নিত্য দেখে বিভীষিকা পূর্ব অভিশাপ।...ইত্যাদি।

এই পাকা হাতের কবিতা লিখতে লিখতে তাকে কিন্তু হাত পাকাতে হয়নি কখনো। কারণ বাস্তব জীবনে তার বুদ্ধি পাকা করে দিয়েছিল। আর ছিল তার আশ্চর্য সংবেদনশীল হৃদয়। লক্ষ্য করার বিষয় ওপরের কবিতাটিকেও সে ব্যক্তিগত নয়, বৃহত্তর সমাজের কথাই বলেছে। যদিও এ সময়ে কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক সংগঠনের সংস্রব আসিবার সুযোগ পায়নি, কারণ এসব কবিতা লেখা তার তের-চৌদ্দ বছর বয়সের মধ্যে, ইংরেজী ৪০ সালে। প্রশ্ন উঠতে পারে, এমন ভাষা, আঙ্গিক শেখার সে সুযোগ পেল কী করে!—সুকান্ত বাড়ীতে বরাবর থেকেই ছিল একটা সাহিত্যিক আবেষ্টনী। মায়ের স্মৃতি সম্বন্ধে তার কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি তার পড়াশুনা ছিল অসাধারণ অনুরাগ। সাংসারিক কাজের চাপে শেষে পড়াশুনা বন্ধ হলেও দৈনিক ঘর পরিস্কার কাজের করার সময়ে নাকি এটা ওটা কুড়িয়ে পড়তেন তাঁর বাবা প্রাচীন প্রকাশক। অনেক প্রাচীন সাহিত্য সেখান থেকে প্রকাশিত বা বিক্রী হয়েছে। রামায়ণ মহাভারত সে পড়েছিল অতি শৈশবে। এবং মনে রেখেছিল। তাঁর অনেক কবিতাই তার স্বাক্ষর আছে, বিশেষ করে প্রথম বয়সের কবিতায়। তাছাড়া এক-আধটু লেখার শক্তি তার দাদাদের প্রায় সকলেরই আছে! তাঁরা তাকে প্রভাবিত করেন। আধুনিক কবিতা পড়ায় অনুপ্রাণিত করেন তার অন্যতম দাদা মনোজ ভট্টাচার্য। তার কথা তার মুখে অনেক শুনেছি আবার রাজনৈতিক দিক থেকে বা দাদা দাদুর বন্ধুর তাকে প্রভাবিত করেছিলেন।

এই নানা সংস্রবে নানা ঐতিহ্য তার প্রথম জীবনে পুষ্টিলাভ করে পরবর্তী জীবনে সে মার্কসবাদী আন্দোলনের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করে এ তো সকলেই জানেন।

চতুর্দিক হতাশা অন্ধকার দেখেও সুকান্ত কিন্তু মনে প্রাণে অনুভব করতেন এ হতাশা চিরস্থায়ী নয় অন্ধকার দীর্ঘ দিনের নয় কবিপ্রাণ করত, নতুন সূর্যোদয় সোনারাঙা রোদ্দুরে আলোয় তাপ চেয়ে কান্নার পরিসমাপ্তি ঘটবে। শীত মরশুমের শেষে আবার আসবে বসন্তের হিল্লোল। অত্যাচারী ফ্যাসিবাদের

খড়্গা ভেঙে পড়বে কিন্তু এর প্রয়োজন সকলের সমবেত প্রচেষ্টা। সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ কর নি—এ অপবাদ ঘোচানো।

আর এ অপবাদ ঘোচাবার দায়িত্ব নিতে পারে বাংলার কিশোর কিশোরীরা ওদের যে প্রচণ্ড শক্তি ক্ষমতা তপ্ত হয়ে রয়েছে আর যে জাগরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বাংলা মায়ের ভাবী নাগরিকদের আলোর পথ দেখাতে হ'বে। ওরা সে অসীম ক্ষমতা ধরে। ওদের যথার্থ আলোর পথ দেখাতে পারলে অন্ধকারের জালটা ছিন্ন করে ওরা সাড়া দেবেই সুকান্ত তা বিশ্বাস করতেন।

এই বিশ্বাসই সুকান্তকে কিশোর বাহিনী প্রতিষ্ঠা করতে প্রেরণা যুগিয়েছিল। তিনি গড়ে তুললেন কিশোর বাহিনী। দেশের কিশোর কিশোরীদের কাছ হ'তে সাড়াও পেলেন অভূতপূর্ব।

পঞ্চাশের মন্বন্তরে পরিণামে দেশের মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল স্বার্থপরতা ও শোষণস্পৃহা। কিশোর-কিশোরীদের কোমল মনকে এই সংক্রামকের হাত হ'তে দূরে রাখার জন্যই কিশোর বাহিনীর অভ্যুত্থান।

শহরে আর শহরের বাইরে গঠিত হল অসংখ্য কিশোর বাহিনী। শহর হতে শুরু করে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত পৌছল কিশোর বাহিনীর কর্মধারার মূল সুরটি। সুস্থ, সবল স্বাস্থ্য গঠন করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল দেশের কিশোর-কিশোরীরা। সমাজ সেবামূলক কার্যে ওরা করল আত্মনিয়োগ।

পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে ভারত মাতার মুক্তি আনতেই হবে।

কিশোর বাহিনীর এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে স্বাধীনতার পত্রিকায় 'কিশোর সভা' বিভাগ খোলা হল। স্বাধীনতা পত্রিকার এই বিশেষ বিভাগটির দায়িত্ব এসে পড়ল সুকান্তের উপর। বিভাগের মাধ্যমে কিশোর কিশোরীদের বোঝাতে চাইলেন রূপকথার মায়াময় রাজপ্রসাদ থেকে আজ বিশ্বযুদ্ধ জর্জরিত, দুর্ভিক্ষ, পীড়িত সাধারণ মানুষের পাশে পথের ধুলির উপর এসে পৌছাতে হবে সুকান্তের লেখা ছড়া আর কবিতা, গীতিনাট্য আর আলোচনার পুষ্ট হয়ে উঠল স্বাধীনতা পত্রিকার কিশোর বিভাগটি। শুধু সুকান্তের লেখা নয় সেকালীয় অন্যান্য বহু

সাহিত্যিকি সেদিন ব্রত নিয়েছিলেন দেশের কিশোর-কিশোরীদের মনের দুয়ারের প্রাচীন কুসংস্কারের গরাদ ভেঙে নূতন সঞ্জীবনী মন্ত্রের সুরটি সঞ্চারিত করে দিতে।

স্বাধীনতা পত্রিকার জন্য সুকান্তের দান গভীর ও অত্যন্ত ব্যাপক। কাগজ সম্পাদনার কোন কোন অংশের দায়িত্ব যেমন তাঁর উপরে ছিল, তেমনি তাঁর আর একটা কাজ ছিল—সেটি কাগজ বিক্রয় করা।

কোন লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, নেই কোন দ্বিধা নির্বিকার চিত্তে কখনও শিয়ালদহ কখনো বা হাওড়া ষ্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে, আবার কখনো বা পথে পথে কাগজ বিক্রি করেছেন নির্বিকার চিত্তে। কিশোর বিভাগ পরিচালনা ক্ষেত্রে সুকান্তের চিন্তাধারার পরিচয় মেলে উনিশ শ' চুয়াল্লিশ সালের সাতই অক্টোবর কিশোর-বাহিনীর কেন্দ্রীয় অফিস ভবানী দত্ত লেন থেকে কিশোর বাহিনীর উদ্দেশ্যে চিঠিতে।

তোমরা কি ধরনের কাজ করবে জানতে চেয়েছ, জানাচ্ছি। তোমরা প্রথমে নিজেদের লেখাপড়া ও আচার-ব্যবহার চরিত্রের উন্নতির দিকে নজর দেবে। নিজেদের স্বাস্থ্য ও খেলা-ধুলার দিকেও নজর দেবে, সেই সঙ্গে তোমার গরীব ও অসুস্থ ছেলেদের সব-সময় সাহায্য এবং সেবা করার চেষ্টা করবে, নিজেদের লেখাপড়ার উন্নতির জন্য খাটবে।"

অরুণাচল বসু সুদূর যশোহরের গ্রামে বসে সুকান্তের সঙ্গে, যোগাযোগ রেখেছিলেন। তাই কিশোর সভার পাতার মাঝে মাঝে অরুণাচল ছবি ও কার্টুন এঁকে দিয়ে সাহায্য করতেন সুকান্তকে। একবার ঘটলো এক মজার ঘটনা। সুকান্ত ও শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় মনে মনে ঠিক করলেন অরুণাচলকে জব্দ করবেন। অরুণাচল ছবি একে ছবির নীচে 'অ' লিখে স্বাক্ষর করতেন। দেবব্রত মুখোপাধ্যায় একটি ছবি আঁকলেন। অরুণাচলের অনুকরণে 'অ' স্বাক্ষরিত হল। ছবি ছাপা হল। স্বাধীনতা পত্রিকা হাতে পেয়ে ক্ষেপে গেছেন। কৈফিয়ৎ তলব করলেন সম্পাদক সুকান্তের কাছে। সুকান্ত অরুণাচলকে লিখলেন—

শ্রামী অরুণাচল মহারাজ সমীপেষু,

বাবাজী!

আপনি গাঁজার ঘোরে ভুল দেখিয়াছেন। আপনার নাম চিহ্ন নকল করা হয়

নাই, ছবিটি বিখ্যাত শিল্পী অহিনকুল মুখোপাধ্যায়ের আঁকা। নাম চিহ্ন অনেকটা আপনার ন্যায় হইলেও স্বাতন্ত্র্য আছে।

এর পরে আর অরুণাচলের কোন রাগ সুকান্তের উপর থাকতে পারে? না থাকেও নি।

স্বাধীনতা পত্রিকার সম্পাদনা করতে গিয়ে সুকান্ত কখনই পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েন নি। রচনা অথবা ছবি ত উঁচুমানের না হলে তা কখনোই ছাপতেন না তিনি। এ স্থানে ভাই-বন্ধু সম্পর্কে কোন স্থান ছিল না। অশোক ভট্টাচার্য তার মেজাজ সুকান্তের চরিত্রের এদিকটিই বেশ স্পষ্টভাবেই তুলে ধরেছেন,—

"ছেলেবেলা আমি পেন্সিল দিয়ে নানা রকমের ড্রইং করতুম এতে মেজদার উৎসাহ ছিল খুব, তিনি স্বাধীনতার কিশোর সভার সম্পাদক।

একদিন বললেন, চাইনিজ ইঙ্ক দিয়ে কিছু একটা একে দে, ছাপিয়ে দেবো—

আমি খেটে খুটে রবীন্দ্রনাথের একটা ছবি একে তাকে দিলুম। তিনি দেখে খুশী হয়ে বললেন, বেশ হয়েছে।

তারপর কদিন বাদে ধরলাম—ছবি ছাপার কতদূর কি হল?

তিনি দুঃখিত স্বরে বললেন, না রে হল না, সুভাষদাকে (মুখোপাধ্যায়) দেখিয়ে তোর কথাটা বলতেই তিনি এমন বিস্ময় প্রকাশ করলেন যে, তুই ভাই বলেই তোরটা আর ছাপাতে পারলেম না।"

যুগোপযোগী নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন সুকান্ত কিশোর বাহিনীর সভ্যদের, চেয়েছিলেন নব চিন্তাধারা ও কর্ম পদ্ধতিতে ওদের ও সঞ্চারিত হবে আগামী যুগের প্রতিবিম্ব। কর্মযোগী সুকান্ত বিশ্বাস করতেন সকলের নির্যাতন আর লাঞ্ছনার অবসান পৃথিবী ভোগোপযোগী হয়ে উঠবে শ্রমিক, কৃষক-মজুর প্রভৃতি খেটে খাওয়া মানুষের কাছে।

আর একটা পৃথিবী প্রতীক্ষমান।
তার অবগুণ্ঠন ঘুচিয়ে দেখতে হবে
সে আমাদের চেনা।
নতুনতর কিছুর পূর্বাভাষে সে বহন
করেছে কিনা। সৃষ্টির পূর্বেই চিরকাল
ধ্বংস নিয়ে আলাপ চলে…

সুকান্ত কবি। অনন্য সাধারণ কবি।

আমরা সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে,
জমে ভীড় ভ্রষ্ট নীড় নগরে ও গ্রামে,
দুর্ভিক্ষের জীবণ মিছিল,
প্রত্যেকে নিরন্ন প্রাণ বয়ে আনে অনিবার্য মিল।
আহার্যের অন্বেষণে প্রতি মনে আদিম আগ্রহ
রাস্তায় রাস্তায় আনে প্রতিদিন নগ্ন সমারোহ।
বুভুক্ষা বেঁধেছে যারা পথের দু'পাশে,
প্রত্যহ বিষাক্ত বায়ু ইতস্তত ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসে।

(বিবৃতি)

বিবৃতির কবি সুকান্ত বহুর ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার কবি যে নন তা তাঁর এই কবিতা হতেই অত্যন্ত স্পষ্টিকৃত! ধীরে ধীরে সেই পরিচয়ের স্বাক্ষর রাখলেন সুকান্ত স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর ভঙ্গীতে। রবীন্দ্রনাথ যে বাণীর জন্য কান পেতে ছিলেন সুকান্ত তো সে-ই কবি!

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন
কর্মে ও কথায় আত্মীয়তা করেছে অর্জন
যে আছে মাটির কাছাকাছি!
যে কবি বাণী লাগি কান পেতে আছি!

সৌখিন মজদুর নয়, কৃষাণের জীবনের সত্যিকার শরিক হয়ে, কর্মে ও কথায় তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপন করে, মাটির কাছাকাছি থেকে দেহে ও মনের পুষ্টি নিয়ে সুকান্ত যথার্থ-ই জনগণের কবি।

মানুষের সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায়, সার্থকতা ও ব্যর্থতায়, মানুষের প্রতি ভালবাসাই তাকে করেছে মানুষ। পাঠকের অকৃপণ ও অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেলেন তিনি।

একটা কাল ছিল যখন বাংলা কাব্য সাহিত্যে শুধু মাত্র পৌরাণিক দেবদেবীই প্রধান্য লাভ করেছিল। কিন্তু সেকালের কবিদেরও লক্ষ্য ছিল।

দেবনারে প্রিয় কবি, প্রিয়ের দেবতা।

তারপর হতেই ক্রমাগত যখন কাব্যধারাগুলি বহতানদীর মতই এগিয়ে চলেছে সম্মুখ পানে তখন কিন্তু সেগুলির মধ্যে ক্রমান্বয়ে ধরা পড়েছে 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' এই বিশেষ সত্যটিই। এই বিশেষ মানবপ্রীতি রবীন্দ্র, নজরুল থেকে শুরু করে অক্ষয় বড়াল, প্রেমেন্দ্র মিত্র পর্যন্ত নানা ভাবে নানা ছাঁচে প্রকাশিত। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রাণে গ্লানি, মনের কথা সহজ মর্যাদার প্রথম বাঙ্ময় হয়ে উঠল সুকান্তের কার্য্যে। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, যুগের দাবীকে কেন্দ্র করিয়া সুকান্তের কবি-প্রতিভা জয়লাভ করেছিল তাই রবীন্দ্রযুগের নজরুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতির আবির্ভাবের ন্যায় সুকান্ত প্রতিভার ইহা এ নতুন স্ফূরণ।"

শতাব্দীর পর শতাব্দীর ধরে জনতা অপমাণিত, অত্যাচারিত শোষিত। এদের দুরবস্থা কেউ দেখে না, শোনে না, এদের কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ টিকিয়ে রাথায় অসহায় কান্না। সুকান্ত সেই কান্নারই তো নতুন রূপ দিলেন। কান্না পরিণতি পেল শফথের মন্ত্রবাণীতে। সুকান্ত নিজেই লিখেছেন,—

আমি কবি বলে নির্জনতা প্রিয় হ'বো আমি কি সেই ধরণের কবি! আমি যে জনতার কবি হতে চাই জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে?

সুকান্ত জনগণের কবি হিসাবে নবজীবনের মন্ত্রোচ্চারণ করলেন। এবার ক্রম্বির মহৎকাব্যের ভাবনার মূলমন্ত্র, I will call it compendiously, in cantation the power so using, words so as to produce in us a soat of enchantment, and by that men a power nomerely to charm and delight, but to kinds our minds into unusual vitality. exquisitely a ware both of thinis connexsons of things. সেই মূল-মন্ত্র করে সুকান্ত কাব্যে আমাদের প্রাণ প্রাচুর্যে উদ্দীপ্ত করে তোলার দাবী রাখে।

জনগণের কবি সুকান্ত জনগণের চেতনাকে করেছিলেন আপন চেতনা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিই সে কবি সুকান্তের দৃষ্টিভঙ্গি। তাই সাধারণ কবিপ্রবরদের মত কুসুম পেলব শুক্সভাবনা বোধ নিয়ে প্রিয়া ফুল, প্রেম বা নির্জনতার হাহাকার নিয়ে তিনি

কবিতা রচনা করেন নি। তিনি মানুষের ভাষাকে স্বীকার করে নিয়ে সুন্দর করে এবং মহৎ মানব জীবনের জন্য তাঁদের পাশাপাশি, কাছাকাছি এসে বাঁচতে চেয়েছেন—

চল্লিশ কোটি জনতার জানি আমিও যে একজন,
হঠাৎ ঘোষণা শুনেছি : আমার জীবনে শুভক্ষণ
এসেছে, তখুনি মুছে গেছে ভীরুতার হিজি বিজি।
রক্তে বেজেছে উৎসব আজ হাত ধরো গান্ধীজী।
... ...
দিক দিগন্তে প্রসারিত হাতে তুমি যে পাঠালে ডাক।
তাইতো আজকে গ্রামে ও শহরে স্পন্দিত লাখে লাখ।

চল্লিশ কোটি জনতার সাধারণ মানুষ হিসেবে নিজে মনে করেছেন সুকান্ত; তাই তাঁর ব্যক্তিসত্তা আর অমর সমষ্টি সত্তা এই দুয়ের মধ্যে নেই কোন ব্যবধান। স্বাচ্ছন্দ্যে সুকান্ত বন্ধুর ঠিকানা আনার ব্যাকুল আগ্রহের উত্তরে বলতে পেরেছেন—

জালিয়ানওয়ালার যে পথে শুরু
সে পথে আমাকে পাবে,
জালালাবাদের যে পথ ধরে ভাই
ধর্মতলার পরে,
দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে
ক্ষুব্ধ এ দেশে রক্তের অক্ষরে।
বন্ধু আজকে বিদায়।
দেখেছ উঠল যে হাওয়া ঝোড়া
ঠিকানা রইল
এবার মুক্ত স্বদেশেই ক'রো।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হল, স্বদেশ মুক্ত হল, কিন্তু সুকান্ত কোথায়? তবু ঘরে ঘরে মানুষের মনের শিলালিপিতে লেখা পড়ল তাঁর ঠিকানা।

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন, সুকান্তর কাব্য এ যুগের তিনটি চিত্তবৃত্তি প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে :—(১) জনজীবন চেতনা (২) সমপ্রাণতা ও (৩) শুভকর্ম প্রেরণা। প্রত্যেক যুগেই কতকগুলো সঞ্চারীভাব মুখ্য হয়ে ওঠে। এ যুগেই তিনটিই সঞ্চারী।

মানুষের শুভ মানুষের কল্যাণ মানুষের মঙ্গল নানযুগে বিভিন্ন মনীষীই তো কামনা করেছেন, লোক হিতার্থে ওঁদের আত্মনিয়োগ ওঁদের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। কিন্তু এ যুগের সুকান্তের কাব্যে বিরাট ও বিপুল জন জীবন চেতনা ব্যক্তি হল—এ একেবারে নতুন। ব্যক্তি জীবন নয়, আপন-সুখ-স্বার্থ-সমৃদ্ধি নয়, ব্যক্তি জীবন সমগ্র সমাজ জীবনের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যে সার্থকতা সে অনুভূতি নাস্মর প্রকাশ সুকান্তের কাব্যের ব্যক্তি-মানুষ সমষ্টি মানুষ হতে বিন্ন হয়ে দুর্বল, ভীরু নগণ্য ও তুচ্ছতার জঞ্জাল স্বরূপ, কিন্তু যখন সে নিজেকে জনজীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে তখন তা সে বিরাট বিপুল শক্তি নিয়ে উর্দ্দেশ্য আগামী দিনের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। সুকান্ত মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন এ সত্যটি। আর বিশ্বাস করেছিলেন বলেই সেই সত্যটি তুলে ধরতেই চাইলেই 'আগামী কবিতার মাধ্যমে'—

জড় নয়, মৃত নেই অন্ধকারের খনিজ
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ,
মাটিতে লালিত, ভীরু শুধু আজ আকাশে ডাকে
মেলেছি সন্ধিগ্ধ চোখ, ঘিরে রয়েছে আমাকে!
যদিও নগন্য আমি, তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে

তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপন মর্মর ধ্বনি বাজে।
বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের চেতনা।

অরণ্য শুধু মাত্র যে বিশাল চেতনাময় তাতো নয়, এর মধ্যে যে বিশাল সম্ভাবনা টুকু লুকিয়ে রয়েছে তা সুকান্তের দৃষ্টি এড়ায় নি। বৃহত্তর জনসমাজে সে আজ জন্ম নিলে পরবর্তী কালে সমাজের অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিদের পাশাপাশি সেই শিশু যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে না কে বলতে পারে সে কথা? আজকের ক্ষুদ্র অঙ্কুরই তো আগামীকালে বনস্পতির সম্ভাবনার মুখর—

ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই—জানি আমি বনস্পতি,
বৃষ্টির মাটির রসে পাই আমি তারই তো সম্মতি
সেদিন ভাষায় এসো হানো যদি কঠিন কুঠারে,
তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে,
ফল দেব ফুল দেব, দেব আমি পাখির কুজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন ॥

ক্ষমতাশালীর ক্ষমতাশীলতার মধ্যে যে অপূর্ব প্রাণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তা তো ঐতিহাসিক সত্য। 'হানো যদি কঠিন কুঠারে,

'তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে, এই ক্ষমতাশীলতার প্রকৃত উদাহরণ।

সুকান্তের কাব্যের দ্বিতীয় গুণ সমপ্রাণতা। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি অন্তরে অন্তস্থল হতে নিবেদিত প্রেমের মধ্যেই রয়েছে সমপ্রাণতার বীজ। মনে রাখা প্রয়োজন, দয়া নয় মৈত্রীই সুকান্তের কাব্যের সমপ্রণতার উৎস।

হে সূর্য !
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও
রাস্তার ধারের উলঙ্গ ছেলেটাকে।

কাব্য রসিকরা হয়তো বা সুকান্তের এই কবিতাকে নস্যাৎ করে দিতে চাইবেন। বলবেন ওটা কিছু নয়। অস্বীকার প্রয়াস হয়তো লাভ নেই, কিন্তু কাব্যের মাপ কাঠিতে বিচার করার প্রয়াস থেকে সরে আসলে যে অকৃত্রিম মানব মৈত্রীর চিত্রটি চোখে পড়ে তা তো সাহিত্যের বড় এটা চোখে পড়ে না। দুঃখকে সুকান্ত ব্যক্তি সীমার উর্দ্ধে পৌছে দিয়েছেন, তাই নিজের কথা বলেই নিজের আকাঙ্খার কথা ব্যক্ত করেই তিনি তার লেখনী থামাননি বরং পথের ধারে উলঙ্গ ছেলেটার প্রতি তাকিয়ে অনুভব করতে পেরেছেন। তেমন শীতে কষ্ট পাচ্ছে তো ঐ ছেলেটাও। ছেলেটার প্রতি সমব্যথীর দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন সুকান্ত। আর আমাদের মনে হল যেন নতুন স্বাদের মানব প্রেদাবৃত—যার স্বাদ ভিন্ন, রূপ ভিন্ন, যা একেবারে নতুন।

এই শ্রেণীর সমমর্মিতার স্বাক্ষর বাহক আর একটি কবিতা 'রাণার' সুকান্তের গরীবের প্রতি ভালোবাসা শুধু তো মন ভোলানো নয়দারিদ্রে প্রতি তার সমগ্র সত্ত্বার অনুভবেই এসেছে। রাত্রির নিঃসঙ্গ নৈঃসঙ্গ প্রকম্পিত করে পৃথিবীর সংবাদ মেলে পৌছে দিয়েছে ক্ষুধার্ত।

দিন গড়িয়ে গিয়ে রাত্রি আসে, আবার রাত্রি শেষে কাক ডাকা ভোর। তার দিনের শেষে মাস। ক্রমে বছর বেড়ে চলে। গ্রাম পেরিয়ে, বন-বাদাড় তুচ্ছ করে রাতের যাত্রাকে বজায় রাখতে হয় তাকে।

সে এগিয়ে চলে সমুখ পানে, তার আর জীবনের স্বপ্ন, সব আশা আকাঙ্ক্ষা পেছনে পড়ে থাকে।

অবাক রাতের তারারা আকাশে মিট মিট করে চায়,
কেমন করে এ রাণার সবেগে হরিণের মত যায় !
কত গ্রাম পথ যায় স'রে স'রে
শহরে রাণার যাবেই পৌঁছে ভোরে ;
হাতে লণ্ঠন করে ঠন ঠন জোনাকিরা দেয় আলো
মাভৈঃ রাণার । এখনো রাতে কালো ।
এমনি করেই জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে,
পৃথিবীর বোঝা ক্ষুধিত রাণার পৌঁছে দিয়েছে 'মেলে' ।
ক্লান্ত শ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে,
জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে ।
অনেক দুঃখে, বহু বেদনায় অভিমানে অনুরাগে,
ঘরে তার প্রিয়া এক শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে ।

সুকান্ত আকাশ ছুলেও, মাটি ঘামে ভিজে গেলেও রাণার বিশ্রামের অবকাশ নেই। মানুষের বার্তা রাণারকে বহন করে নিয়ে যেতেই হ'বে। ওদের এ চিঠি, কত সুখে, প্রেমে, আবেগে স্মৃতিতে, কতো দুঃখ ও শোকে লেখা। মানুষ তার আপন প্রিয়জনের কাছে লিখেছে যে চিঠি তা যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া দায় আর দায়িত্ব দুই-ই নিয়েছে রাণার কিন্তু যে রাণার খবর বহন করে চলেছে রাতের পর রাত তার জীবনের দুঃখ কাহিনী শুধু 'জানবে পথের তৃণ'—

এ দুঃখে চিঠি পরবে না কোনো দিনও,
এর জীবনের দুঃখ কেবল জানাবে তৃণও
এর দুঃখের কথা জানাবে না কেউ শহর ও গ্রামে,
এর কথা পড়ে থাকেই কালো রাত্রির ঘামে ।

সুকান্ত রাণার জীবনের করুণ ছবিটি কালো রাত্রির খাম উন্মুক্ত করে পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন রাণার জীবনের করুণ ট্র্যাজেডিটুকু। শূকান্তের প্রাণের মমতাবোধ হতেই রাণার দুঃখ সার্বজনীন আবেগ পূর্ণ হয়েছে।

কিন্তু জনচেতনার উন্মেষের অভাবই বোধ কবির কাছে মুক্তি পাওয়ার অন্তরায় স্বরূপ। তাই কবির কণ্ঠে শোনা গেছে মানুষের কর্তব্যচ্যুতি, অক্ষমতার প্রাপ্যের কথাটুকু—

তোমাদের ঐক্যহীন বিশৃঙ্খলা দেখে
বন্ধ হয়ে গেছে মুক্তির দোকানের ঝাঁপ।

তবু কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবি কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে এই চল্লিশ কোটি জনতার প্রতি সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান।

হয়তো এই বিশ্বব্যাপী লাইনের শেষে
এখনো তোমাদের স্থান হতে পারে—
একথা ঘোষণা করে দাও তোমাদের
দেশময় প্রতিবেশীর কাছে।
তারা নিঃশব্দে দাঁড়াও এ লাইনে
প্রতিজ্ঞা আর প্রতীক্ষা নিয়ে
হাতের মুঠোয় তৈরী
রেখে প্রত্যেকের প্রাণ।

অবশেষে শূকান্ত শোনালেন আদর্শের কথা, যে আদর্শ রাজনীতি মতবাদে ভারাক্রান্ত নয় বরং সমস্ত আদর্শকে সমস্তপ্রকার মতবাদকে যা ছাপিয়ে যেতে পারে। পৃথিবীর চিরকালীন আবর্তনের কথাই শোনালেন তিনি,—

আর মনে ক'রো আকাশে আছে ধ্রুবনক্ষত্র,
নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ,
অরণ্যের মর্মর ধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা,
আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন।

মানুষের কোন কাজই মূল্যহীন নয়, যত তা অকিঞ্চিৎ হোক না কেন! তাই অত্যন্ত নগণ্য ও তুচ্ছ কাজ, যার মূল্য সাধারণের মাঝে কানাকড়িও নয় তার মূল্যায়ণ করতে কিন্তু পৃথিবী দ্বিধা করে না। আর সেখানেই দুঃখ বহন করার পরিতৃপ্তি। মানুষের সম্মুখে রয়েছে কর্মের আহ্বান নতুন যুগের কবি সুকান্তের কণ্ঠে ধনিত হল,—

শুভকর্ম পথে ধর নির্ভয় গান।

শুভকর্মপ্রেরণার সুন্দর কবিতা ঐতিহাসিক। মৃত্যুকীর্ণ শবে ভরে উঠল তেরশ' পঞ্চাশ সাল। পঞ্চাশের মন্বন্তর বাংলার রূপ করল পরিবর্তিত। দুর্ভিক্ষের করালমূর্ত্তি নিয়ে বাংলা দেশ তখন ভয়াবহ। অসহায় মানুষ মারা গেল কাতারে কাতারে। তবু মানুষ সেদিন বুঝতে পারেনি পরাধীন দেশমাতৃকার মুক্তপনের বলি হিসাবে নিজেকে উৎসর্গ করার দুর্লভ সুযোগ হেলায় হারাবার কোন যুক্তি নেই।

একদা দুর্ভিক্ষ এল
ক্ষুধার ক্ষমাহীন তাড়নায়
পাশাপাশি ঘে ষাঘেষি সবাই দাঁড়ালো এক লাইনে
ইতর ভদ্র, হিন্দু, মুসলমান
একই বাতাসে নিল নিঃশ্বাস।
চাল, চিনি, কয়লা, কেরোসিন।
এ সব দুষ্প্রাপ্য জিনিষের জন্য চাই লাইন।
কিন্তু বুঝলে না মুক্তিও দুর্লভ আর দুর্লভ,
তারো জন্য চাই চল্লিশ কোটির দীর্ঘ অবিছন্ন একলাইন।

তেরশ' পঞ্চাশের পরবর্তি বাংলার পটভূমিকায় লেখা শূকান্তের 'বোধন' শ্রেষ্ঠ কবিতা। সমাজ তথা মানবতা বিরোধী শাসন আর শোষক শ্রেণী, মন্বন্তরের মহাশ্মশানে উপবিষ্ট মজুতদার আর মুনাফাখোরের দল—এই দানব শ্রেণীর সঙ্গে সংগ্রামের জন্য নারীঘাতী শিশুঘাতী কুৎসীত বিভৎসতার বিরুদ্ধে ধিক্কার ঘোষণা করতেই 'বোধন' কবিতার সৃষ্টি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর পঞ্চাশের মন্বন্তর যে

ধ্বংসস্তুপ রচনা করেছিল শবসমাকীর্ণ সেই স্তুপপিঠে শুকান্ত কামনা করেছিলেন মহামানবের 'বোধন'—

হে মহামানব একবার এসো ফিরে
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রামে নগরের ভিড়ে,
এখানে মৃত্যু হানা দেয় বার বার ;
লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার।
এই যে আকাশ, দিগন্ত মাঠ, স্বপ্নে সবুজ মাটি
নীরবে মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাটি,
কোথাও নেইকো পার
মারী ও মড়ক মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যার
আঘাতে আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন নৌকার পাল,
এখানে চরম দুঃখ কেটেছে সর্বনাশের খাল,
ভাঙা ঘর ফাঁকা ভিটেতে জমেছে নির্জনতার কালো
হে মানব, এখনো শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।

শুকান্ত মহামানবের আহ্বান জানালেন। মৃত্যুঘাটি বেধেছে সেখানে দিগন্ত জোড়া স্বপ্নিল সবুজ মাটির মাঠ যখন শবসমাকীর্ণ, মারি আর মরক গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে দিয়েছে, সেখানে মহামানবের আবির্ভাব অভিপ্রেত নিশ্চয়ই। কিন্তু এই সর্বনাশের জন্য দায়ী কারা ? যারা অন্যায় করেছে তারা নিশ্চয়ই দায়ী কিন্তু যারা নীরবে অন্যায় সহ্য করেছে তাদের দায়িত্ব বা কম কিসে ? যারা শুধুমাত্র কোনক্রমে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণটুকু ধুকে ধুকে টেনে নিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়ার অপেক্ষামান তারা নিজেদের কর্তব্যচ্যুত এড়িয়ে যেতে পারে।

ব্যাহত জীবন যাত্রা চুপি কান্না সব বুকে,
হে নিড়-বিহারী সঙ্গী ! আজ শুধু মনে ধুকে,
ভেসেছে সংসার সিন্ধু কোন মতে যাব পার

পায়ে পায়ে বাধা ঠেলে। তবু আজ বিস্ময় আমার—
ধুর্ত, প্রবঞ্চক যারা কেড়েছে মুখের গ্রাস
তাদের করেছে ক্ষমা, ডেকেছ নিজের সর্বনাশ।
তোমার খেতে শস্য
চুরি করে যারা গুপ্ত কক্ষেতে জমায়
তাদেরই দুপায়ে প্রাণ ঢেলে দিলে দুঃসহ ক্ষমায় ;
লোভের পাপের দুর্গ গম্বুজেও প্রাসাদে মিনারে
তুমি যে পেতেছো জাত আজ মাথা ঠুকে বারে বারে
অভিশাপ দাও যদি, বার বার হবে নিস্ফল—
তোমার অন্যায়ে জেনো এ অন্যায় হয়েছে প্রবল।
তুমি তো প্রহর গোনা,
তারা মুদ্রা গোনে কোটি কোটি
তোমাকে বিদ্রূপ করে হাতছানি ডাকে—
কুজ্ঝটিকা তোমার চোখে, তুমি ঘুরে ফেরো দুর্বিপাকে—

আজ শুধু মাত্র আর আস্ফালন নয়, আজ প্রতিশোধ নেওয়ার দিন। যারা কোটি কোটি মুদ্রা গুণে আমাদের উপকার দিয়েছে শূন্য মাঠের কঙ্কাল করোটি তাদের বিরুদ্ধে আজ অনমনীয় শক্তি সংগ্রহ করতে হ'বে। এতকালের কলঙ্কের ইতিহাস মুছে ফেলার দায়িত্ব নির্তে হ'বে জনতাকেই। জনসংহতিই মালিক মজুতদার প্রভৃতি শোষক আর শাসক সম্প্রদায়ের নিষ্ঠুর শক্তির বিরুদ্ধে সক্ষম হ'য়ে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করবে। আদিম হিংস্র মানবিকতার কথা ভেবে হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা দিয়ে জবাব দেওয়ারই সময় এসেছে আজ। স্বজন হারানো শ্মশান চিতায় স্থান নিতে হ'বে আজ সেই শাসক আর শোষক সম্প্রদায়কেই। জনতার কণ্ঠে তাই শুকান্ত দিতে চাইলেন একটি মাত্র প্রশ্ন, তারা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল—

শোন রে মালিক, শোন রে মজুতদার
তোদের প্রসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়
হিসেব কি দিবি তার ?

হিসাবে ওরা ওদের দুঃখের দুর্দশার কথা শোনায়—

প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘর বাড়ী।
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলতে পারি ?

স্বজন বিয়োগব্যাথা ভোলা সম্ভব নয়। তাই ঘর ছাড়া, স্বজনহারা মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় শপথ মন্ত্র বিরাট জনচিত্তের অপরিসীম শক্তিসম্পন্ন আত্মসম্বিৎ যুগের সর্বহারা জনগণের পুঞ্জীভূত ক্রোধের প্রতিস্পন্দন—

আদিম হিংস্র মানবিকার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।

কিন্তু যারা এখনও শাসক ও শোষক শ্রেণীর জনঘাতী পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দিতে পারবে না তাদের বিরুদ্ধে শুকান্ত ঘোষণা করেছেন ক্ষমাহীন ধিক্কার বাণী।—

তা যদি হয়, মাথার উপরে ভয়ংকর
বিপদ নামুক, ঝড়ে বন্যায় ভাঙুক ঘর ;
তা যদি না হয় বুঝবো তুমি তো মানুষ নও—
গোপনে গোপনে দেশদ্রোহীর পতাকা বও
ভারতবর্ষ মাটি দেয়নিকো, দেয়নি জল
দেয়নি তোমার মুখেতে অন্ন, বাহুতে বল।
পূর্বপুরুষ আজকে তোমার নেইকো ঠাঁই।

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন "নিশ্চয়ই এটা ভারত বচন নয় এ যেন ক্রোধোদ্দীপ্ত দুর্বাসার অভিশাপ। কিন্তু এর পেছনে শুধু অশুভ তাণ্ডব নেই, আছে শিব প্রতিষ্ঠার যুভৈষণা ! সেই জন্যই 'বোধন' এ যুগের শ্রেষ্ঠ প্রেরণা এবং শ্রেষ্ঠকাব্য। এ যুগে জন জীবন চেতনা নিয়ে কাব্য সাহিত্য অনেক সৃষ্টির পরীক্ষা হয়েছে, কিন্তু শত শত পরীক্ষার পরেও যদি এমনি একটি সার্থক পুষ্টি সম্ভব হয় তবে পরীক্ষার মূল্য অপরিসীম।"

অপরিণত যৌবনেই সুকান্ত এমন অনন্যতার স্বাক্ষর সম্বলিত লিখলে যা সুপরিণত ও সার্থক।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হ'তেই নতুন আংশিক ও বিষয়বস্তুর দিকে মোড় ফিরিয়ে ছিল বাংলা কবিতা। এ যে অনিবার্য হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল এবং এই মোড় পরিবর্তনে বাংলা কবিতা যে সার্থকতাও লাভ করেছিল তা আজ কোন প্রশ্নেরই অপেক্ষা রাখে না রুশ বিপ্লব নতুন সমাজ গঠনের খবর এসে পৌছাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর আধা উপনিবেশ ভারতবর্ষে। আমরা ভারতীয়েরা যে চিরাচরিত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম তা আমাদের মনকে নাড়া দিত প্রবলভাবে ফলে জীবনযাত্রার মূল্যবোধকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবার প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে দেখা দিল। আর এই প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারলেন না বাংলার কবিতা নতুন ভাবে জীবনের মূল্যবান করতে গিয়ে সব কবিই যে প্রগতিবাদ হয়ে পড়েছিলেন সে কথা ঠিক নয়। তবে কোন কোন কবি জীবনের অনিবার্য অকার্যণে সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে ছিলেন। কেউ বা কম কেউ বা বেশী। কেউ বা কৃষক মজুরের নাম করে নানা শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, আবার কেউ বা পেরেছিলেন বাংলা কবিতাকে লোকমানসের সংগে সংযুক্ত করে শিকরে যথার্থ মৃত্তিকার স্পর্শ দিতে সুকান্ত এই শেষোক্ত শ্রেণীর কবি। আধুনিক যন্ত্রণা, বিষাদ এবং বিদ্রোহ তাঁর কবিতার উপজীবিকা হয়ে উঠল।

উনিশ শ, তিরিশের ১৮ই এপ্রিল মাষ্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীরা এক অভাবনীয় ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। চট্টগ্রামে স্বাধীন। চট্টগ্রাম মুক্ত।

ব্রিটিশ ইউনিয়ন জ্যাকের পরিবর্তে সেখানে পত পত করে উড়তে থাকলো ভারতের জাতীয় পতাকা। সকলের মুখে সেদিনে এক কথা 'চট্টগ্রাম বীর বিপ্লবীরা দেখিয়েছেন বটে'

১৯৪৩-এর যুগ সন্ধিক্ষণে যখন চট্টগ্রামের উপর জাপানী বিমানের দুঃখসহ মহন্তা চলতে লাগল তখন কবি সুকান্তর সাম্রাজ্য লিপ্সু জাপানের পাশবিক অত্যাচার আর লাঞ্ছনা দেখে লিখলেন—

বিক্ষত বিধ্বস্ত দেহে অদ্ভুত নিঃশব্দ সহিষ্ণুতা
আমাদের স্নায়ুতে।
বিদ্যুত প্রবাহ আনে আজ চেতনার দিন।
চট্টগ্রাম!
এখনও নিস্তব্ধ পাশবিকতার
দুঃসহ মহন্তা চলে,
তাই আজো শত্রুর সাহসী।

সেদিন চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবী সূর্য সেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর বিচারে ফাঁসি দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কিন্তু বিক্ষুব্ধ তরুণ সম্প্রদায়কে তো শান্ত করা গেল না;

তাই চট্টগ্রাম ছেড়ে ঢাকা, ফরিদপুর, নারায়ণগঞ্জে ছড়িয়ে পরল বিদ্রোহের আগুন। সেদিন যে তাঁরা শপথ নিয়েছিল,—

তোমরা প্রতিজ্ঞা, তাই আমার প্রতিজ্ঞা চট্টগ্রাম।
আমার হৃৎপিণ্ড আজ তারি লাল স্বাক্ষর দিলাম ॥

কাব্যের উপাদান হিসাবে সুকান্ত যে সব প্রতীক ব্যবহার করে ছিলেন সেই প্রতিকগুলি চলিত জীবনের পথে দুধারে থেকেই সংগ্রহ করে নেওয়া। এরজন্য সুকান্তকে কখনই অন্য কোন স্থানের বা অন্য কোন সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে হয়নি! জীবনাশ্রয়ী কাব্যের জন্য কোন সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে হয় নি। সুকান্তের জীবতাশ্রয়ী কাব্যের প্রতিকগুলো জীবনের আশ্রয় করে পরিবর্ধিত—

একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেল বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে
ভাঙা প্যাকিং বাক্সর গাদায় আরো দু' তিনটি মুরগীর সঙ্গে
আশ্রয় যদিও মিলল,
উপযুক্ত আহার মিলল না।
শুরু হল আঁস্তাকুড়ে আনাগোনা
কিন্তু আশ্চর্য, সেই আঁস্তাকুড়েও জুটল অংশীদার,
দেখা দিল প্রতিদ্বন্দ্বী
অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে
বারবার চেষ্টা করত প্রাসাদে ঢুকতে

প্রত্যেকবারই পেল প্রচণ্ড আঘাত
ছোট্ট মোরগ ঘার উঁচু করে স্বপ্ন দেখে—
প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবারের।
তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেল,
একেবারে সোজা চলে এক
ধপধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা দেওয়া খাবার টেবিলে
অবশ্য খাবার খেতে নয়, খাবার হিসাবে।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য এই কবিতাটি সম্বন্ধে লিখেছেন, প্রতীক দাম দিলে এটি সত্যি সমাজ তন্ত্রবাদের ওকালতি-করা একটি প্রবন্ধ হতে পারত। কিন্তু প্রতীকের ব্যঞ্জনা বলেই রচনাটি কাব্যলোকে প্রবেশ, পত্র পেয়েছে এবং এর কাব্যত্ব নিহিত আছে অসহায় মোরগের ঐ অন্তিম পরিণামের প্রতি কবির অশ্রুক্ষরা করুণার মধ্যে।

কিশোর কবি সুকান্ত যখন পৃথিবীকে দেখার জন্য কৌতূহলী তখন তিনি দেখলেন পৃথিবী জুড়ে শুধু সংগ্রাম আর সংঘর্ষ। হত্যা আর জিঘাংসার রক্তে রাঙা অলিম্পিক। সুতীব্র অনুভূতির তীক্ষ্ণ বিচার প্রবনতা জীবন সম্পর্কে অসহনীয় কাতরতা দুঃখবোধ কবিকে করে তুলল মুখর।

পূর্বাভাসের কবিতাগুলির চিত্রকল্পের মধ্যে সুকান্তের এই জীবনযন্ত্রণাবোধ অত্যন্ত স্পষ্ট।

সুষুপ্ত যক্ষেরা নিত্য কাঁদিত ক্ষুদায়
ধূর্ত দাবাগ্নি আর জ্বলে চুপে চুপে,
প্রমত্ত কস্তুরীমৃগ ক্ষুব্ধ চেতনায়
বিপন্ন করুণ ডাকে কোলে আর্তনাদ।

চল্লিশ সালের উনিশে নভেম্বর কবির সামনে মৃত্যু অভিযাত্রী মানুষের ছবি চিত্রায়িত করে তুলেছিল। তাই কৈশোর ও যৌবন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কবি সুকান্ত রোমান্টিক স্বপ্ন বিভোর হয়ে ওঠেননি বরং তাঁর দুচোখ প্রতিভাত হয়েছিল মানুষের অসহনীয় যন্ত্রণার ছবিটি আর তাই কবি প্রকাশিত করলেন তাঁর কবিতায়—

সুপ্তোথিত পিরামিড দুঃসহ জ্বালায়
পৈশাচিক ক্রুর হাসি
বিস্তীর্ণ অরণ্য মাঝে কুঠার চালায়।
কালো মৃত্যু ফিরে যায় এসে।।

আমাদের সুস্থ হয়ে বাঁচতে চাওয়ার অধিকার খণ্ডিত, ব্যর্থ। সুকান্ত কেঁদে উঠলেন, কবি-মন স্পর্শকাতরতায় বেদনাপ্লুত হয়ে উঠল। মৃত্যু তার প্রচণ্ড দাপট নিয়ে মানুষকে রক্তাক্ত করে তুললে, কিশোর কবি সেই রক্তাক্ত মানুষেরই অভিষেকে কাঁদলেন।

একদিন পথে যেতে হবে
উষ্ণ বক্ষ উঠেছিল মেতে
যাহাদের, তারাই সংঘাতে
মৃত্যুমুখী, ব্যর্থ রক্তপাতে।

উনিশ বছরের কবি সুকান্ত নতুন মমতায় পৃথিবীকে আঁকড়ে ধরতে চাইলেন—জীবনকে তিনি জানালেন অভিনন্দন,—

প্রভাত পাখীর কলস্বরে
যে লগ্নে করেছি অভিযান,
আজ তার রিক্ত অবসান।
তবু তো পথের আশে পাশে
প্রতি ঘাসে ঘাসে
লেগেছে মোর বিস্ময়।
সেই মোর জশ।

'স্মারক' কবিতায় কবির জীবনের পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা আরও গাঢ় আরও ব্যাপক কবির বেদনাবোধ আরও গভীরে—

কাহার চকতি চাহনি অধীর পিছনের পানে চেয়ে
কাঁদিয়া কাটায় রাতি,
আলোয়ার বুকে জ্যোৎস্নার ছবি দেখতে পেয়ে
জ্বালে নাই তার বাতি,
কাঁদিয়ে কাটায় রাতি।

কবি উনিশ শ' চল্লিশের নভেম্বরেই উপলব্ধি করেছিল, দৃষ্টিহীন আকাশের নিষ্ঠুর সান্ত্বনা। ক্যাপিটালিস্ট সমাজ যন্ত্রণায় নিষ্পেশিত কবি কায়াহীনতার মরুপ্রান্তের প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করেছেন পৃথিবীর সর্বত্র।

এ পৃথিবী অত্যন্ত কুশল,
সেখানে কীর্তি নামাবলী,
আমাদের স্থান নেই সেথা
আমরা শক্তের ভক্ত নহি তো বিজেতা ॥

চল্লিশে ডিসেম্বরেই সুকান্ত চাইলেন শক্ত পায়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখী দাঁড়াতে, তিনি যে পদাতিক। সুতরাং সাবধান তাঁকে হতেই হবে।

মনের জানায় সাবধান হুশিয়ার :
খুজে নিতে হবে পুরানো হাতিয়ার
পাণ্ডুর পৃথিবীতে।

যুদ্ধোন্মত্ত সৈনিক কবি আরও দীপ্ত হয়ে উঠলেন প্রদীপ্ত হুংকার ছাড়লেন—

পণ করো দৈত্যের অংগে
হানবো বজ্রাঘাত, মিলবো সবাই এক সংগে ;
সংগ্রাম শুরু কর মুক্তির।

এই মুক্তির সংগ্রাম শুরু করতে গিয়া বৃথা যুক্তি স্থাপনে বিলাসিতায় গা এলিয়ে দেওয়ার অবসর কোথায় ? যন্ত্রণা থেকেই যখন সংঘর্ষ, বেঁচে থাকা যখন মৃত্যুরই সামিল তখন তো অত্যন্ত সহজেই প্রমাণ করা যায় মৃত্যুকে বরণ করে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা মূল্যবোধটিকে। তাই 'হদিশ' কবিতায় সুকান্ত হয়ে উঠলেন পুরোপুরি সৈনিক। কবি সেনাপতির প্রাণে—

হাতছানি দিয়ে শূন্যের উন্নত শীর্ষ,
জন যাত্রার তুন হদিশ—
সহসা প্রাণের সবুজ সোনার দৃঢ় উষ্ণীষ।

আত্মবিশ্লেষণ হ'তেও বিরত থাকেন নি সুকান্ত। তাই চুয়াল্লিশ সালের একটা কবিতায় এ বিশ্লেষণী মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্ট—

কত সান্ত্বনা আকাশের গভীরনীলে
শুধু শূন্যতা এনেছে বিষাদ এই নিখিলে
মূঢ় আতঙ্ক জন-মিছিলে।

ক্ষত বিক্ষত চলেছি হাজার, তবুও একা।
সামনে বিরাট শত্রু পাহাড় আকাশে-ঠেকা
সঙ্গী বিহীন প্রাণ ধারণে।

কিন্তু সুস্থ জীবনের প্রাঙ্গণটি তো তার চাই। তাই তিনি শপথ গ্রহণ করেছেন নতুন পৃথিবী গঠন করার—

মূঢ় শত্রুকে হানো স্রোত রুখে, তন্দ্রাকে করো ছিন্ন,
একাগ্রে দেশে শত্রুরা এসে হয়ে যাক নিশ্চিহ্ন।
ঘরে তোলা ধান, বিপ্লবী প্রাণ প্রস্তুত রাখো কাস্তে
গাও সারিগান, হাতিয়ারে শান দাও আজ উদয়াস্তে।
আজ দৃঢ় দাঁতে পুঞ্জিত হাতে প্রতিরোধ লও শক্ত,
প্রতি ঘামে ঘামে বিদ্যুৎ আনে সারা অব্যক্ত।

দ্বিতীয় বিশ্বকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদীদের বর্বর আক্রমণকে সুকান্ত কোনদিনই স্বীকৃতি দেন নি। জাপানী বোমারু বিমানের বরাবর আক্রমণ কোলকাতার অধিবাসীদের মনে যে নিদারুণ শংকা এনেছিল তারই আভাস পাওয়া যায় অরুণাচল বসুকে লেখা চিঠিতে।

'যদিও কোলকাতার উপর এই মুহূর্ত পর্যন্ত কিছু ঘটেনি, তবুও কোলকাতার বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার সব কটা লক্ষণই বিজ্ঞ চিকিৎসকের মতো আমি প্রত্যক্ষ করছি। আসন্ন শোকের ভয় ব্যথিই জননীর মতো সাইরেণ দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। আর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার জন্য হচ্ছে কোলকাতা। তবে নাটকটি হবে বিয়োগাত্মক। এই হল কোলকাতার বর্তমান অবস্থা। জানি না তোমার হাতে এ চিঠি পৌঁছাবে কিনা জানি না ডাক-বিভাগ ততদিন সচল থাকবে কিনা। কিন্তু আজ রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে পৃথিবী কোলকাতার দিকে চেয়ে, একদিন যেন মহাকালের এক একটি পদক্ষেপ। আমার দিনগুলি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। বসার ঘরের নববধূর মতো এক নতুন পরিচয়ের সমীপে। বাস্তবিক ভাবতে অবাক লাগে, আমার আজন্ম পরিচিত কোলকাতা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাবে অপরিচয়ের, গর্ভে, ধ্বংসের সমুদ্রে, তুমিও কি তা বিশ্বাস কর অরুণ।

কোলকাতাকে আমি ভালবেসেছিলাম এক রহস্যময়ী নারীর মতো ভালবেসেছিলাম প্রিয়ার মতো, মায়ের মতো তার গর্ভে জন্মানোর পর আমার এতগুলি বছর কেটে গেছে তারই উষ্ণ নিবিড় বুকের সান্নিধ্যে তার স্পর্শে আমি ঘুমিয়ে পড়ছি। বাইরের পৃথিবীকে আমি জানি না, চিনি না—আমার কোলকাতার মধ্যেই সম্পূর্ণ।

সত্যি অরুণ, বড়ো ভাল লাগছিল পৃথিবীর স্নেহ, আমার ছোট পৃথিবীর করুণা বাঁচতে ইচ্ছা করে, কিন্তু নিশ্চিত জানি কোলকাতার মৃত্যুর সঙ্গে আমিও নিশ্চিহ্ন হবো।

আবার পৃথিবীতে বসন্ত আসবে, গাছে ফুল ফুটবে, শুধু তখন থাকবো না আমি থাকবে না আমার ক্ষীণতম পরিচয়।

বিশ্বযুদ্ধ যেমন একদিকে সম্পূর্ণ উদ্যমে চলছিল, তেমনি অন্য দিকে সুকান্ত পূর্ণ উদ্যমে চালাচ্ছিলেন তাঁর পার্টির কাজ, চালাচ্ছিলেন কাব্য সাধনা।

কমিউনিস্ট পার্টির মূল অফিস এ সময়ে ডেকার্স লেনে উঠে গিয়েছিল সুকান্তকে দিনে কম করে দু-তিন বার এসপ্লানেড যেত হত। তা ছাড়া চাঁদা আদায়ের জন্য পাড়ায় পাড়ায় ঘোরা পোস্টার লাগানো, স্বাধীনতা পত্রিকার গ্রাহক ঠিক করা আবার নানা স্থানের কিশোর বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কাজ তো আছেই। এগুলো সাধারণতঃ তাঁকে পায়ে হেঁটেই করতে হত। কারণ দারিদ্র্য তাঁকে বাধ্য কোরতো পায়ে হেঁটেই এই কাজগুলো শেষ করতে। ফলে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

তিনি ইচ্ছে করলে একটুখানি আর্থিক স্বচ্ছলতা পার্টির কাছ হতে নিতে পারতেন, কিন্তু কর্মযোগী সুকান্ত তা নেন নি। ক্রমাগত শরীরের উপর অত্যাচার আর অনিয়ম চালিয়ে তিনি পুরোপুরি শয্যা নিতে বাধ্য হলেন।

দিন কেটে গেল। দেখতে দেখতে বেশ কয়েকটা দিন পেছনে ফেলে এলেন সুকান্ত। এখন খানিকটা সুস্থ তিনি। সুস্থ হয়ে উঠলেন ঠিকই কিন্তু পুরোপুরি বিশ্রামের প্রয়োজন! অথচ বিশ্রাম নেওয়ার অবসর বা সুযোগ নেই। পার্টি আর পরীক্ষা এ দুয়ের জন্য পরিশ্রম করতে গিয়ে সুকান্ত আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সুকান্ত নিজেই লিখেছিলেন,—

'শরীর মন দুই-ই দুর্বল অবিশ্রান্ত প্রবঞ্চনার আঘাতে আঘাতে মানুষ সময় সময় পৃথিবীর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে, ঠিক সেই সময় এসেছে আমার জীবনে! হয়তো এটাই মহত্তর সৃষ্টির সময়। (ভয় নেই আঘাতটা প্রেমঘটিত নয়)। আজকাল অন্যদিকে কেবল হতাশার শকুনি উড়তে দেখেছি। হাজার হাজার শকুনি ছেয়ে ফেলেছে আমার আকাশ। গত বছরের আগেই থেকে শরীর বিশেষভাবে স্বাস্থ্যহীন হবার পর আর বিশ্রাম পাইনি ভালমতে! একান্ত প্রয়োজনীয় বায়ু পরিবর্তন ঘটেনি আমার সময় ও অর্থের অভাবে। পার্টি আর পরীক্ষার জন্যে উঠে দাঁড়ানোর পর থেকেই খাটতে আরম্ভ করেছি তাই ভিতরে ভিতরে অনেক ফাঁক থেকে গিয়েছিল। বুঝতে পারিনি আমার স্বাস্থ্যের অযোগ্যতা। আমার লেখকসত্তা অভিমান করতে চায়, কর্মিসত্তা চায় আবার উঠে দাঁড়াতে।—কিন্তু কি করে ভুলি দেহে মনে আমি দুর্বল, একান্ত অসহায় আমি।"

১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালের গণ-আন্দোলনগুলির পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন শুকান্ত সক্রিয়াভাবে অংশ নিলেন প্রায় সবগুলো আন্দোলনেই। উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীমুক্তি আন্দোলন উনিশ শ' ছেচল্লিশের তে-ভাগা আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ, সর্বভারতীয় ডাক ধর্মঘট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করেছিলেন।

উনিশ শ' ছেচল্লিশের মাঝামাঝি শুকান্ত অবার অশুস্থ হয়ে পড়লেন। এবার তাঁর অবস্থা নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে পরলেন না তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীরা। কিন্তু বাড়তে রেখে শুকান্তের চিকিৎসা সে সময় অসম্ভব হয়ে

দাঁড়ালো ব্লাক আউট আর কারফিউ-এর ফলে কোলকাতার সাধারণ জীবন যাত্রা তখন পর্যুদস্ত ফলে চিকিৎসক যদিও বা মিলল ওষুধ সংগ্রহ করে আনা সে একেবারে শিবের বাবারও অসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং বিপদে পরলেন আত্মীয়-স্বজনেরা, ওঁরা বুঝবেন এভাবে সুকান্তের সুচিকিৎসা সম্ভব নয়। তাঁরা দুর্ভাবনায় পড়লেন সুকান্তকে নিয়ে।

এমন দু'দিনে সেকালের ছাত্রনেতা অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য তত্ত্বাবধার শুরু করলেন হাসপাতালে সুকান্তকে ভর্তি করতেই হবে। কমিউনিস্ট কর্মীদের বিশেষ চিকিসাকেন্দ্র রেড-এড-কি ওর হোমে সুকান্তকে নিয়ে আসা হ'ল।

সুকান্তকে ভর্তি করা হল ১০ নম্বর রডন টের এই আরোগ্য কেন্দ্রে।

এখানে সুকান্ত যেমন পেলেন চিকিৎসার সুযোগ তেমনি পেলেন পার্টির সহকর্মীর হৃদ্যতা। সহকর্মীদের হৃদ্যতায় ধন্য সুকান্ত একটা মানসিক শান্তি এখানে পেয়েছিলেন। পেয়েছিলেন তৃপ্তি। তবু মনের গোপন কোণে একটা বেদনা প্রায়ই মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। বাড়ীর আত্মীয়-স্বজনেরা নিয়মিতভাবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে থাকতেন। কিন্তু যখন বুঝতে পারতেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অবরোধের জন্য শাসকবর্গের কড়া পাহারার ব্যূহ ভেদ করে, আত্মীয়রা হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা এসে পৌঁছাতে পারছেন না তখন মনটাও হয়ে যেত উধাও।

ওঁদেরই কাছাকাছি পাশপাশি চলে যেতে চাইতেন তিনি। হৃদয়ে চাঞ্চল্যের শিহরণ জাগত বারবার। বারবার। তাঁর ব্যকুল দুটি আঁখি 'পথ চেয়ে আর কার গুনে' বড় অস্থির হয়ে উঠত তার এ অস্থিরতা ধরা পড়ত কাকির আঁচড়ে চিঠির বুকে। বন্ধু বান্ধব আত্মীয়স্বজনকে তিনি লিখতেন চিঠি।

এক রকম বৈচিত্রহীন ভাবেই দিন কাটে, যদিও বৈচিত্রের অভাব নেই। অনন্ত সিং গনেশ ঘোষ ছাড়া পেয়ে আমাদের এখানে এসেছিলেন—সেই একটা বৈচিত্র। দেখে আমার জীবনের সবচেছে স্মরনীয় দিন গেছে যেদিন ভক্ত বিপ্লবীরা সদলবলে (অনন্ত সিং বানের) সবাই আমাদের এখানে এসেছিলেন।

অনুষ্ঠানের পর তারা আমাদের কাছে এলেন আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে। বিপ্লবী শুনীল চ্যাটার্জী আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আর একজন বিপ্লবী তার গলার মালা খুলে পরিয়ে দিলেন আমায়। ফ্রান্সে ও আমেরিকায় আমার জীবনী বেরুবে যেদিন শুনলাম, সেদিন এত সার্থক মনে হয়নি আমার এই রোগজীণ অশিক্ষিত জীবনকে। কাল সন্ধ্যার একটা ঘণ্টা পরিপূর্ণতায় উপচে পড়েছিল। ...হাসপাতালে ছক কাটা দিন ধীর মন্থর গতিতে কেটে যাচ্ছে। ...ঝিরি ঝিরি করে হাওয়া বয় সারাদিন। রাত্তিরে চাঁদের আলো এসে লুটিয়ে পড়ে বিছানায়। ডালহৌসী স্কোয়ারের অফিসে বসে কোনদিনই অনুভব করতে পারিব না এই আশ্চর্য নিস্তব্ধতা! এখন দুপুর, কিন্তু চারিদিকে এখন রাত্রির নৈঃশব্দ! শুধু মাঝে মাঝে মোরগের ডাক স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, “এটা রাত্রি নয়—দিন!”

হাসপাতালে বসে শুকান্ত এমনি ভাবে লিখতেন চিঠির পর চিঠি। কবি বা সাহিত্যিক মাত্রেরই যে ব্যক্তিগত জীবন রয়েছে সেই ব্যক্তিগত জীবন প্রতিফলিত হয় চিঠিতে। ধরা পড়ে চিঠির আসরে ব্যক্তিগত চরিত্রটি। শুকান্তের কয়েকটি চিঠি পর্যালোচনা করলে কিশোর কবির ব্যক্তিগত জীবনের কিছু রহস্য আবিষ্কার করা দুরূহ নয়।

সুকান্তের প্রকাশিত চিঠিপত্রের অধিকাংশই লেখা ওঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অরুণাচল বসুকে। সুকান্তের এ চিঠিগুলোর স্বাদ একেবারে ভিন্ন। তাঁর রচিত কবিতার সঙ্গে চিঠিপত্রের একেবারে মিল নেই বললেই চলে। যখন তাঁর রোমান্টিক কবিসুলভ মনোভাব শূন্য তখন কিন্তু সুকান্তের চিঠিগুলোর মধ্যে রোমান্টিক কবিসুলভ উচ্ছ্বাস সহজেই লক্ষ্য করবার মত। রোমান্টিক কবিদের প্রকৃতির মধ্যে অরূপ সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তার পরিচয় মেলে সুকান্তের চিঠিতে।

“তখন ছিল গভীর রাত সেই রাত্রির গভীরতা প্রতিফলিত হচ্ছিল সেই মৌন মূক বরাকরের জলে। যেমন যেন ভাষা পেয়েছিল সব কিছুই। সেই জলে

আর অদূরবর্তি বিকট গম্ভীর পাহার আমার চোখে একটা ক্ষনিক স্বপ্ন রচনা করেছিল। বরাকর নদীর একপাশে বাংলা, অপর পাশে বিহার আর তার মধ্যে স্বয়ংস্ফূর্ত বরাকর, কী অদ্ভুত কী গম্ভীর। আর কোন নদী আমার চোখে এত মোহ বিস্তার করতে পারেনি। এই বেগ আর আবের্গ কেবল আমাকে প্রমত্ত করল।"

আর এক স্থানে প্রকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে সুকান্ত লিখেছেন "—জোনহা সারারাত বিপুল বেগে তার গৈরিক জলধারা নিষ্ঠুরভাবে আছড়ে ফেলতে লাগল কঠিন পাথরের উপর, আঘাত জর্জর জলধারার বুকে জেগে রইল রঙের লাল আর রুদ্ধ ঘরে শোনা যেতে লাগল আমাদের ক্লান্ত নিঃশ্বাস প্রহরীর মত জেগে রইল ব্যানমগ্ন পাহাড় তার অকৃপন বাৎসল্য নিয়ে, আর আমাদের সমস্ত ঢেকে দিলাম বিটের পায়ে।"

সুকান্তের কবি মনে যে একটি ব্যথা ছিল তার পরিচয় তাঁর চিঠিতে পাওয়া যায়, "এই জীবন মরনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে অকপটতার আশ্রয় নিলুম না এই জন্যেই কথাটা গোপন হলেও ব্যথার আর গোপন থাকতে চায় না। এ ব্যাপারটা আমার প্রাণের সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ যে তোর কাছেও তা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আবেগের সংযমের কঠিনতা গলে তা পানীয়স্বরূপে প্রস্তুত হল তার কৌতূহলে। তুই এ প্রেমের ফেনায়িত কাহিনী সুরা কি পান করবি না? কিন্তু এই সুবার মূল্য যে সুধু সহানুভূতির ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস।" কিন্তু এই ব্যথার উৎস অনুসন্ধান করতে গেলেই আমাদের মনে হয় সুকান্ত প্রেমিক। প্রেমিক সুকান্ত কবিতায় তাঁর প্রিয়ার ব্যগ্র দুবাহুর পাশে ধরা না দিলেও ব্যক্তিগত তাঁর আকুলতার পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট,—"ওর অনুভব করতাম বুকের কছে। যখন এসে দাঁড়িয়েছে যৌবনের সিংহদ্বারে—কেঁপে উঠত বুক যৌবনের পদধ্বনি?"

সুকান্‌ত তাঁর প্রেমিকার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন, "নতুন করে ভালবাসতে শুরু করলাম ওকে।" কিন্তু সুকান্‌তের কবিমন এতেই তৃপ্তি পেল না তার শুরু হল তাঁর একটি প্রেমের শেষে আর একটি প্রেমে পদচারণা ব্যক্তি প্রেমেই হল তাঁর আশ্রয়।

তবে উপক্রমণিকাকে আমি একেবারে মুছে ফেলেছি মন থেকে, ভাল জায়গায় তার যে আসন নিয়েছে তার পরিচয় দেব পরের চিঠিতে।"

যথার্থ কবি হৃদয়ের অধিকারী মানুষ এমন আবেগ প্রবণ হয়েই থাকেন, মনে চঞ্চলতা আসাও স্বাভাবিক। নির্দ্দিষ্ট একটি বিন্দুতে অবস্থান করা কোনো কবির পক্ষে সম্ভব নয়। কোন একটি বিশেষের কাছে কবি তাঁর হৃদয়কে বাঁধা রাখতে পারেন না। সুকান্তের মধ্যেও এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় না।

তাই প্রেমিক সুকান্তের মনোভাব বিচিত্রতায় ভাস্বর।

"বাস্তবিক আমার প্রেমের বেদনা বড় অভিনব। হয়তো আমি যে সিঁড়ি দিয়েই ও নামছে, অবতরণকালীন ওর ক্ষণিক দৃষ্টি আমার চোখের উপরে পড়ে আমার বুকে স্নিগ্ধ মধুর শিহরণ জাগিয়ে যায়। একটু আনন্দ, কিন্তু পরক্ষণেই বেদনায় মুষড়ে পড়ি। একটি ঘরে অনেক লোক, তার মধ্যে আমারই কথা ক্রমে তাহলে আমার কথা বলার চাতুর্য বাড়ে আরও বেশী। আমি আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ি, এমনি ওর প্রতি আমার প্রেম কিন্তু বড় ব্যাথা!

কবি মাত্রেই নন সংশয়মুক্ত।

সংশয়ই তো কবির জীবনে নিয়ে আসে বেদনাবোধ। আর এই বেদনাবোধই মহৎ সৃষ্টির প্রেরণা যোগাতে সাহায্য করে থাকে। সুকান্তও ছিলেন না সংশয় মুক্ত হয়তো বা কখনো এই গভীর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কখনো বা অস্পৃষ্টতার কুহেলির মধ্যেই মাথা কুটে মরেছে। তবুও সংশয় ছিল।

"...আমি আজও জানিনা, ও আমায় ভালবাসে কি না। কতদিন আমি ভেবেছি ওর কাছে গিয়ে মুখোমুখি জিজ্ঞাসা করব, এই কথার উত্তর চাইব। কিন্তু সাহস হয়নি। একদিন এগিয়েও গিয়েছিলাম, কিন্তু ওর শান্ত চোখের দিকে আমার কথা বলার শক্তিও হারিয়ে গেছে।"

সুকান্তের এ সংশয় শুধু মাত্র যে প্রেমের ক্ষেত্রে প্রকট হয়েছিল এ কথা সত্য নয়। এ সংশয় ছিল জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে। সুকান্তের জীবনটাই যেন ছিল সংশয়ে পরিপূর্ণ। কবির মনে যত সংশয় তিনি ছাড়া আরও জীবনে বোধ হয় এ সংশয় নেই।

"কেবল আমার পৃথিবীতেই দেখা দিয়েছে বিপর্যয়। বেশ স্কুলে যাচ্ছিলাম, রাজনীতি চর্চা করছিলাম, এমন সময় এল কাল বৈশাখীর মতো বিনা নোটিশে ঝড় যার চোখে ধুলো ছিটিয়ে দিলে আমি বিভ্রস্ত হয়ে পড়লাম, আর সে বিভ্রান্তির ঘোর "এখনও কাটে নি।"

কিশোর কবির কাছে, জীবন যখন মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল যখন কবি বিদায় নেওয়ার জন্য ব্যগ্র তখন সংশয়টি আরও প্রবল ভাবে ধরা পড়ে। সত্যই ভাবতে অবাক লাগে, জীবন হতে এমন পলায়নী বৃত্তি গ্রহণ করলেন কেন? অথচ কবি তো মানুষকে বারবার সংগ্রাম, জীবনযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্যই জানিয়েছেন উদাত্ত আহ্বান জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও জীবন থেকে এমন পালিয়ে যাওয়ার জন্য আকুলতা প্রকাশ করতে দেখে আমরা বিস্ময় হতবাক হয়ে যাই।

"...এই বলে বিদায় নিচ্ছি যে, একদিকে বাইরের খ্যাতি, সম্মান প্রতিপত্তি লাভ করছি, অন্যদিকে আমার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যতকে চূর্ণ করে দিচ্ছি। আমার শিক্ষা জীবনের ওপর এত বড় আঘাত আর আসে নি, তাই বোধ হয় এত নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে এই স্বাভাবিকতাকে। তাই সমস্ত শিরা-উপশিরা রক্তে রক্তে ধ্বনিত হচ্ছে।"

জীবন থেকে পলায়নী মনোভাব সুকান্ত গ্রহণ করলেও শেষ ছাত্র অত্যন্ত স্পষ্ট সত্য যে সুকান্ত জনতার কবি। যে জনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, যে জনতাকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন সংগ্রামের জন্য তাদের পাশে দাঁড়িয়ে নিজেকে যুক্ত করতে চান কবি। তথাপি—

"আগুনের মধ্যে পতঙ্গ হয়তো ঝাঁপ দিতে চাইবে ; চঞ্চল মনের অঞ্চল হয়তো বসন্তের বাতাসে দুলতে চাইবে, মনের মাদকতা হয়তো একটু-বাড়বে, কিন্তু শীর্ণ শাখার সে দোলা সুখের দিনগুলোকে ঝরিয়ে দেবে। আজকাল মাঝে মাঝে অব্যক্ত স্পৃহা সরীসৃপের মত সমস্ত গা বয়ে সুস্থ মনকে আক্রান্ত করতে চায়। আমি এ সমস্ত সহ্য করতে পারি না।"

কিন্তু সুকান্তের পত্রাবলী শুধু কি তার এই মনোভাবই বহন করে ? না, তা নয়।

তাঁর কবিতায় যে সুর উত্তরোল, সে সুরের পরিচয় রয়েছে তাঁর চিঠিপত্রের বহু অংশেই। তাই তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে। সেকালীন বিশ্বযুগের পটভূমিকায় কবি-মনটীকে খুঁজে পাওয়া দুরূহ নয়।

ম্রানায়মান কতকাতর স্পন্দনধ্বনি শুধু বারম্বার আগামনী ঘোষণা করেছে আর মাঝে মাঝে আসন্ন শোকের ভয়ে ব্যথিক জননীর মত সাইরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। নগরীর বুঝি অকল্যাণ হবে আর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কলিকাতা, তবে নাটকটি হবে বিয়োগান্তক। আজ রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে পৃথিবী কলকাতার দিকে চেয়ে, কখন কলকাতার অদূরে জাপানী বিমান দেখে আর্তনাদ করে উঠবে সাইরেন—সম্মুখে মৃত্যুকে দেখে, ধ্বংসকে দেখে ! ১৯৪৩ সালে কলকাতার নতুন সজ্জা গ্রহণের এত অভূতপূর্ব মুহূর্তে।

জাপানী রোমাঞ্চ বিমানের ভয়ে কোলকাতায় অধিবাসী তখন ভীত, সন্ত্রস্ত, পলায়ন উন্মুখ।

'কলকাতা এখন আত্মহত্যার জন্যে প্রস্তুত নাগরিকরা পলায়ন তৎপর।"

বোবারু বিমানের আক্রমণের চিত্রটি আঁকলেন কবি সুকান্ত আর একটি চিঠিতে—

'কাল রাত্রিতে আক্রমণও হয়ে গেল, ব্যাপারটা ক্রমশঃ দৈনন্দিন জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে তাই আক্রমণের এটা ছোটখাট আভাস দিচ্ছে। প্রথম দিন খিদিরপুরে, দ্বিতীয় দিনও খিদিরপুরে, তৃতীয় দিন হাতিবাগান ইত্যাদি বহু অঞ্চলে চতুর্থ দিন ডালহৌসী অঞ্চলে আর পঞ্চম দিন অর্থাৎ গত কালও আক্রমণ হয়। কালকের অক্রান্ত স্থান আমার এখনও অজ্ঞাত।"

মানুষ যুদ্ধে ক্লান্ত। যুদ্ধ নিমগ্ন পৃথিবীকে মানুষ তখন ঘৃণা করতে শুরু করছে। সুকান্ত মানুষের এই সীমাহীন ঘৃণার কথা প্রকাশ করেছেন আত্মজীবনীতেই।

তুমি কুসুম। তোমার গন্ধ আছে, বর্ণ আছে, আছে হৃদয়কোরকে অপ্রতুল আশা। তুমি তো জান : ফসল ফলানোর গান শোনাবার সম্ভাবনাও আছে তোমার অপ্রতুল। তবুও সমাজ সাপের নিঃশ্বাসে তোমাকে শুকিয়ে যেতে হবে। পুড়ে মরতে হবে তোমাকে।

কেন ? কেন পুড়ে মরতে হবে ? কেন শুকিয়ে যেতে হবে ? কেন আবার ? এই তো বিধি ! দেখছ না সামনে চিতা-বহ্নিমাণ। দেখছ না চিতাগ্নি তার সকলকে লোভের জিহবা কতখানি বিস্তার করে রেখেছে। ঐ বহ্নিতে তুমি পুড়ে মরবে।

কি, ভয় পেলে ? কিন্তু—

কিন্তু কি ?

তোমাকে যে পুড়ে মরতেই হবে। চমকে উঠলেন কেন ? না না, তোমার নিস্তার নেই।

কি, মরতে পারবে না ? মরতে ভয় পাও বুঝি ? সাহস হয় না তাই না ?

সাহস তো হবেই না। ভয় তো পাবেই। তুমি যে কুসুম। তোমার যে সম্ভাবনা অনেক।

আমাকে ছেড়ে দাও। আমি মরব না, মরতে পারব না—কিছুতেই না। মাগো——

কেঁদে উঠল মেয়েটি। কেঁদে উঠল কুসুম। পালাতে চাইল সে।

কিন্তু কোথায় পালাবে তুমি ?

পালাবার পথ নেই, যম আছে পিছে। তাছাড়া ওদের যে দৈহিক বল আছে।

তুমি পারবে কেন ! তুমি পালাবে কি করে ? ওদের হাতে তোমাকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে।

ধস্তাধস্তি শুরু হয় অবশেষে ।

তোমার আর্তনাদ তখন গগনবিদারী,

মরতে পারব না—কিছুতেই না । আমাকে ছেড়ে দাও—ওগো দয়া কর ।

না, দয়া তুমি পেতে পার না ।

সমাজ অনুশাসন ।

তোমার পলায়ন করা ছাড়া গত্যন্তর কোথায় ?

সমাজপতি দিগম্বর চাটুজ্জ্যের কথা তোমার কানে পৌছায় নি ?

তুই যে সতী হবি, হারামজাদি ।

এতক্ষণে বোধ হয় তোমার চোখ পড়েছে সমাজপতির উপরে ।

এ দলে তিনিও !

তুমি আর একবার মিনতিতে ভেঙে পড়লে ।

আছড়ে পড়লে সমাজপতির পায়ে । আমাকে দয়া কর—ওগো দয়া কর । আমি তো তোমার মেয়ের মত ।

মেয়ের মতো তাতে কি ? হয়েছে কি তাতে ? স্বামীকে খাওয়ার সময় মনে ছিল না সে কথা ?

সমাজপতি এক ঝটকায় পিছিয়ে এলেন কয়েক পা ।

আর সঙ্গে সঙ্গে তুমি অনুভব করলে অনেকগুলো হাত তোমার চুলের মুঠি ধরে টানছে পিছন থেকে ।

তুমি দু'হাতে মুখটা তোমার ঢেকে ফেললে ।

দয়া নেই ওদের । মনে বিন্দুমাত্র করুণার ছিটেফোঁটাও । ওদের যুক্তি, এ শাস্ত্রবিধি । বিধবা নারীর বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই । কিন্তু কেন ? ওদের বক্তব্য——বিধিলিপি ।

কিন্তু একটা কথা সত্য করে বল তো, এ কি কখনও বিধাতার বিধান হতে পারে ?

সৃষ্টিকর্তা কি কখনও আপন সৃষ্টিকর্মের এমন অকাল বিনাশ কল্পনা করতে পারেন ? পারেন না । পারবেনও না তিনি কোন দিনই । অথচ তুমি, সমাজে শিরোমণি সেজে হয়কে নয়, নয়কে হয় করে চলতে একেবারে ওস্তাদ ।

আসল ব্যাপার তো ভিন্ন ।

ওটা স্বার্থের টানাপোড়েন । স্বার্থের আঘাতে তুমি বা তোমার মত সমাজ সেবকরা, পুরোহিত আর ব্রাহ্মণের দল সহ্য করতে পারে না আদৌ । আর

যেখানে তোমাদের যুক্তি ধোপে টেকে না সেখানেই শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে কিছু বুলি কপ্‌চাবার চেষ্টা চালাও। চমৎকার!

তাই, তোমারই, সমাজ শিরোমণির দল, নারী জাতিকে সৃষ্টি করলে অসহায় করে। পরিবারই হোক আর সমাজ জীবনই হোক—নারীর কোন স্বতন্ত্র সত্তা রহিল না, তোমাদের শাস্ত্রে দোহাই এ সমগ্র জীবন তাই পুরুষ প্রধান সমাজের অত্যাচারে জলে-পুড়ে মরতে হল নারীসমাজকে।

কিন্তু রেহাই নেই এতেও।

মৃত স্বামীর চিতার উপরেই বিধবা স্ত্রীকে জীবন্ত দগ্ধ করা হবে।

বল তো বাক্যবাগীশ সমাজপতির দল, বিধবাকে মৃত স্বামীর সঙ্গে জলন্ত চিতায় জীবিত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা বা স্ত্রীকে স্বামীর শবদেহের সঙ্গে কবরস্থ করা কোন্ শাস্ত্রের বিধি ?

জানি, উত্তর দেওয়ার মত উত্তর তোমাদের জানা নেই।

আসলে এর পিছনে নেই প্রকৃতি শাস্ত্রীয় কোন অনুমোদন।

তোমাদের বিধান-ই নিয়ামক।

অথচ তুমি তো বেশ জান, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণের কোথাও এমন বর্বর প্রথার নির্দেশ নেই।

অলজ্জ স্বীকার করি, সব দেশের সভ্যতার পেছনে বর্বরতার একটা ছায়া থাকে। থাকবেই।

য়ুরোপে তাই বোধ হয় ডাইনীদের পুড়িয়ে মারার প্রথা চলে আসছিল বহু প্রাচীনকাল থেকেই।

ইতিহাস সাক্ষী : গঙ্গাসাগরে পুত্র বিসর্জন রীতি, হত্যে দেওয়া দণ্ড যোগ্য অপরাধ হিসেবেই পরিগণিত হয়েছিল একদিন।

আর সেদিন তাই এ ধরনের অনাচার দূর করবার জন্য প্রয়োজন পড়েছিল আইনের হস্তক্ষেপের।

কিন্তু সতীদাহ নিবারণ ?

প্রশ্ন উঠল : ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে হবে এবার।

সুতরাং আজ ইংরাজ রাজপুরুষগণ সন্দিগ্ধ। ধর্মে হস্তক্ষেপের প্রশ্নে আজ ওরা দুর্বলচিত্ত।

একদিন দিল্লীর মসনদ থেকে খিলজী বংশীয় সম্রাটেরাও তো চেয়েছিলেন সতীদাহ প্রথা নিবারণ করতে, নিবারণ করতে সবিশেষ চেষ্টা করেছিলেন

আকবরও।

কিন্তু ঐ চেষ্টাই।

তেমন কিছু ফলপ্রসূ হয়নি এ চেষ্টা।

হয়তো বা সমাজ সংস্কারের শুভ সময় তখনও এসে পৌছায়নি।

শুরু হল কোম্পানীর শাসনকাল।

বাংলা বিহারের শাসনভার এল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের হাতে।

কোম্পানীর কর্মকর্তারা সতীদাহ প্রথা নিবারণ করলেন। কিন্তু তা সীমাবদ্ধ এলাকায়। শুধুমাত্র শহর কোলকাতা এর সীমারেখা।

শুধুমাত্র কোলকাতা শহরেই তো আর হিন্দুর বাস, তা নয়।

কোলকাতার বাইরে?

না, সেখানে হস্তক্ষেপ করার সাহস সুপ্রীম কোর্টেই হয়নি. তাই শুধুমাত্র কোলকাতা শহরের মধ্যে এই প্রথা নিষিদ্ধ হল।

ফলে সুরাহা হল না এ প্রবল সমস্যার।

বরং কোলকাতায় যাঁরা বাস করেন তাঁরা অনায়াসেই তাদের মতানুসারেই ধর্মীয় এ অনুষ্ঠানটির সমাধা করে আসতেন কোলকাতার বাইরে গিয়ে।

কোম্পানীর আমল এল, কিন্তু সতীদাহ নিবারণের ইতর-বিশেষ কোন সুরাহা হল না।

দিন এগিয়ে চলে। আঠার শ' পাঁচ খ্রীষ্টাব্দের পাঁচই ফেব্রুয়ারী গভর্ণর জেনারেল তখন লর্ড ওয়েলেস্‌লী।

আদালতের কাছে জানতে চাইলেন ওয়েলেস্‌লি, সহমরণের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা।

আদালতে বেতনভোগী পণ্ডিতের অভাব নাই।

সুতরাং আদালতের পক্ষে সহমরণের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দেওয়া দুরূহ কিছু নয়। অনায়াসেই তাই ওয়েলস্‌লী পেলেন আদালতের কাছ হ'তে সহমরণের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা। নির্দেশ করলেন ঐ পণ্ডিতের দল সহমরণের সীমারেখা।

গর্ভবতী, ঋতুমতী নাবালিকা আর শিশু-সন্তানবতী বিধবার সহমরণে প্ররোচিত করা ও অশাস্ত্রীয়।

কিন্তু কাল তো দাঁড়িয়ে নাই এক ঠাঁয়।

ফুলার ওয়েলেস্‌লির কাল।

সতীদাহ প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা তিনি করে যেতে পারলেন না।

আদালতে পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করলেন, সহমরণ হিন্দু ধর্মানুমোদিত।

ওয়েলেসলি ফিরে গেলেন স্বদেশে পদত্যাগপত্র দাখিল করে।

এলেন লর্ড কর্ণওয়ালিস।

আরও পরে ভারতের গভর্ণর জেনারেল হয়ে এলেন মিঃ বর্লো।

কিন্তু কেউ আর তেমন সহমরণ নিয়ে মাথা ঘামালেন না।

তবু এল অবশেষে আঠারশ' বারো খ্রীষ্টাব্দ।

সরকার আবার প্রশ্ন তুললেন সহমরণের বৈধতা সম্পর্কে।

হিন্দুধর্ম সম্মত সহমরণ না হয় হোল, কিন্তু হিন্দুধর্মের উপর গুরুতর আঘাত না হোলে কি এই প্রথা উঠিয়ে দেওয়া যায় না?

নতুন শাসক যখন দেখলেন সকল বর্ণের হিন্দুমাত্রই সতীদাহ প্রথা টিকিয়ে রাখার জন্য আগ্রহী তখন তার পক্ষে আর বেশীদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হল না।

হিন্দুধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করার মত সাহস কোম্পানীর হল না।

তবে সরকার নিশ্চেষ্ট রইলেন না।

নিজামত আদালতের উপদেশ নিলেন আর সেই উপদেশ অনুসারে কোন কোন বিধবার সহমরণ নিষিদ্ধ করে আদেশপত্র পাঠালেন ম্যাজিষ্ট্রেটগণের কাছে।

কেটে গেল আঠার শ' সতের।

অথচ আঠারশ' আঠার আসতেই বেশ কিছু সংখ্যক হিন্দু সরকারের কাছে আবেদন করলেন, এই আদেশপত্র প্রত্যাহার করে নাও।

এবার আন্দোলনে অংশ নিলেন এমন একজন মানুষ তিনি হিন্দু শাস্ত্রে বিশ্বাসী অথচ কৃতসংকল্প তিনি সতীদাহ প্রথা নিবারণ করতেই হবে।

এগিয়ে এলেন রামমোহন।

মনস্বী রামমোহন, সমাজ সংস্কারক রামমোহন। মহাত্মা রামমোহন।

সহমরণের সমর্থন জানিয়ে যে আবেদন জানিয়েছিলেন কিছু সংখ্যক স্বার্থ

সন্ধানী হিন্দু সেই আবেদনের প্রতিবাদ জানাতে হিন্দুদের পক্ষ হতেই আর একটা পাল্টা আবেদন দাখিল করা হল। স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে বেগ পেতে হয়নি রামমোহনকে, কারণ সবাই তো স্বার্থসিদ্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে নি।

হেষ্টীংসের রাজত্বকাল হতেই তো সংগৃহীত হচ্ছিল সতীদাহ সংক্রান্ত নানা তথ্য। সরকার তখনো দ্বিধাচিত্তঃ সাধারণ সম্মুখে এ তথ্য প্রকাশ করা চলে কিনা এই প্রশ্নে। সবেমাত্র ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে সবেমাত্র কোম্পানীর ডাইরেক্টারদের সভায় বিষয়টি গ্রহণ করা হয়েছে। সবেমাত্র জানতে পেরেছেন ইংলণ্ডের জনসাধারণ—ঠিক সেই সময় পাল্টা আবেদনের ব্যবস্থা করলেন রামমোহন। ত্বরান্বিত করলেন সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন। কিন্তু কেন ?

তা কি শুধু মাত্র প্রকাশিত পুলিশ রিপোর্ট পাঠ করেই ? রিপোর্ট বলেছেল, এক বছরে তিনশত চল্লিশ জনসহমৃতা হয়েছেন। শুধু মাত্র কোলকাতার সীমার মধ্যেই আর এই সহমৃতাদের বয়স ছাব্বিশ হতে বাশট্টি। রামমোহন পড়েছিলেন এই রিপোর্ট।

কিন্তু রামমোহনের এই প্রতিজ্ঞা তো এই রিপোর্ট প্রকাশের পরে নয়। তাঁর এ প্রতিজ্ঞা যে আরও অনেক বৎসর আগে। এ রিপোর্ট যখন প্রকাশিত হয় তখন রামমোহনের বয়স একান্ন বৎসর। অথচ তাঁর এ প্রতিজ্ঞা যৌবনের।

হ্যাঁ, যৌবনকালেই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন কোনো একজন স্ত্রীলোকের সহমরণের ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা লক্ষ্য করেই : এ প্রথা তিনি রহিত করিবেনই। এ প্রথা রহিত করতে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন।

আঠারশ' দশ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

রামমোহন তখন রংপুরে ।

বাড়ী থেকে খবর এল রংপুরে ।

রামমোহন এ সংবাদে হতভম্ব, শোকে, স্তম্ভিত ।

একী শুনলেন তিনি !

একি সংবাদ তিনি শুনলেন ?

জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধু অলকমঞ্জরী সহমৃতা ।

অথচ এমন বেশী বয়স তখন অলকমঞ্জরীর নয়, মাত্র চল্লিশ বছর । আরও দীর্ঘকাল তো তিনি বাঁচতেন । ভরে রাখতেন সংসার স্নেহ-মায়া-মমতায় ।

বাড়ী ফিরে এলেন রামমোহন ।

একটা প্রশ্ন তাঁর মনে, বারবার জাগে, তিনি চান সহমরণ প্রথার বিলুপ্তি । আর তাঁরই পরিবারে এমন নৃশংস জঘন্য ঘটনার পুনরাবৃত্তি ! কেন ? কেন ?

দুঃখে-শোকে-অপমানে তিনি ভেঙে পড়লেন ।

আবার নূতন শপথ নিলেন : এই প্রথার বিলোপ ঘটাতেই হবে ।

দেখা করলেন মার সঙ্গে ।

না তুমি বৌদির সহমরণে বাধা দাও নাই ?

মা নিরুত্তর ।

বুঝতে পারলেন রামমোহন, মা তারিণী দেবী পুত্রবধুর সহমরণে সমর্থন না জানালেও বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন নি ।

ঘৃণায় রি রি করে উঠল রামমোহনের সারা শরীরটা ।

গর্ভধারিণী জননীর মুখের দিকে একবার তাকালেন রামমোহন ।

কি ছিল সে দৃষ্টিতে ?

ঘৃণা অনুযোগ ।

মার মুখের উপর চালালেন কথার চাবুক ।

তুমি কেন বাবার সঙ্গে মরতে পারনি ?

মা বোধ হয় পুত্রের এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না ।

কী জবাব দেবেন মা ?

জবাব দেওয়ার কিছুই যে আর অবশিষ্ট নেই ।

রামমোহন ফিরে এলেন কোলকাতায়।

শুরু করলেন গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সতীদাহ নিবারণ করে আলোচনা।

সহমরণের বিরুদ্ধে ইংরাজী ও বাংলায় রামমোহন তিনখানি গ্রন্থ রচনা করলেন, মুদ্রিত করলেন, বিনামূল্যে প্রচারের ব্যবস্থাও করলেন দেশের মানুষের কাছে।

রামমোহন সচেতন ছিলেন, জনমত গঠন ছাড়া আন্দোলনে লাফল্যলাভ সম্ভব না।

সুতরাং অবতীর্ণ হতে তাঁকে তর্কযুদ্ধ।

শাস্ত্র অধ্যায়ন করলেন, সিদ্ধান্তে পৌছালেন, সহমরণ শাস্ত্রসম্মত কোন বিধি নয়। একটা স্বার্থ-সিদ্ধিকল্পে লোকাচার মাত্র।

কিন্তু দেশের সমাজনায়কেরা এত সহজে রামমোহনের কথা মেনে নেবেন কেন? কেনই বা বিসর্জন দেবেন তাঁদের এতকালের রাজ্যপাট।

অতএব হুঙ্কার উঠালেন তাঁরা। সহমরণ শাস্ত্রসম্মত।

রামমোহন বুঝলেন অত্যন্ত অনায়াসে, এদেশীয় পণ্ডিতবর্গ শাস্ত্র-ব্যবসায়ী আপন স্বার্থানুসারে ওঁরা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দেন, ওঁরা স্বার্থের টানাপোড়েন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েই শাস্ত্র মানেন।

সুতরাং ভিন্নপথ তিনি গ্রহণ ছাড়া তাঁর কোন গত্যন্তর নেই।

কিন্তু কোন্ পথ তিনি গ্রহণ করবেন?

সরকার?

লর্ড আমহাষ্ট' তো সাক্ষাৎ ভাবে সতীদাহ প্রথা নিষেধ করতে প্রস্তুত হলেন না। শুধু আশার স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইলেন, হয়তো বা একটা দিন আসবে যেদিন শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হিন্দুর মধ্যে সতীদাহের মত নৃশংস প্রথা লুপ্ত হবে। সরকারী কর্মচারীগণের আড়ম্বরপূর্ণ প্রচেষ্টার প্রয়োজন পড়বে না কোন দিন।

সরকারী নথিপত্রে আলোচনা আছে কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সরকার যে নিশ্চেষ্ট।

তবু রামমোহনের পক্ষে সরকারী সাহায্য ছাড়া ভিন্ন কোন দ্বিতীয় পথ গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

সুযোগও এল।

নতুন ভাবে কার্যভার নিয়ে এলেন তখন উইলিয়ম বেন্টিক।

মণি-কাঞ্চন সংযোগ হল এইবার।

রামমোহন সমাজ সংস্কারের ব্রত নিয়েছেন, উইলিয়াম বেন্টিঙ্কেরও যে ব্রত সমাজের সংস্কারের।

সতীদাহ নিবারণের জন্য বেন্টিঙ্ক সচেষ্ট হলেন।

রামমোহনের আন্দোলনের কথা তিনি শুনেছেন।

সুতরাং বিনা দ্বিধায়ই তিনি আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন রামমোহনের সঙ্গে।

রামমোহনের মনে কিন্তু দ্বিধা।

ভাবছেন তিনি কী লাভ বেন্টিঙ্কের সঙ্গে আলোচনায় বসে।

অতএব প্রত্যাখ্যান করলেন বেন্টিঙ্কের আমন্ত্রণ।

রামমোহন ভাবতে শুরু করলেন।

অবশেষে তাঁর মনের পরিবর্তন হল।

বুঝলেন, শিষ্টাচারসম্পন্ন বেন্টিঙ্কের সঙ্গে আলোচনায় বসলে বোধহয় সব কিছুই নিস্ফল হবে না।

ইতিহাস ধন্য হল বহন করে এই সাক্ষাৎকার—দুই সমাজ-সংস্কারের এই সাক্ষাৎকার।

অবাক হলেম রামমোহন গভর্ণর হাউসে পৌছে।

লর্ড বেন্টিঙ্কন, মিষ্টার বেন্টিঙ্ক তাঁকে সাদরে আমন্ত্রণ জানালেন।

বিন্দুমাত্র মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হল না রামমোহনের।

এবার শুরু হল আলোচনা।

রামমোহনের প্রতি যথোচিত মর্যাদা দেখিয়েই মিষ্টার বেন্টিঙ্ক জিজ্ঞেস করলেন জানতে চাইলেন সহমরণ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা।

রামমোহনও তো এই-ই চেয়েছিলেন।

তিনিও যে চান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে। সরকারের সাহায্য নিয়েই সতীদাহ নিবারণ করতে।

সুতরাং এমন সুযোগের কি অপচয় ঘটাতে পারেন ?

আপন অভিজ্ঞতা তুলে ধরলেন রামমোহন বেন্টিকের সামনে। তুলে ধরলেন

সহমরণের নিষ্ঠুরতার ছবিটিকে।

এর মধ্যে তো রামমোহন সহমরণ বিষয়ক তিনখানি পুস্তক ছাপিয়েছেন, প্রচারও করেছেন সাধারণের মধ্যে। আজ তিনি সেই বইখানির কপি তুলে দিলেন বেণ্টিঙ্কের হাতে।

রামমোহন বেণ্টিঙ্কের সামনে রাখলেন সমস্ত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা। যুক্তি ও শাস্ত্রের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন সতীদাহের অসারতা।

বেণ্টিঙ্ক মুগ্ধ।

বেণ্টিঙ্ক প্রশ্ন করলেন রামমোহনকে, আপনি কি মনে করেন আইন প্রণয়ন করে সতীদাহ বন্ধ করা উচিত ?

রামমোহন উত্তর দিতে পারছে না। আইন-প্রণয়নের অনুকূল তাঁর আপন অভিমত প্রকাশ করতে পারছেন না। কিন্তু কেন ?

তিনি কি ভাবছেন ?

ভাবছেন, আইন নয়। পরোক্ষভাবে নীরবে পুলিশের সাহায্যে কি সতীদাহ প্রথা ধীরে ধীরে উঠিয়ে দেওয়া যায় না ?

কিন্তু বেণ্টিঙ্ক রাজী নন রামমোহনের পরামর্শ গ্রহণ করতে।

একদিকে সমাজ সংস্কারের অন্তরস্থিত-প্রেরণা, অন্যদিকে শাসনক্ষমতা—কেন বৃথা এমন ঢাক গুরু গুরু ভাবের মধ্যে তিনি যাবেন ?

সুতরাং সহমরণ বিষয়টি কাউন্সিলে তুললেন বেণ্টিঙ্ক।

আঠার শ' উনত্রিশ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর।

আইন পাশ হল।

সতের আইন বিধিবদ্ধ হল।

আইনের ভূমিকায় লেখা রইল রামমোহনের প্রদর্শিত যুক্তি, মনস্বী উপদেশ, মহাত্মা রামমোহনের হৃদয়ানুভূতি জাত প্রমাণ, রাজা রামমোহন রায়ের ইচ্ছা।

উনিশ শতকের নব জাগরণের ইতিহাস রচিত হবে তারই পূর্বাভাষ বোধহয় পাওয়া-গিয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগের—রামমোহন রায়ের জন্মক্ষণেই, সতের শ' বাহাত্তর খ্রীষ্টাব্দের বাইশে মে।

মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল।

মুর্শিদাবাদ জেলার সাঁকোসা গ্রামের অধিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নবাব সরকারের কাজ করেন।

মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজে খুব খুশী।

সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্র পেলেন উপাধি। গুণের সমাদার।

'রায় রায়ান' উপাধি পেলেন কৃষ্ণচন্দ্র।

সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্র আর বন্দোপাধ্যায় নন, তিনি এখন রায়। পদবীই পরিবারের ধারাকে বহন করে নিয়ে যাবে এমন বংশানুক্রমে।

নবাবের তসিলদার কৃষ্ণচন্দ্র।

খাজনা আদায় করতে তাঁকে যেতে হয় কত স্থানেই।

এলেন কৃষ্ণনগরে। [বর্তমান হুগলী জেলা কিন্তু তখন বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত ছিল।]

ভাল লাগল জায়গাটা।

পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেলেন জনৈক সাধুর সঙ্গে!

সাধুসঙ্গ কৃষ্ণচন্দ্রের মনে দেয় বিমল আনন্দ।

অবশেষে তিনি বস্তুজমি সাঁকোসা ছাড়লেন——সপরিবারে চলে এলেন কৃষ্ণনগরে।

কিন্তু একটা স্থায়ী আস্তানা চাই।

কৃষ্ণনগরের নিকটেই রাধানগর।

রাধানগরে তৈরী হল নতুন বাসভূমি——নতুন বিগ্রহ গোপীনাথ প্রতিষ্ঠিত হলেন রাধানগরে।

ওঁরা বৈষ্ণব।

কৃষ্ণচন্দ্রের তিনপুত্র। হরিপ্রসাদ, অমরচন্দ্র, ব্রজবিনোদ।

কৃষ্ণচন্দ্রের এ তিন পুত্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খ্যাতি পেয়েছিলেন ব্রজবিনোদ—দেশহিতৈষণার ক্ষেত্রে, ধর্মানুরাগের জন্যও!

অবস্থাপন্ন তো বটেই।

তখন বাংলার নবাব—শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা।

ব্রজবিনোদ তাঁরই অধীনে কাজ করতেন।

নবাব সরকারে তাঁরা তো বংশানুক্রমেই কাজ করে আসছেন।

কিন্তু ব্রজবিনোদ খুব বেশী দিন সিরাজদ্দৌলার অধীনে কাজ করেন নি।

কিন্তু কেন?

কথিত আছে নবাব সরকারের সদ্ব্যবহারের দৈন্যতাই নাকি তাঁকে বংশানুক্রমিক ধারা রক্ষাকারী নবাব সরকারের কাজ পরিত্যাগে বাধ্য করেছিল।

ব্রজবিনোদের সাত পুত্র।

পঞ্চম পুত্র রামকান্ত।

রামকান্ত বংশধারা রক্ষা করতেই বোধহয় মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে চাকুরী নিয়েছিলেন। কিন্তু পিতার ভাগ্যের পরিহাস তাঁকেও সইতে হয়েছে। তিনিও বিরক্ত হয়েই চাকুরীর পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন।

এই রামকান্ত রায়েরই দ্বিতীয় পুত্র রাজা রামমোহন রায়!

রামকান্ত চাকুরীতে ইস্তফা দিলেন! কিন্তু চলবে কি করে? সুতরাং নতুন করে ইজারা নেওয়ার বন্দোবস্ত করলেন খানাকুল, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম। ইজারা দিলেন বর্ধমানরাজ। আর সেদিন হতেই রাধানগরের রায়েদের নতুন পরিচয় হল—ওঁরা জমিদার। এই জমিদারীই কখন বা তাদের সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে বেঁধে দিয়েছে ঘরে, কখনও বা দুর্ভাগ্যের অলক্ষ্মী লক্ষ্মীকে বিদায় দিয়ে কালো আঁচল বিছিয়েছে।

রামকান্তের তিন বিবাহ।

প্রথমা স্ত্রী সুভদ্রা দেবী, দ্বিতীয়া তারিণী দেবী আর তৃতীয়া-পত্নী রামমণি।

সুভদ্রা দেবী নিঃসন্তান—হয়তো বা তিনি বন্ধ্যা।

তারিণী দেবীর এক কন্যা ও দুই পুত্র। কন্যা জ্যেষ্ঠা, প্রথম পুত্র সন্তান জগন্মোহন (যিনি জগমোহন নামেই পরিচিত) দ্বিতীয় পুত্র রামমোহন।

রাসমণিও এক পুত্রের জননী ছিলেন—রামলোচন।

সর্বময় এক অবশ্য তারিণী দেবী।

পরম শাক্তের মেয়ে বৈষ্ণবের গৃহবধূ হয়ে এসেছিলেন।

রামকান্তের পিতা ব্রজবিনোদ মৃত্যুশয্যায়।

পাশে তাঁর প্রাণাধিক বন্ধু শ্যাম ভট্টাচার্য।

উভয়ের বন্ধুত্বের পরিমাপ করা যায় না—তফাৎ ব্রজবিনোদ বৈষ্ণব আর শ্যাম ভট্টাচার্য শাক্ত। কিন্তু শাক্ত বা বৈষ্ণব ধর্ম ওদের বন্ধুত্বের মধ্যে ফাটল ধরাতে পারেনি বিন্দুমাত্র।

শ্যাম ভট্টাচার্য অমৃতপথযাত্রী ব্রজবিনোদের কাছে চাইলেন তাঁর শেষ চাওয়া। দাবী অবশ্য বন্ধুত্বেরই। এছাড়া আর কোন দাবীতেই বা তিনি এ অনুরোধ জানাবেন?

তোমার যে কোন একটি ছেলের জন্য আমার মেয়েটাকে নাও।

শ্যাম ভট্টাচার্যের কথা শুনে ব্রজবিনোদ বিমূঢ়—বিস্ময়ে হতবাক। এ কী শুনছেন তিনি? শাক্ত আর বৈষ্ণবে বন্ধুত্বের বাধা না রইলেও, বৈবাহিক সম্পর্ক কথাই নয়।

সমাজ মেনে নেবে কেন? সমাজের কাছে এমন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করলে তিনি কি জবাব দেবেন? বৈষ্ণব আর শাক্তধর্মের সমাজে যে দুস্তর ব্যবধান এ ব্যবধান তিনি ঠেলবেন কি করে?

শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্বের দাবীই জয়ী হল, ব্রজবিনোদ ঠিক করলেন শ্যাম ভট্টাচার্যের এ অনুরোধ রক্ষা করবেনই। সমাজের ভ্রূকুটিকে ভয় করবেন না কোন কারণেই।

ডেকে পাঠালেন পুত্রদের।

পুত্রেরা এক এক করে সবাই এসে জুঠলেন ব্রজবিনোদের মৃত্যুশয্যার পাশে।

পিতা একবার সব পুত্রদের মুখের দিকে তাকালেন।

তারপর বললেন, আমার ইচ্ছে তোমাদের মধ্যে কেউ একজন শ্যাম ভট্টাচার্যের মেয়েকে বিয়ে কর।

পুত্রেরা তাকালেন পিতার মুখের দিকে। মৃত্যুপথ-যাত্রীর প্রলাপ শুনছেন না তো তারা!

প্রথম চার পুত্র সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন পিতার এ আবেদন।

পিতার নিস্ফল আবেদন পুত্রদের সংস্কারের দেওয়ালে অযথা মাথা কুটে মরল। ব্যার্থ হল তা।

একী বলছেন আপনি! আপনার একটা খেয়ালকে চরিতার্থ করতে গিয়ে আমরা সামাজিক প্রথার বাইরে পা দিতে পারব না কখনই না।

পিতা ব্রজবিনোদ তা জানতেন, এমনই উত্তর তিনি পাবেন।

তাহলে এত কষ্ট কেন? কেনই বা এত মানসিক যন্ত্রণা?

তাহলে কি তিনি ভেবেছিলেন মুমূর্ষু পিতার কথা অন্ততঃ পুত্রেরা ফেলতে পারবে না।

একটা কী অব্যক্ত যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করতে থাকেন।

রামকান্ত ব্রজবিনোদের পঞ্চম পুত্র পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন।

একি! পিতার মুখে এমন হতাশার ছাপ তো আর কখনও দেখেন নি।

পুত্র হিসাবে তার কি কোন কর্তব্য নেই ? হতাশাদীর্ণ ঐ মুখে এক টুকরো পরিতৃপ্তির হাসি কি তিনি ফুটিয়ে তুলতে পারেন না ? তাহলে কিসের পুত্র।

মানসিক দ্বন্দ্ব এতক্ষণে কাটিয়ে উঠছেন রামকান্ত।

"বাবা, আমি আপনার কথার মর্যাদা রাখব।"

হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছেন রামকান্ত, গোঁড়ামি নয় উদারতাই ধর্মের মাহাত্ম্য বজায় রাখে ক্ষুণ্ণ করে না বিন্দুমাত্র।

ব্রজবিনোদ খুশী।

চোখে যেন তারই প্রকাশ।

আশীর্বাদ করলেন মৃত্যুপথ-যাত্রী পিতা তার সাত রাজার ধন এক মাণিক পিতার মুখ রক্ষাকারী পুত্রকে।

আর রামকান্ত ?

পিতাকে খুশী করতে পেরে—পিতার আত্মা পরলোকে তৃপ্তি পাবে এই ভেবে শুধুমাত্র পিতার আশীর্বাদ পাথেয় করে, লোকভয় আর সমাজের ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করে ঘরে নিয়ে এলেন পিতৃবন্ধু শ্যাম ভট্টাচার্যের কন্যা তারণী দেবীকে।

বধূবেশে কিঙ্কিণী বাজিয়ে তারিণী দেবী এলেন স্বামীর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে একটি ভিন্ন পরিবেশে স্বামীর ঘর করতে।

সুতরাং অসুবিধা একটু হবে বৈকী!

তবু নারীর আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার কিন্তু ছিনিয়ে নিলেন বুদ্ধিমতী, গুণবতী রামকান্ত-জায়া তারিণী দেবী!

লুঠ করে নিলেন পরিবারের সকলের শ্রদ্ধা, স্নেহ ভালবাসা।

প্রথম প্রথম মহাফ্যাসাদে পড়তেন তারিণী দেবী।

কোথায় শাক্ত পরিবার তাঁর বাবার বাড়ী আর কোথায় বৈষ্ণব পরিবার তাঁর শ্বশুরবাড়ী। দুয়ের যে ব্যবধান অনেক, ব্যবধান আচার-ব্যবহারে, রীতিনীতিতে, পূজা-আচার কোথায় ব্যবধান নয় ?

কিন্তু বিয়ের পরই যে তিনি স্বামীর অনুগামিনী! এ শপথই তিনি নিয়েছেন বিয়ের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে।

সুতরাং কেন অযথা শাক্ত করে মনে তিনি দ্বন্দ্ব আনছেন ? ধুয়ে মুছে ফেললেন সে দ্বন্দ্ব।

ধর্ম যাই হোক না কেন, সব ধর্ম-উপাসনার লক্ষ্য যে এক। এ সব ভাবনা গিয়ে শ্যাম আর শ্যামায় কোন পার্থক্য খুঁজে পেলেন না তিনি।

তাই তারিণী দেবী এখন রাধাবিনোদের সেবায়, পরিবারের সকলের সুখ সুবিধা দেখায়, স্বামী দেবতার সেবায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

হয়ে উঠলেন পরিবারের সর্বময় কর্ত্রী। অত্যন্ত অনায়াসেই।

তারিণী দেবী এখন 'ফুলঠাকুরাণী' নামেই পরিচিত।

এমনই বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী ও ধর্মপরায়ণা নারীর সন্তান রামমোহন।

মায়ের গৌরব।

গৌরব মাটি মায়েরও।

বংশ-প্রথা অনুযায়ী রামমোহনের শিক্ষা শুরু হল।

ফারসী ও আরবী ভাষা তাঁকে শিখতে হবে।

পিতা রামকান্তেরও ইচ্ছা সেই রকমই।

কিন্তু ফারসী ও আরবী ভাষা শেখা কি, শুধুমাত্র পিতার ইচ্ছানুসারেই না বংশ প্রথাকে বাঁচাবার জন্য ?

তা কেন ? সেকালের প্রথাই তো ছিল এদুটো ভাষা শেখার।

যদিও তখন দেশে কোম্পানীর শাসন প্রবর্তিত হয়েছে, তবু ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হয়নি আদৌ—সম্ভাবনাও তখন অন্ধকারময় গুহায় আবদ্ধ। যুগ পরিবর্তন হয়েছে, এসেছে যুগান্তর—সব সত্য কথা—কিন্তু ভাষা ? না, ভাষার কোনও পরিবর্তন হয় নি। ভাষা সেই পুরানো যুগেই রয়ে গেছে। ভাষা সেই আরবী ভাষা, ভাষা সেই ফার্সী ভাষা। থাকবেই বা না কেন ? কোম্পানীর আমল প্রতিষ্ঠিত হলেও—কিছু কিছু রাজ্যের দেওয়ানী লাভ করলেও তখন তো নবাবী আমল ফুরিয়ে যায় নি ! তখনও তো পুরোদস্তুর ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং রাজদরবারের মর্যাদাপ্রাপ্ত ভাষা ফার্সী ভাষাই তো দেশবাসীর একমাত্র শিক্ষা গ্রহণের ভাষা।

তাই ভদ্রবংশীয় বাঙালী যাঁরা, তাঁরা এই রাজভাষা শিক্ষা করার জন্য যত্নবান হ'তেন।

শুরু হল রামমোহনের বাল্যশিক্ষা।

গৃহে।

গৃহ ছেড়ে পাঠশালায়।

গ্রাম্য পাঠশালায় বাংলা শিখতে শুরু করলেন রামমোহন। কিন্তু এতে পিতা রামকান্তের তৃপ্তি কোথায় ?

সুতরাং নিয়োগ করলেন একজন মৌলবীকে।

পুত্র রামমোহনকে এই মৌলবী শিক্ষা দেবেন ফার্সী ও আরবী ভাষা।

মৌলবী সাহেব এমন ছাত্র পেয়ে খুশী।

খুশী হবেনই বা কেন ?

এমন মেধা এমন স্বাভাবিক প্রখর বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ছাত্র কয়জন শিক্ষকের ভাগ্যেই বা জোটে ?

ঘোর বৈষয়িক পিতা রামকান্তের দৃষ্টি কিন্তু এড়ায় নি পুত্রের এই মেধা আর বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয়।

সুতরাং কর্তব্য স্থির করে নিলেন পিতা।

ঠিক করলেন রামকান্ত পুত্র রামমোহনকে বিষয়বুদ্ধিতে অভিজ্ঞ করে তুলবেন আর সেই জন্যেই হয়তো বা আরবী ও ফার্সী শিক্ষা দেওয়ার জন্য মৌলবী রাখলেন তিনি।

পিতার এই দৃষ্টি কিন্তু বিফলে যায় নি।

স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধিই হয়ে রইল রামমোহনের সমগ্র জীবনের পাথেয়।

রামকান্ত নিশ্চন্ত—নিশ্চন্ত তারিণীদেবীও।

পিতা দিলেন বৈষয়িক শিক্ষা——আর মাতা দিলেন ধর্মীয়।

মার কাছ থেকে শোনা হিন্দুর রামায়ন, মহাভারত, হিন্দুধর্মের নানা উপাখ্যান ——পুরাণের রোমাঞ্চকর উপাখ্যান কল্পনা প্রবণ শিশু রামমোহনকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে। রামমোহন ঐ কাহিনীর নায়ক নায়িকাদের ভক্তি করতে শেখেন।

সুতরাং ধর্মে নিষ্ঠা এসেছিল একেবারে শিশুকাল হতে এসেছিল গৃহ দেবতার প্রতি। অগাধ ভক্তি।

গর্ভধারিণী জননীর আহলাদের আর সীমা পরিসীমা নেই !

তাঁর পুত্র নিশ্চয়ই বংশের ধারা বজায় রাখবে।

হয়তো বা রামকান্ত সাধনা করতে বসে পুত্রের মঙ্গল কামনাই করছেন—— বংশধারা রক্ষা করছে এ পুত্র মানস নেত্র এখন মুখচ্ছবি লক্ষ্য করেই।

পিতৃসত্য পালন করেছিলেন রামকান্ত।

তাই বৈষ্ণব হয়েও তিনি শাক্তের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন।

পিতার আশীর্বাদই হয়তো বা রামমোহনের মত এমন মেধাবী তথা প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন পুত্রলাভ সম্ভব করে তুলেছে।

রামমোহনের বাল্য শিক্ষা ফুরাল।

পিতা রামকান্ত নিশ্চিত রইলেন না এথানেই।

পুত্রকে সেকালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব।

রামমোহন তথন নয় বছরের বালক মাত্র।

পিতা রামকান্ত পুত্র রামমোহন সম্পর্ক স্বপ্নে বিভোর। পুত্র যদি ভালভাবে আরবী আর ফার্সী শিখে ফেলতে পারে তাহলে নবাব সরকারে একটা ভাল চাকরী ঠেকায় কে।

অথচ তথন তো কোম্পানীর আমল শুরু হয়েছে—নবাবী আমলের তো শেষ অথচ কোম্পানীর সরকারের চাকরীর কথা চিন্তা করতে পারেন সম্ভ্রান্ত বাঙালীরা।

কিন্তু যুগ যে এক ঠায়ে বসে নেই, যুগ পরিবর্তনকে তো অস্বীকার করা চলবে না! তবুও একথাও তো সমান সত্য—যুগ পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেওয়া, অনুভব করা—দুই-ই কিছু সময় সাপেক্ষ।

রামমোহন পাটনায় এলেন।

কিশোর রামমোহন পাটনায় দীর্ঘকাল রইলেন না—মাত্র দু'তিন বছর তিনি কাটালেন পাটনায়।

অথচ দু-তিন বছরের অবস্থানের প্রভাব রামমোহনের জীবনের ভিত্তি গঠনে সহায়তা করেছে অনেকথানি।

স্বাভাবিক প্রথর বুদ্ধিসম্পন্ন তো রামমোহন ছিলেনই আর এই পাটনায় এসে মূল আরবী ভাষায় লেখা এরিস্টটল ও ইউক্লিড পাঠ করে, সেই বুদ্ধিকে করে তুললেন তীক্ষ্ণ—আরও মার্জিত, আরও সুন্দর।

ন্যায় শাস্ত্রে জন্মাল তাঁর অসাধারণ আধিপত্য। রামমোহনের পরবর্তী জীবনে যথন তাঁকে সুতার্কিক রূপে আমরা লক্ষ্য করি তথন তো অত্যন্ত অনায়াসে কল্পনা করতে পারি তার এই প্রতিভাকে, তাঁর ধীরশক্তিকে পরিশোধিত করার পেছনে ছিল এরিস্টটল ও ইউক্লিড পাঠেরই সোনার ফসল।

পাটনায় তিনি এসেছিলেন জ্ঞানের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করতে।

সুতরাং যে কোন স্থান হতে জ্ঞান সংগ্রহ করতে তিনি ব্যাকুল।

ধর্মগ্রন্থের আবার জাত আছে নাকি?

নেই।

অতএব দ্বিধাহীন চিত্ত কোরাণে মনোনিবেশ করলেন রামমোহন।

হোক্ না কেন কোরাণ মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ।

তার সঙ্গে সঙ্গে সুফী সম্প্রদায়ের লেখা গ্রন্থও বাদ পড়ল না।

শুরু হল চিন্তা জগতে বিরাট বিপ্লব।

আর হবেই না বা কেন ?

রামমোহন তো শুধুমাত্র পড়ার জন্য এই বইগুলো পড়েছিলেন এমন নয় ? তিনি তো চেয়েছিলেন এই সকল গ্রন্থের বিষয়বস্তু মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে, চেয়েছিলেন তাঁর এই নূতন শেখা মর্ম কথাকে ধ্রুবতারা করে জীবন পরিচালনা করতে।

রামমোহনের পরবর্তী জীবনে নারীজাতির পক্ষপাতিত্ব করতে তাঁকে যে দেখা গেছে তার সূত্রপাত তো এই কোরাণ পাঠের পরেই।

সমাজ ব্যবস্থার জালে আটকে পড়েই যে নারী জাতির স্বাভাবিক চলাফেরা অস্বাভাবিক, সেকথা রামমোহন অত্যন্ত সহজেই বুঝে ছিলেন। কোরাণ রামমোহনকে শিক্ষা দিয়েছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের মহিমা সম্পর্কে। তাই পরবর্তী কালে যখন ব্রহ্ম সঙ্গীত রচনা করলেন তখন কোরাণের বহু বচনের প্রভাব তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না।

অবশ্য একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন, রামমোহন কোনো দিনই ইসলামের পরিচিত রূপের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন নি। অবশ্য কোন্ ধর্মের প্রতিই বা তাঁর আকর্ষণ ছিল ? কোন্ ধর্মই বা তাঁকে বাঁধতে পেরেছে একটা বিশেষ গণ্ডীর সীমাতে ? না পেরেছে হিন্দু ধর্ম, না পেরেছে খ্রীষ্টধর্ম। আসলে সব ধর্মের সারই তিনি গ্রহণ করেছেন। তাই মোতাজেল ও সুফীদের উপলব্ধ ইসলাম রামমোহনকে আকৃষ্ট করেছিল।

"জীবের সেবা ভিন্ন ধর্ম আর কিছু নয় ; তসবির জায়নামাজ ও আলখাল্লায় ধর্ম্ম নাই।" এই-ই তো রামমোহনের ইসলাম উপলব্ধি।

সুফীদের গভীর মানবপ্রেম রামমোহনের জীবনের বিরাট তথা মহান প্রেরণা হয়ে উঠল।

ইসলামের প্রতি অনুরক্ত রামমোহন।

বার্তা হাওয়ার মত আগে ছোটে ছোটে।

সুতরাং পাটনা আর এমন কী দূরে।

লোক পরম্পরায় খবরটা একেবারে এসে পৌছাল রামকান্তের কাছে। পিতা রামকান্ত চমকে উঠলেন একথা শুনে।

পরম বৈষ্ণবের ছেলে হয়েও রামমোহন ইসলাম অনুরাগী।

রামকান্ত বিস্ময়ে হতবাক।

উত্তর দেওয়ার কথা তাঁর জানা নেই।

তাহলে কি শ্বশুর মহাশয়ের অভিশাপই ফলল।

শ্যাম ভট্টাচার্য, তারিণী দেবীর পিতা একদিন রামমোহনকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন কালে তোর এ ছেলে বিধর্মী হবে।

কিন্তু একী সত্যই অভিশাপ ?

তা কেন ? ওটাতো একটা কথার কথা। নাতি-নাতনীকে উদ্দেশ্য করে ঠাকুর্দা-ঠাকুরমা, দাদু-দিদিমার দলতো অনেক কিছুই বলে থাকেন। তা'বলে তা-ই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে দাঁড়াবে ?

রামমোহন তো তখন চার বছরের শিশু।

সে শিশু কতটুকুই বা জানত, কতটুকুই বা বুঝত ? না বুঝত ভবিষ্যৎ না বুঝত আচার আচরণ।

তাহলে কি শ্যাম ভট্টাচার্য সেদিন ঐ শিশুর মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন আগামী দিনের বিধর্মীকে ? তা-ই কি ?

পিতা রামকান্ত আজ রামমোহনে সংবাদ পেয়ে ব্যাথায় পাষাণ হয়ে পড়েছেন।

কিন্তু তিনি তো পিতা।

পাষাণ হলে কি তাঁর চলে ?

না চলে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে ?

সুতরাং পিতা স্থির করে নিলেন তাঁর পরবর্তী কর্তব্য।

আর পাটনা নয়।

তাছাড়া পাটনায় রামমোহনকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে পাঠানো হয়েছিল সে উদ্দেশ্য তো সফলই হয়েছে।

রামকান্ত চেয়েছিলেন নবাব দরবারের প্রচলিত আরবী ও ফার্সী ভাষায় তাঁর ছেলে ব্যুৎপত্তি লাভ করুক।

তাই-ই তো হয়েছে।

রামমোহন তো যথাসময়ে এ দুটো ভাষা রপ্ত করে নিয়েছে।

তাহলে আর মিছে কেন ছেলেটাকে পাটনায় রাখা।
এবার অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে।
পাটনা ত্যাগ করলেন রামমোহন।
পিতার ইচ্ছানুসারেই তাঁকে আসতে হল কাশী।
এখানে তাঁকে সংস্কৃত ভাষা পড়তে হবে।
হিন্দুধর্মের মর্মজ্ঞ পুত্রকে হতেই হবে।

রামমোহন নিজেই লিখেছেন, আমার মাতামহ বংশের প্রথানুসারে আমি সংস্কৃত অধ্যায়নে নিযুক্ত হই।

তাহলে শ্যাম ভট্টাচার্য পরামর্শ দিয়েছিলেন জামাতা অথবা মেয়েকে রামমোহনকে কাশী পাঠিয়ে দাও ?

হয়তো বা তা হলেও হতে পারে।

রামমোহন কাশী এলেন সংস্কৃত ভাষা শিখতে।

তখন তিনি বারো বছরের বালক মাত্র।

রামমোহনের জীবন চরিত্র রচয়িতারা স্বীকার করে নিয়েছেন, কাশীতে রামমোহন অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যেই প্রধান প্রধান আর্য-শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতার পরিচয় দিতে পারলেন।

কিন্তু এ কী !

ইসলামের একেশ্বরবাদ আর বেদান্তের ব্রহ্মের মধ্যে তো তিনি কোন পার্থক্য খুঁজে পান না !

ধর্মজগতে একটা আলোড়ন শুরু হয়েছিল পাটনায় আর কাশীতে এসে তা একেবারে পরিপূর্ণ রূপ পেল।

কিন্তু কতদিন আর কাশী !
জন্মভূমি যে তাঁকে ডাকে !
রামমোহন ফিরে এলেন রাধানগরে।
কিন্তু এ রামমোহন আর পূর্বের রামমোহন নয়।
জ্ঞানে, শিক্ষায়, বোধের উন্মেষে পরিমার্জিত।
কিন্তু পুরোদস্তর মূর্তিবিরোধী রামমোহন।

সমাজে, মানবদৃষ্টিতে রামমোহন রামকান্ত রায়েরই পুত্র। কিন্তু ইতিহাস তো জানে এ রামমোহনকে একটা ক্ষুদ্রসীমায় আবদ্ধ করে রাখা চলে না।

চলবেই বা কেন ?

তিনি যে যুগমানব !

সতের শ' আশি খ্রীষ্টাব্দের কথা।

রচিত হল 'হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী।'

রামমোহন এ বই লিখলেন—কিন্তু প্রচারে অসুবিধা।

মুদ্রণযন্ত্র তখন বাংলা ভাষা ছাপতে শুরু করে নি।

তাই বইখানা ছাপিয়ে বিলি করার বাসনা রামমোহনকে মনের গোপন কোণে চেপে রাখতেই হল।

এছাড়া উপায়ই বা কী।

কিন্তু বই লেখার কথাটা চালু হয়ে গেল, সারা বাড়ীময়—বাড়ীর বাইরেও।

রায় পরিবারের টনক নড়ল সেদিন।

ষোল বছরের বালকের এ কী কাণ্ডকারখানা ?

কে তাকে এমন বুদ্ধি দিল ? এ তো সুবুদ্ধি নয়, এ যে দুর্বুদ্ধি !

রামমোহন হিন্দু। রামমোহন পরম বৈষ্ণব বংশের সন্তান। অথচ রামমোহ বই লিখলেন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে !

এও কী সম্ভব ?

কিন্তু সম্ভব হয়েছিল। আর সম্ভব হয়েছিল বলেই, চার দেওয়ালের সীমারেখার মধ্যে বিষয়টা আটকে থাকেনি। রামমোহনের ইচ্ছাও সে রকম ছিল না।

কিন্তু ওদের রক্তচক্ষুকে তুমি ভয় পাওনা রামমোহন ?

ঐ সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সেজে সমাজ দেবতার নামাবলী গায়ে দিয়ে রাধানগরের শান্ত পরিবেশকে বিষাক্ত করে দিতে চাইল, তাদের ?

ওরা যে কালভুজঙ্গ হয়ে তোমারই বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছিল।

রামমোহন ভয় পাননি, কিন্তু জানতেন এ বিষোদগারের ফলটা ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে।

পিতা তো তাঁর মতে সমর্থন জানাতে পারবেন না।

পারেনও নি।

ডেকে পাঠালেন পুত্রকে।

রামমোহন ধীরে পাশে দাঁড়িয়েছেন পিতার কক্ষে।

স্থির বিশ্বাসে দৃঢ়পণ রামমোহন অবিচল, অটল। তাঁর বিশ্বাস থেকে একচুল নড়ায় সাধ্য কার ?

জীবনে সত্যকে যিনি উপলব্ধি করেছেন অথবা মিষ্টি কথার ফুলঝুরি দিয়ে কি আর তাঁকে বিশ্বাস হতে টেনে আনা যায় ?

সুতরাং পিতা এখন পুত্রের প্রতি গড়গহস্ত ।

শোনালেন তাঁর নির্মম সিদ্ধান্তের কথা ।

আমার গৃহে বিধর্মী পুত্রের স্থান নেই ।

এ কী শুনছেন রামমোহন ? এই কি তাঁর স্নেহের পিতা ।

মাতা তারিণী দেবী তখন অন্দরমহলে ।

তিনি ছুটে এলেন ।

না, মাতৃস্নেহে পুত্রকে বুকে তুলে নিতে নয়, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি বুলিয়ে পুত্রকে সান্ত্বনা দিতে নয় । শোনাতে আর একটি মর্মদাহী ধিক্কার বাণী ।

আমি জানব আমার ছেলে মরে গেছে, তবু তোমার মত ধর্মত্যাগী কুপুত্রকে নিয়ে আমি ঘর করতে পারব না ।

শেষ কথা জানালেন ওঁরা ।

ঘটল পিতা পুত্রের মধ্যে বিচ্ছেদ ।

বিচ্ছেদ তো হিন্দুসমাজের সমাজ শিরোমণিদের সঙ্গেও ।

সুতরাং রাধানগর আর রামমোহনের জন্য নয় ।

তা হোক রামমোহন !

নাইবা রাখল তোমায় রাধানগর বুকে ধরে ।

তোমার ঘর কি ক্ষুদ্র সীমায় বাঁধা পড়ে ? না বাঁধা পড়তে পারে ? সব ঠাঁয়ে যে তোমার ঘর রয়েছে রামমোহন ।

তুমি যে ভারত পথিক !

তোমাকে যে ডেকেছে সারা ভারতবর্ষ ।

ক্ষুদ্র রাধানগরের গণ্ডি তোমায় কি দেবে ?

গৃহত্যাগ করলেন রামমোহন ।

ঘরে পড়ে রইল বালিকা বধূ ।

এও এক বিচিত্র পরিহাস রামমোহনের ভাগ্যের সঙ্গে ।

পরিহাস ছাড়া আর কি ?

যিনি সমাজ সংস্কারক হয়ে বহু বিবাহের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চালালেন তাঁরই একটি দুইটি নয় তিনটি বিবাহ । হ্যাঁ, অত্যন্ত অল্প বয়সেই রামকান্ত

বিয়ে দিয়েছিলেন রামমোহনের।

প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয় তখন রামমোহনের বয়স নয়। আট বৎসরের বালক রামমোহন বিয়ে করে এনেছিলেন যাকে তাকে এক বছর পরেই ইহলোকে ছেড়ে পাড়ি দিতে হয় পরলোকের উদ্দেশ্যে।

সুতরাং পরবৎসর তার আবার বিবাহ হয়। শ্রীমতী দেবী দ্বিতীয়া হয়েও রামমোহনের সংসারে পরিচিত হলেন বড়বৌ হিসেবে, তার তৃতীয়া স্ত্রী উমাদেবী —তিনি ছোট বৌ।

কিন্তু ঘরের প্রতি আজ আর রামমোহনের কোন আকর্ষণ নেই।

সমাজ শিরোমণিদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দি'তেই হবে, তাদের ধর্ম বিশ্বাস কত ভ্রান্ত। পিতামাতার ভুলও সংশোধন করতে হবে তাঁকেই। ভুল বুঝেছেন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনও।

রামমোহন তো নিজেই লিখেছেন সে কথা: "ষোড়শ বৎসর বয়সে আমি হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। উক্ত বিষয়ে আমার মতামত এবং ঐ পুস্তকের কথা সকলে জ্ঞাত হওয়ায় আমার একান্ত আত্মীয়দিগের সহিত আমার মনান্তর উপস্থিত হইল।"

সুতরাং ?

সুতরাং ঘর ছাড়লেন রামমোহন।

উদ্দেশ্য ?

উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিভ্রমণ। ভারতবর্ষের নানা স্থানের আচার ব্যবহার, ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া।

দীর্ঘ চার বৎসর ধরে রামমোহন ক্রমাগত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন দেশ হতে দেশান্তরে।

ভারতের প্রকৃত পরিচয় তাকে পেতে হবে।

জানতে হবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত হিন্দুধর্মের শাখার মধ্যে কি রয়েছে।

সে সময় তো যানবাহনের এমন সুব্যবস্থা হয় নি, সুতরাং পর্যটক হিসেবে দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ানো কি কম শক্তির কথা? দৈহিক শক্তিও যেমন প্রয়োজন তেমন প্রয়োজন যে মানসিক শক্তিরও।

নানাদেশ ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত এলেন ভারতের উত্তরে।

বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ পাঠ করলেন রামমোহন।

আস্থা ফিরে পাচ্ছেন তিনি।

সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম্মের অন্যতম কেন্দ্রস্থল তিব্বতে তাঁকে যেতেই হবে।

হোক না কেন তিব্বতের পথ দুর্গম।

তিনি তো বিদ্রোহী।

আর বিদ্রোহী যিনি তিনি তো দুঃসাহসী হবেনই।

ইচ্ছাশক্তি বাড়ালেন রামমোহন।

তিব্বত তাঁকে যেতেই হবে।

সুযোগও এল।

পেলেন সঙ্গী হিসাবে তিব্বতগামী একদল অভিযাত্রীকে। কিন্তু ওদের ধর্ম্মের গোঁড়ামীকে মেনে নিতে পারলেন না, প্রবৃত্ত হলেন তর্কে। ওঁরা কিন্তু ভাল চোখে নিতে পারল না রামমোহনের এই তর্ক করার প্রবৃত্তিটিকে, তাঁরা ভাবলেন নাস্তিক। আর একজন নাস্তিককে দলে আশ্রয় দেওয়ার অর্থই নিজেদের কবর খোঁড়া। সুতরাং হঠাও রামমোহনকে।

রামমোহন দল ছাড়লেন।

কিন্তু ইচ্ছায় নয়।

আর সেই ইচ্ছাশক্তিকে রূপ দিতে তিনি দুর্গম নিলগিরি উলঙ্ঘন করে, দুর্গম পথের অবর্ণনীয় কষ্টকে স্বীকার করে অবশেষে পৌঁছলেন তিব্বতে।

কিন্তু এ কি!

এখানেও অবতারবাদ—লামাপ্রথা।

রামমোহনের বিদ্রোহের নেশায় ঘৃতাহুতিই হল।

ঘোরতর নিন্দা করলেন তিনি এ প্রথার।

কেনই বা করবেন না।

ভারতের সর্বত্র পুতুল পূজার বাহুল্য লক্ষ্য করে সংস্কারবর্জিত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রণালীকে প্রত্যক্ষ করতেই তো তিনি এসেছেন লামার দেশে—এসেছেন তিব্বতে মানুষ পূজা দেখে তাই রামমোহন আজ বিস্ময়ে হতবাক, রামমোহন তাই ক্ষুব্ধ।

কিন্তু তিনি যে ধর্ম্ম-সংস্কারক।

সুতরাং ছ'বছর ধরে তিব্বতে থেকে তিনি প্রাণপণে নিন্দা করতে লাগলেন লামাপ্রথার!

আর তাতে তাঁকে যে বিপদে পড়তে হবে—একথা তো তিনিও জানতেন।

তবু কিন্তু জীবন বিপন্ন করেও তিনি তাঁর লক্ষ্যচ্যুত হলেন না।

আসলে হিন্দুধর্ম তথা বৌদ্ধ ধর্ম্মের দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা দেখে রামমোহন খুব দুঃখ পেয়েছিলেন।

রামমোহন শোনালেন নূতন কথা, লামা ভগবান নয়। যে মানুষ নিজেকে ভগবান ভেবে সর্বসমক্ষে জাহির করতে চায় সে কখনই ভগবান পদবাচ্য হতে পারে না। ভগবান নিরাকার। তিনি উপলব্ধির সামগ্রী, তাকে দৃষ্টি শক্তির সাহায্যে দেখা যায় না। সুতরাং লামা পারিত্যাজ্য।

হৈ হৈ করে উঠল সারা তিব্বত।

লামার অপমান।

এ তিব্বতবাসীর অপমান।

সুতরাং রামমোহনকে তাদের চাই। রামমোহন লামাকে অর্পমান করার প্রতিফল পেতেই হবে, আর তা জীবনের।

তিব্বতেরই এক গৃহবধুর সহায়তায় তিনি পালালেন।

না, মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে নয়।

কিন্তু রামমোহন সেদিনই বুঝেছিলেন ধর্ম্ম সংস্কারের যে ব্রত তিনি নিয়েছেন সে ব্রত উদ্‌যাপন করতে তাঁকে বেঁচে থাকতেই হবে।

সুতরাং তিব্বতে আর নয়।

আবার তিনি রওনা হলেন ভারতের অভিমুখে।

ভারতবর্ষ তাকে ডাকছে।

ডাকছে অসহায় ভারতবাসী। তাঁর মানসচক্ষে প্রতিফলিত হয়ে উঠল ভারতের অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি।

জন্মভূমি বাংলাকে তিনি আশৈশব দেখেছেন, আর আজ দেখলেন সারা ভারতবর্ষ।

এ যে একই ধারা।

সামাজিক জীবন, ধর্মনীতিক জীবন, সবই যে একই খাতে বয়ে চলেছে।

বাংলাদেশেই তো শুধু মাত্র অন্ধকার কুসংস্কার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে নেই—কুসংস্কারের অন্ধকার যে তার পক্ষপুট বিস্তার করেছে বাংলা দেশের বাইরেও—ভারতবর্ষের এ প্রান্তে, ও প্রান্তে—সর্বত্র।

রামমোহন ফিরে এলেন রাধানগরে। চার বছরের অজ্ঞাতবাস সমাপনান্তে।

সঙ্গে নিয়ে এলেন প্রবাস জীবন যাপনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার পুঁজি।

রাধানগরে এসে জানতে পারলেন পিতা রামকান্ত রাধানগর ছেড়ে লাঙ্গুল পাড়ায় নতুন বাড়ী তৈরী করিয়েছেন ।

সেখানেই বনবাস করছেন ।

রামমোহনরা এলেন লাঙ্গুল পাড়ায় ।

পিতা পুত্রকে সাদর স্নেহে সিক্ত করলেন । হয়তো বা ভেবেছিলেন এই চার বছরে রামমোহন চিন্তাধারা পরিবর্তিত হয়েছে ।

কিন্তু সে যে কত ভুল ধারণা রামমোহন সম্বন্ধে করলেন পিতা রামকান্ত বুঝতে পারেননি সেদিন ।

বুঝতে পারলেন বেশ কয়েকটা দিনের মধ্যেই ।

দীর্ঘ কয়েকটা বছরের ব্যবধানে রামমোহন কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা সম্পর্কে মত পাল্টে এসেছেন এমন ধারণা পিতার হল কি করে ?

তিনি কি ছেলেকে চিনতেন না ? না, হঠাৎ স্নেহান্ধে পুত্রের মানসিকতা সম্পর্কে একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন ।

হয়তো বা সেটাই স্বাভাবিক ।

কিন্তু কোন ভুল নেই, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে রামমোহন তখন আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ।

এখন বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রচার করতে চান নিজের মতবাদ ।

সুতরাং সংঘর্ষ অনিবার্য ।

ছয়মাস ধরে চলল পিতার অন্তর্দ্বন্দ্ব ।

তারপর স্থির সিদ্ধান্তে অটল হলেন পিতা রামকান্ত ।

ঘরে ঠাঁই নেই এমন পুত্রের ।

বহিষ্কৃত হলেন রামমোহন ।

কুলাঙ্গার কালা পাহাড় পুত্রকে নিয়ে ঘর করা চলে না কোন ক্রমেই, এটুকু বুঝেছিলেন পিতামাতা দুজনেই ।

যদি তা হয় তাহলেও সত্যি করে বল তো রামকান্ত, তুমিও বল তারিণীদেবী, তোমরা দুজনেই কি একটি দিনের জন্যেও তোমাদের গৃহদেবতার কাছে অশ্রু বিসর্জন করনি ? একটি দিনের জন্যও কি পুত্র হাহাকার তোমাদের মনকে গভীর ভাবে নাড়া দেয় নি ? একবারও কি চাওনি পুত্র ফিরে আসুক ? তোমাদের কোল জুড়ে থাক্ ।

চেয়েছিলে ?

কিন্তু পরিবারের বিশেষতঃ রায় পরিবারের সুনাম বা বংশমর্যাদার প্রতিষ্ঠাকে বিন্দুমাত্র বিসর্জন দিতে পারলে না। আর পারলে না বলেই বোধ হয় রামমোহনকে সোজা বাইরের পথ দেখিয়ে দিলে। বললে, বৌকে সঙ্গে নাও। ওদের দায়িত্বও তা আমরা নেব কেন?

চমৎকার !

রামমোহন না হয় তোমাদের ভাষায় কালাপাহাড়, কুলাঙ্গার।

কিন্তু তোমাদের গৃহবধূরা কোন্ দোষে দোষী সাব্যস্ত হল ?

না, মনে মনে ভাবলে রামমোহনকে একটু বেকায়দায় ফেললে হয়তো বা রামমোহন আর ধর্মের বিরুদ্ধে এমন জোর গলায় আপন মত প্রচার করতে পারবে না।

কোন্‌টা ঠিক ?

হয়তো বা দ্বিতীয়টাই।

কিন্তু আত্মবিশ্বাসী স্থিতধী রামমোহনকে টলাতে পারলে না বিন্দুমাত্র।

ওখানেই তোমাদের হার স্বীকার করতে হল।

হেরে গেলে তোমরা।

পথে বের হলেন রামমোহন, সঙ্গে দুই স্ত্রী।

জীবনপথ ও লক্ষ্য রামমোহন ঠিক করে নিয়েছেন।

যাত্রা শুরু করলেন কাশী অভিমুখে।

পৌছালেন কাশী।

আবার পড়াশোনা, আবার জ্ঞান সংগ্রহ।

যে ছমাস লাঙ্গুলপাড়ায় ছিলেন সেই সময়েই স্মৃতি, পুরাণ আয়ত্ত করেছিলেন। এবারে আয়ত্তের পালা বেদ-বেদান্ত।

ওগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখাতে চান রামমোহন।

তাঁর জানার ভুল কোথায় ? খুঁজে বের করতেই হবে। আর যদি তিনি ভুল না করে থাকেন তাহলে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করবেনই।

কিন্তু শুধু শাস্ত্র আলোচনায় মন ভরলেও পেট তো তা মানে না।

তাছাড়া তিনি তো কাশীতে একা নন।

সপরিবারে রয়েছেন।

ওদের কথাও ভাবতে হয় !

আরও একজন এসেছে এই দুঃখের সংসারে।

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ।

রামকান্ত জানতে পেরেছেন পুত্রের সংসারের অবস্থা, শুনতে পেয়েছেন রাধাপ্রসাদের জন্মবৃত্তান্তেও।

চঞ্চল হয়ে উঠলেন রামকান্ত।

কিছু আর্থিক সাহায্য করতে চাইলেন রামকান্ত।

কিন্তু রামমোহন কি তেমন ছেলে?

ঘরে যার ঠাঁই হয়নি তার কি পিতার এই আর্থিক সাহায্যের কৃপাটুকু একান্তই দরকার?

প্রয়োজন মনে করলেন না তিনি।

সুতরাং ফিরিয়ে দিলেন পিতার অর্থ সাহায্য।

আত্মবিশ্বাস আছে তাঁর।

আত্মবিশ্বাস যাঁর সম্বল তাঁর অন্য কিছুতে কি এসে যায়?

আসলে তিনি যে তখন স্বাবলম্বী হওয়ার সাধনায় মগ্ন।

শুরু হল ইংরাজী শিক্ষার হাতে খড়ি। আর তা এই কাশীতেই।

রামমোহন তখন বাইশ বছরের যুবক।

আঠার শ'তিন খ্রীষ্টাব্দ। মে মাস।

পিতা অসুস্থ, এ সংবাদ কাশীতে এসে পৌঁছাল।

পিতা অসুস্থ, আর পুত্র কি তার মান অভিমানের ডালা সাজিয়ে দূরে বসে কর্তব্যচ্যুত হয়ে বসে থাকতে পারে!

পারে না।

পারেন নি রামমোহন।

আসলে রামমোহনের হয়তো বা মনে হয়েছিল, লাঙ্গুলপাড়ার বাসায় ফেরা তার অত্যন্ত প্রয়োজন—আর তা না হলে হয়তো বা পিতার সঙ্গে সাক্ষাতকারের আর সময় পাওয়া যাবে না।

সুতরাং দ্বিধা নয়, নয় মিথ্যা সঙ্কোচ আর মান অভিমানের পালা।

রামমোহন ফিরে এলেন। সপরিবারেই।

দাঁড়ালেন পিতার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে।

না, না, বিষয় সম্পত্তির লোভে ফিরে আসেন নি।

কারণ পিতা রামকান্ত তো বহুদিন আগেই বিষয় সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা

করেছিলেন।

রামমোহন তখন কাশীতে।

সুতরাং এ বিষয়ে তাঁর জানার কথা নয়, তিনি জানতেনও না।

পিতা রামকান্ত বিদায় নিলেন এ ধূলার ধরণী ছেড়ে। পা বাড়ালেন অমরাবতীর পথে।

আর তখনই শুরু হল বিষয় সম্পত্তি নিয়ে, অধিকার অনধিকারের প্রশ্ন।

চমৎকার !

রামমোহনকে অধিকার হতে বিচ্যুত করতেই হবে।

কিন্তু পিতা রামকান্ত তো তা চান নি ?

প্রমাণ ?

প্রমাণ রামমোহন কাশীতে থাকতে থাকতেই তো তিনি বিষয় সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন।

সেও তো সতের'শ ছিয়ানব্বই-এর পয়লা ডিসেম্বরের কথা।

লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ী তিনি দিয়েছিলেন। জগমোহন আর রামমোহনকে, হরিরামপুরের তালুক জগমোহন, কোলকাতায় জোড়া সাঁকোর বাড়ী রামমোহন বিগ্রহ ও বর্ধমানের সম্পত্তি রামকান্ত এবং রাধানগরের পৈত্রিকবাড়ীর অংশ পেয়েছিলেন রামমোহন।

পিতা রামমোহনকে যদি সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করতে চাইতেন তবে এমন বণ্টন নামা কখনই তৈরী করতেন না তিনি।

অথচ গৃহকর্ত্রী তারিণী দেবী ? রামমোহনের গর্ভধারিণী ?

তিনি ঘোষণা করলেন, রামমোহন বিধর্মী সুতরাং পৈতৃক সম্পত্তির উপর রামমোহনের অধিকার নেই।

গৃহদেবতাকে সম্মুখে রেখে তারিণী দেবী দেখাশুনা করতে লাগলেন স্বামীর জমিদারী।

রামমোহন স্বতন্ত্র ভাবে পিতৃশ্রাদ্ধ করলেন। মা তারিণী দেবীর সঙ্গে যোগ দিয়ে পারিবারিক শ্রাদ্ধে যোগদানের ইচ্ছে তাঁর হল না।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেল।

রামমোহন পিতার বণ্টনমার ভিত্তিতেই দাবী জানালেন পৈতৃক সম্পত্তির উপর।

মাতা তারিণী দেবী রামমোহনের দাবী মেনে নিতে রাজী নন।

সুতরাং পুত্রের বিরুদ্ধে মাতা দায়ের করলেন মোকদ্দমা।

তা হোক।

রামমোহনও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, মোকদ্দমা তিনি লড়লেন।

না, মায়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে কোন আপোষ নয়।

সম্পত্তির লোভও না।

কেনই বা আপোষে তিনি আসবেন?

তিনি না রামমোহন।

তিনি তো বহু পূর্বেই স্থির করে নিয়েছেন জীবনের লক্ষ্য, নির্বাচন করে নিয়েছেন জীবন পথ।

তাই শেষ পর্যন্ত তিনি সম্পত্তি ফিরে পেলেন, তবে আঠারশ' তিন সালে মৃত্যুর পরই নয়, ফিরে পেলেন আঠারশ' তেইশে পিতার মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বছর পরে।

তার অনেক আগেই শেষ হয়েছে রামমোহনের জীবনের একটা অধ্যায়।

শুরু হল রামমোহনের কর্মজীবন।

উপার্জনের চেষ্টা শুরু করলেন তিনি।

নবাবী-আমল তখন ফুরিয়ে গেছে। অথচ নবাব সরকারে তিন পুরুষ ধরে রায়েরা চাকরী করে আসছিলেন।

এখন যে নতুন যুগ, এখন যে নতুন ব্যবস্থা।

বাংলাদেশে এখন যে কোম্পানীর শাসন।

রামমোহন আরবী ও ফার্সী যা বহু যত্নে আয়ত্ত করেছিলেন এখন তা অকেজো।

নতুন ব্যবস্থায় সর্বত্র ইংরাজী কদর।

বাঙালীর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য ছিল জজ বা কালেক্টরির সেরেস্তাদার বা দেওয়ান হওয়া।

যোগ্যতা থাকলেও এর চেয়ে বেশি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কোন পদ যে তখন বাঙালীর ভাগ্যে জুটত না।

রামমোহনও দেওয়ান হলেন।

কিন্তু না, একদিনে তিনি দেওয়ান হন নি। হয়েছিলেন বহু চেষ্টা ও শ্রমের শেষেই।

সামান্য কেরাণী হিসাবে রামমোহনের কর্মজীবনের শুরু।

রামমোহন অবশ্য প্রথমে চাকরি নিয়েছিলেন উডফোর্ডের অধীনে।

সে অনেক দিন আগে পিতার মৃত্যুর পূর্বে।

পিতার মরণাপন্ন অবস্থায় খবর পেয়ে বাধ্য হয়েই সেদিন চাকুরিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন।

ফিরে এসেছিলেন লাঙ্গুলপাড়ায়।

আর আজ আবার তিনি নতুন করে চাকরি নিলেন জন ডিগবির অধীনে।

জন ডিগবি তখন যশোহরের কালেক্টর।

কেরানি রামমোহন তাঁরই অধীনে রামগড় ও ভাগলপুর হয়ে এলেন রংপুরে।

ডিগবির সাথে পরিচয় হওয়ার সুযোগ রামমোহনের জীবনের একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক।

অথচ কালের পরিণতি দিল ভিন্নরূপ।

প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ঘুচে গেল—একে অপরকে বাঁধলেন বন্ধুত্বের প্রীতি মধুর ডোরে।

রামমোহন তখন দেওয়ানের পদে উন্নীত হয়েছেন।

তাঁর এই উন্নতির পাথেয় হয়েছিল সেদিন দুটি জিনিস—একটি ইংরাজী শিক্ষা অপরটি সততা ?

বাঙালীর সৌভাগ্য, বাঙালীর গৌরব রামমোহন তাঁর চারিত্রিক-দৃঢ়তার জন্যই যেমন দেওয়ান পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তেমনি পেয়েছিলেন ইংরাজ জাতির শ্রদ্ধা।

এ কী কম গৌরবের!

দশ বছর তো রামমোহন দেওয়ান পদে বহাল ছিলেন।

ইচ্ছে করলে রামমোহন এই দশ বছরে কয়েক লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করতে পারতেন।

কিন্তু রামমোহনের জীবনে চাকরি যে ছিল একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

টাকার ওপর তো তাঁর লোভ ছিল না। লোভ ছিল ভাষার উপরে। হ্যাঁ, ইংরাজী ভাষার উপরে। নতুনকালের নতুন যুগের নতুন ভাষা। এ ভাষাকে রপ্ত করতেই হবে।

রামমোহনের চোখমুখে একটা শপথ। একটা দৃঢ়তা।

ভাষা রপ্ত করার সাধনায় মত্ত হয়ে উঠলেন রামমোহন। সিবিলিয়ান জন

ডিগবি লক্ষ্য করলেন রামমোহনের এ আগ্রহ।

সুতরাং স্বয়ং তিনি শিক্ষা দিতে লাগলেন রামমোহনকে ইংরাজী ভাষা।

তাই কালেক্টর সাহেবের বদলীর সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ান রামমোহকে স্থান পরিবর্তন করতে হত।

রামমোহনও কম যায় না। শুধু নেবেন, প্রতিদানে কিছুই দেবেন না, তা কি হয়? না হতে পারে? রামমোহনও ডিগবি সাহেবকে শেখাতে লাগলেন সংস্কৃত।

শুরু হল প্রভু-ভৃত্যের ভাষা শিক্ষার সাধনা।

একজনের সংস্কৃত ভাষা আর অপরজনের ইংরাজী ভাষা।

ডিগবি উপলব্ধি করতে পারলেন খুব শিগ্ গীর, রামমোহন সাধারণ বাঙালী নন, রামমোহন আর দশজনের মত নয়।

রামমোহন খাঁটি ইস্পাত।

সুতরাং আর প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক রেখে ব্যবধান রচনা করা অযৌক্তিক।

উভয়েই হয়ে উঠলেন উভয়ের বন্ধু।

ডিগবির উক্তি সাক্ষী: রামমোহন চাকরি নিলেন ডিগবির অধীনে।

কিন্তু তিনি না পারেন শুদ্ধ ইংরাজী লিখতে না পারেন ইংরাজীতে কথা বলতে।

কিন্তু সেই দেওয়ান ইংরাজী আয়ত্ত করলেন।

প্রতিভাধর রামমোহনের পক্ষে মনোযোগ আর অধ্যবসায়ের সাহায্যে এ ভাষা আয়ত্ব করতে বেগ পেতে হল না কিছুই।

সরকারী চিঠিপত্র পাঠ করে ইংরাজদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে অত্যন্ত সহজেই ইংরাজী ভাষা শিখে ফেলেন রামমোহন।

রংপুর, দিনাজপুর আর পূর্ণিয়া—এ তিন জেলার জরিপ ও কর নির্ধারণের দায়িত্ব এসে পড়েছিল ডিগবির উপর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর এ বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল সবচেয়ে বেশী।

জরিপ ও কর নির্ধারণের কাজ শেষ হ'তে সময়ও লাগে প্রচুর।

ন্যায়পরায়ণ, সুবিচারক, সৎ প্রকৃতির ইংরাজ ডিগবির সঙ্গে আর একজন ন্যায়পরায়ণ সুবিচারক সৎ প্রকৃতির বঙ্গসন্তান রামমোহনের এমন প্রীতিমধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠা তাহলে সম্ভব হত না।

রামমোহন আকৃষ্ট হয়েছিলেন ডিগবির প্রতি তার পেছনে যে মানুষ ডিগবির

মনুষ্যত্ববোধের পূর্ণ সমাবেশের প্রকাশ। এ কথা কী অস্বীকার করা চলে?

সারা জীবন চাকরি করবেন, অর্থ উপার্জ্জন করবেন—রামমোহনের জীবনের উদ্দেশ্য তো এ নয়।

বিধি নির্দিষ্ট একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই যে রামমোহনের এ বোধ রামমোহনের এসেছিল খুব ছোটবেলাতেই এবং সে উদ্দেশ্য, সেই লক্ষ্য হতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি কোনদিনই। তবু চাকরি নিতে হয়েছিল, অর্থ উর্পার্জনের তাগিদেই। গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করার জন্যই। প্রয়োজনকে তো আর অস্বীকার করা চলে না?

রামমোহ লক্ষ্য করলেন তিনি যে অর্থ উপার্জন করেছেন সেই অর্থে অনায়াসেই তিনি বার্ষিক দশ হাজার টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তির মালিক হতে পারেন।

বর্ধমান জেলায় গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুরে দুটো তালুক তিনি কিনে ফেললেন।

তিনি বিশ্বাস করেন তাঁকে অনন্তঃ গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনায় আর বিব্রত হতে হবে না।

সুতরাং অবসর গ্রহণ করলেন চাকরি হতে।

চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করলেন রামমোহন। ফিরে এলেন রাধানগরেই।

রাধানগরে প্রবল প্রতিকূলতাকে গ্রাহ্য করেন না তিনি।

প্রতিকূলতাকে ভেঙ্গে তচ্ নচ্ করে দিয়ে তিনি রাধাপ্রসাদের বিয়ে দিলেন।

কিন্তু স্বগ্রামবাসী রামমোহনকে মেনে নিতে পারলেন না। ওদের ভাষায় রামমোহন ব্রহ্মজ্ঞানী। আর ব্রহ্মজ্ঞানীর স্থান নেই হিন্দু সমাজে।

তারণীদেবী পর্যন্ত একেশ্বরবাদী রামমোহনকে মেনে নিতে পারলেন না। মা হয়ে ছেলেকে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দিতে চাইলেন।

সহ্যের প্রতিমূর্তি তখন রামমোহন।

অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন রামমোহন। রাধানগরে আর নয়।

দুই পত্নী আর নব পুত্রবধুকে নিয়ে রামমোহন চলে এলেন লাঙ্গুলপাড়ায়।

লাঙ্গুলপাড়া রামমোহনকে ঠাঁই দেবে কেন?

এ স্থানও রামকান্তের জমিদারীরই অন্তর্গত।

অতএব রামমোহন লাঙ্গুলপাড়া ছাড়লেন। কিছু দূরের রঘুনাথ পুরের এক

শ্মশানভূমিতে তিনি তৈরী করলেন নতুন বাসভবন। শুরু করলেন বসবাস-এ বাড়ীতেই জন্ম হল কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদের। রাধাপ্রসাদ তখন আঠার বছরের কৈশোরে শেষ সীমায়।

কিন্তু কতদিন আর রঘুনাথপুরে ?

রঘুনাথপুরে বাস করে তিনি জীবনটা সুখে স্বাচ্ছন্দে কাটিয়ে দেবেন বলেই কি সরকারী চাকরিতে ইস্তাফা দিয়ে এলেন ? তা কেন ? শুধু জীবন অতিবাহিত করাই যদি জীবনের লক্ষ্য হয়। তাহলে তার জন্য চাকরিতে ইস্তফা দেওয়া কেন ?

আসলে কিন্তু রামমোহন মনে প্রাণে চেয়েছিলে তাঁর আদর্শকে রূপায়িত করতে।

আর তিনি এটুকুও স্পষ্ট বুঝেছিলেন তাঁর জীবনের আদর্শকে রূপ দিতে গিয়ে চাকুরিতে বহাল থাকা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তেমনি সম্ভব নয় রাধানগর, লাঙ্গুলপাড়া বা রঘুনাথপুরের বাসায় বসবাস করা !

সুতরাং কোলকাতা যেতে হবে, বসবাস করতে হবে সেখানে।

কোলকাতায় এলেন দেওয়ান রামমোহন রায়।

সঙ্গে নিয়ে এলেন অসামান্য শক্তি, অমিত তেজ, প্রবল উৎসাহ।

আঠার শ' পনের খ্রীষ্টাব্দের কথা।

চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছরের পূর্ণ যৌবনের অধিকারী রামমোহন কোলকাতায় এলেন জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করতে অপ্রতুল আশা নিয়েই।

বৈমাত্রের ভ্রাতা রামতনু রায়ের মাণিকতলার বাড়ীতে বাস করতে লাগলেন। রামমোহনের বিশেষ অনুরাগী এই ভায়ের অনুরোধ রাখতেই রামমোহন বসবাস শুরু করলেন মাণিকতলার বাসাতেই।

লোকশিক্ষক রামমোহন কোলকাতা এসেই অনুভব করতে পারলেন বাংলাদেশের সমাজ জীবনের হৃদয় স্পন্দন, লক্ষ্য করলেন হিন্দু সমাজের স্তরে স্তরে সঞ্চিত অজ্ঞানতা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন আলোকবিহীন গাঢ় তমিস্রা

ওরা প্রাচীন ভারতের বেদ উপনিষদের সঙ্গে পরিচিত নন। ব্রাহ্মণ আর পুরোহিতের শাসনতন্ত্রের আওতায় পড়ে ওরা ভুলে গেছেন প্রকৃত ধর্মের মর্মবাণীটিকে। তাই সমাজে দানা বেঁধে উঠেছে জাতিভেদ, মাথা চাড়া দিয়েছে অস্পৃশ্যতা আর তারই ফল স্বরূপ জাতি শতধা বিচ্ছিন্ন। কেনই বা জাতি এমন বিভক্ত হবে না ? আসলে ওরা শাস্ত্র আলোচনা ক্ষরে বটে কিন্তু শাস্ত্রের মর্মকথা

জানার আকাঙ্ক্ষা বা সদিচ্ছা—এই দুইয়ের যে বড় অসদ্ভাব।

কিন্তু ওরা তো মুষ্টিমেয় ? হলই বা মুষ্টিমেয়। বাকী সংখ্যা গরিষ্ঠ যে নিরক্ষর অতএব বিদ্যার দোহাইয়ে সহজেই ওদের শাসন করা চলে, সহজেই ওদের বশীভূত করা যায়।

সুতরাং সমগ্র দেশ, সমস্ত জাতি, সমগ্র সমাজ আজ অজ্ঞ লোভী চরিত্রহীন ও বিদ্যার অহঙ্কারে পুষ্ট ব্রাহ্মণ পুরোহিতের করতলগত।

এমন সমাজে যে বিষময় ফলই পরিলক্ষিত হবে তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

রামমোহনও অবাক হননি।

তিনি শুধু প্রত্যক্ষ করলেন, বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ডে বসে থেকে—বাল্যবিবাহের পরিণতি, কৌলীন্য প্রথার আওতায় রিক্ত নিঃস্ব পিতার অন্তর্দাহী হাহাকার, লক্ষ্য করলেন বাধ্যতামূলক বৈধব্যদশা মানুষকে কি নিদারুণ অন্তর্জালায় পুড়িয়ে মারে। লক্ষ্য সতীদাহপ্রথায় অবাধ পদবিক্ষেপ। অথচ আশ্চর্য্য। মানুষ নির্বিকার। সবাই যেন মুক, সবাই যেন জড় পুতুল সদৃশ।

কিন্তু কেন ? কেন দেশে শিক্ষা নাই, সুশাসন নাই, নাই জন সাধারণের মঙ্গলের জন্য কোন সংস্কারের প্রচেষ্টা নাই কেন, কেন ? রামমোহন এর কারণ অনুধাবন করতে গিয়ে খুব সহজেই বুঝতে পারলেন দেশের ইংরাজ শাসকই এর জন্য দায়ী ! কেনই বা শাসক সম্প্রদায়ের কাঁধে এর দায় আর দায়িত্ব এসে বর্তাবে না ? সমাজে ও দেশে অনিশ্চিত উচ্ছৃঙ্খল রাজনৈতিক অবস্থা এনে দিল কে ? শুধু বাণিজ্য বিস্তার আর অর্থ উপার্জ্জনের ধান্ধায় থেকে দেশ শাসন করলে কি জনগণের মন ছোঁয়া যায় ? যায় না। রামমোহন তা বুঝেছিলেন।

আর বুঝেছিল বলেই দেখেছিলেন সম্মুখে বিশাল কর্মক্ষেত্র। জাতির ধর্ম বাঁচাতে হবে, মূঢ় ম্লান মুখে ভাষা দিতে হ'বে সাহিত্য রাজনীতি অর্থনীতিতে জাতিকে সচেতন করে তুলতে হবে, রক্ষা করতে হবে নারীর অধিকার, নারীকে তার ভাগ্য জয় করার ব্রতে উজ্জীবিত করে তুলতেই হ'বে।

সুতরাং আর দেরী নয়, বৃথা নয় কালক্ষেপ। কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যুগ সারথী রামমোহন।

রামমোহন একেশ্বরবাদী। আর তাই রামমোহন ধর্মসংস্কার সাধনে পদক্ষেও ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। হিন্দুশাস্ত্র গভীর মনযোগের সঙ্গে পাঠ করলেন

খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রও। পরিশেষে বের হলেন পরিব্রাজক রূপে।

ভারত পরিভ্রমণে বেরিয়ে এলেন তিব্বতে। আর এখানেই তাঁর বৌদ্ধ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ সম্ভবপর হল। হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভের ফলেই রামমোহনের মনে জন্ম নিল একেশ্বরবাদের।

কিন্তু এই একেশ্বরবাদের। মর্মাবাণীটি কি?

রামমোহন রচিত সঙ্গীতই বহন করে চলেছে তাঁর প্রচারিত একেশ্বরবাদের মর্মবাণী।

রামমোহন কোনদিনই অপরিপক্কজ্ঞানকে প্রশ্রয় দেননি, প্রশ্রয় দেননি সাধারণ ভাবাবেগকে। তাই তাঁর পক্ষে অদ্বৈত বাদ অনুভব এবং প্রচার করা অসম্ভব হয় নি।

প্রচলিত উপাসনা মূল্যহীন। রামমোহন ঘোষণা করলেন এ কথা।

এ কথা শুধু তাঁর কথার কথাই নয়, মর্মোপলব্ধি সত্য।

কিন্তু এতকালের প্রচলিত সংস্কারে বিশ্বাসী হিন্দুধর্ম উপাসকের কাছে এ তো নির্মম কথা। যত নির্মমই হোক না কেন এ কথাও তো সত্য আর কোন হিন্দু ধর্মসংস্কারক না হিন্দু ধর্মসাধক রামমোহনের মতো এমন সরবে ঘোষণা করতে পারেন নি তাঁদের বিশ্বাসের কথা।

রামমোহনের পূর্বেও তো একেশ্বরবাদী সাধকের উদ্ভব হয়েছিল কিন্তু রামমোহনের মত আপন বিশ্বাস প্রচার করার মতো ক্ষমতা ছিল তাঁদের কোথায়? কে পেরেছেন তাঁর মত অতীত বা বর্তমান প্রীতির বদলে বিচার বুদ্ধির মন্ত্র দান করতে?

অবশ্য এ কথাও সত্য তাঁর মন্ত্র তেমন সমাদর পায়নি।

নাই বা পেল সমাদর, তা বলে রামমোহনের প্রচারিত মন্ত্র তো আর মিথ্যে নয়। তিনি এককে আবিষ্কার করেছিলেন সমস্ত আবরণের আচ্ছাদন সরিয়ে—কুসংস্কার আবরণ; প্রচলিত বিশ্বাসের আবরণ।

রামমোহনকে বিশ্বমানবতার উপলব্ধি ছাড়া আর প্রচলিত ধর্ম সংস্কার উপলব্ধি সম্ভব নয়। কারণ সকল ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা শেষেই তো রামমোহন বিশ্বমানবতার সন্ধান পেতে সমর্থ হয়েছিলেন। রামমোহনের এই উপলব্ধি বিশ্বমানবতার প্রচার বৈপ্লবিক পদক্ষেপ মাত্র। আঠার শ' ষোল খ্রীষ্টাব্দের কথা

রামমোহন এখন কোলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা।

ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায় এসেছেন রামমোহনের সঙ্গেই।

রামমোহনের প্রথম শিষ্য ।

কোলকাতায় এসেই রামমোহন যুদ্ধ ঘোষণা করলেন । এ যুদ্ধ পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, এ যুদ্ধ উপধর্মের বিরুদ্ধে ।

যুদ্ধ চলল দীর্ঘকাল । প্রায় সাত বৎসর ।

একদিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও পুরোহিত সম্প্রদায় যেমন তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়াল, তেমনি অন্য দিকে সৃষ্টি হল আরও এক শত্রু মৌলবী মোল্লার দল' গোঁড়া পাদ্রী পর্যন্ত ।

কোলকাতার সংরক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সমাজপতি রাধাকান্ত দেব বিরোধিতা করলেন রামমোহনের । কেনই বা করবেন না ? এই তো তাঁর স্বভাব ! প্রথম জীবনে রামমোহন পরবর্তী জীবনে বিদ্যাসাগর—কাউকে বাদ দিতে পারলেন না রাধাকান্ত দেব ।

কিন্তু রাধাকান্তদেব সেদিন বুঝতে পারেন নি, ভাড়াটে পণ্ডিত দিয়ে যতই ঘোষণা করুন না, রামমোহন সমাজদ্রোহী, রামমোহন ঘোরতর পাষণ্ড, রামমোহনের ধর্ম খৃষ্টীয় ধর্মেরই এক নগ্ন সংস্করণ মাত্র, তবু রামমোহনের পাশে যারা সেদিন মিত্রতার হাত বাড়িয়ে দিলেন কেউই গুটিয়ে নেন নি সেই প্রসারিত হাত ।

রামমোহনের গভীর পাণ্ডিত্য, তাঁর আলোক সামান্য প্রতিভা ও মধুর ব্যক্তিত্বই সেদিন আকৃষ্ট করেছিলেন তদানীন্তন বহু সম্ভ্রান্ত মানুষকে । যাঁরা নিয়মিতভাবে আসতেন মানিকতলায় । কেউবা শাস্ত্র আলোচনার জন্য, কেউ বা বৈষয়িক বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের ইচ্ছা নিয়েই, আরও দুজন আসতেন রামমোহনের কাছে । ওরা বিদেশী । একজন শ্রীরামপুরের উইলিয়ম কেরী আর অপরজন ডেভিড হেয়ার । একজন আধ্যাত্মিক আলোচনার জন্য আসতেন, আর অন্যজন ইংরাজী শিক্ষা প্রসার প্রচার কল্পে ।

বেদ ও বেদান্তের চর্চা তখন বাংলাদেশের লুপ্ত ।

রামমোহনের সংগ্রাম শুরু হ'ল বেদ বেদান্তরকে দিয়েই ।

বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম তিনিই বেদান্তের ব্যাখ্যা প্রচার করলেন ।

রামমোহনের প্রতিভার অভ্যুজ্জল নিদর্শন হিসেবে প্রকাশিত হল বেদান্ত গ্রন্থ বাংলা অক্ষরে ছাপা হয় আঠার শ' পনের খ্রীষ্টাব্দে ।

এ বেদান্ত গ্রন্থে তিনি কোথাও হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করেন নি। আঘাত দিয়েছিলেন অপধর্ম আর উপশাস্ত্রকে। আঘাত করেছিলেন পুরোহিত, মোল্লা আর পাদ্রীর দলকে।

সেদিন যে আঘাতের প্রয়োজন ছিল একথাও তো সর্বতোভাবে সত্য। তা না হলে সাইন্স অফ রিলিজিয়ান প্রতিষ্ঠা সম্ভব হত কি করে ?

ধর্ম কল্পনার মানুষ নয় অলৌকিক তত্ত্বে ঠাসা নয়। ধর্ম যে যুক্তি গ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপায় দাঁড়াতে পারে সে কথা সে প্রমান করলেন তিনিই রামমোহন নিজেই লিখেছেন :

"আমি ব্রহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বিবেক ও সরলতার নির্দেশে যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে আমার প্রবল কুসংস্কারচ্ছন্ন আত্মীয়গণের তিরস্কার ক্রমে সঞ্চিত হইয়া যত বড়ই হউক না কেন, আমি এই বিশ্বাসে ধীর ভাবে সমস্ত সহ্য করিতে পারি যে, একদিন আসবি, যখন আমার এই সামান্য চেষ্টা লোকে ন্যায় দৃষ্টিতে দেখিবে, হয়ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্বাকার করিবে। লোকে যাহাই বলুক না কেন, এই সান্তনা হইতে আমাকে কেহই বঞ্চিত করিতে পারিবেন না যে, আমার আন্তরিক অভিপ্রায়গুলি সেই পুরুষের নিকট গ্রাহ্য' যিনি গোপনে দেখিয়া পুরস্কৃত

রামমোহনের ছিল আত্মবিশ্বাস, ছিল আরিকতা, ছিল নিন্দাকে অগ্রাহ্য করার মত বিপুল ক্ষমতা

কিন্তু আমাদেরও ঋণ বেড়েছে রামমোহনের কাছে তার কি করতে পারলাম।

আঠার শ' উনিশ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ডিসেম্বর মাস।

বড় বাজারের বিহারেলাল চৌবের বাড়ী

মাদ্রাজের বিখ্যাত পণ্ডিত সুব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হলেন রামমোহন।

শাস্ত্রজ্ঞানে পাণ্ডিত্য তখন সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীও কম যান না।

সারা ভারত জুড়ে তাঁর নাম ডাক।

চৌবের বাড়িতে বসল বিচারসভা।

এদিকে শাস্ত্রী অন্যদিকে রামমোহন।

সাক্ষী ছিলেন সেদিন হিন্দু সমাজের বড় বড় প্রতিনিধিরাই।

পরিচছন্ন রাজকীয় পোষাকে বিভূষিত শালপ্রান্ত রামমোহন সভায় প্রবেশ

করলেন।

শুরু হল বাক্‌যুদ্ধ।

হয়তো বা আবার অতীত ফিরে এল মণ্ডণ মিশ্রের সঙ্গে আচার্য শঙ্করের বিতর্কের প্রতিচ্ছবি, হয়তো বা শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে প্রকাশানন্দের তর্কেরই প্রতিরূপ

সুব্রহ্মণ্য বিচার উত্থাপনা করলেন, তাঁর বক্তব্য বেদ বর্জিতের কোন অধিকার নেই ব্রহ্মজ্ঞানে।

রামমোন উত্তর দিলেন সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, ইংরাজীতে।

রামমোহন সর্বসমক্ষে রাখলেন তাঁর অকাট্য যুক্তি, শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী নির্বাক। কোথায় তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান? তিনি পরাজয় স্বীকার করলেন নতমস্তকে।

আর ভারতের সমানে একটা নতুন দিকের উদ্ঘাটন ঘটল—বাঙালির প্রতিভার উদ্ঘাটন।

বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিল রামমোহনকে অনেকবারই কখনও বা তাঁর প্রতিপক্ষ হয়েছিলেন পণ্ডিত, কখনও বা গোস্বামী, কখনও ভট্টাচার্য, কখনও পাদ্রী ধর্মযাজক কিন্তু দুর্ভাগা ওদের। বারবার ওরা পরাজিত হয়েছিলেন রামমোহনের কাছে। রামমোহন উড়িয়েছিলেন বিজয়কেতন। সেদিন কিন্তু রামমোহনের সম্বল ছিল তাঁর প্রতিভা, তাঁর জ্ঞান তাঁর যুক্তি। আর এগুলিকেই সম্বল করে রামমোহন সহজেই নিয়ে' এলেন যুগান্তর—ধর্ম সংস্কারের ক্ষেত্রে যুগান্তর।

তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকা ইণ্ডিয়া গেজেট রামমোহন সম্পর্কে লিখেছিল: "তাঁহার এইসব গ্রন্থ ও বিচার হইতে ইহার প্রতিপন্ন হয় যে, ধর্ম বিষয়ে তর্কযুদ্ধ তিনি একজন বিপুল যোদ্ধা এবং এদেশে তাঁহার সমতুল্য আর কেউ নেই।"

১৮২১ সালের জুলাই মাস।

সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হল শ্রীরামপুরের জনৈক মিশনারি লিখিত একটি প্রবন্ধ। হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রকে কটাক্ষ করে লেখা এ প্রবন্ধ।

হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিহীনতা।

পাদ্রী সাহেবদের ধৃষ্টতায় রামমোহন বিস্ময়ে হতবাক।

বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, পাতঞ্জল, সাংখ্য পুরাণ—সর্বশাস্ত্রে যেন পাদ্রী সাহেবদের অগাধ অধিকার। সুতরাং তাঁদের দৃষ্টিতে ওগুলো ভ্রান্ত। ওগুলো মূল্যহীন অতএব ধুলিস্মাৎ কর ওগুলোকে।

রামমোহন মেনে নিতে পারে না ওদের এই ঔদ্ধত্য।

সুতরাং যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন রামমোহন।

একটা প্রতিবাদ তিনি জানালেন লিখিতভাবে। আর তা প্রকাশের জন্য পাঠালেন ওদের পত্রিকায়।

কিন্তু পত্রিকা সম্পাদক এ লেখা প্রকাশ করতে রাজী নন। প্রকাশ করলেনও না। কেনই বা করবেন? স্বার্থে আঘাত দিতে আর কেই বা রাজী থাকেন?

এলেন রামমোহন শুধুমাত্র ওদের ঐ শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের শত্রু রূপেই পরিগণিত হলেন।

কিন্তু নিরস্ত করবেন রামমোহনকে এমন শক্তি এদের কোথায়!

"ব্রাহ্মণ সেবধি" নাম দিয়ে নতুন পত্রিকা প্রকাশ করবেন তিনি—দ্বি-ভাষা পত্রিকা। বাংলা ও ইংরাজ এই দুই ভাষাতেই পত্রিকায় বিষয়বস্তু ছাপা হল। পত্রিকা চালালেন তিনি প্রায় একবছর।

তারপর একদিন এর প্রয়োজনও ফুরোল।

দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশের পর রামমোহন বন্ধ করে দিলেন এ পত্রিকা।

রামমোহন পর্যুদস্ত করলেন পাদ্রীদের।

প্রমাদ গুণলেন ওঁরা।

এগিয়ে এলেন তৎকালীন কোলকাতার উচ্চপদস্থ খৃস্টীয় ধর্ম-যাজক বিশপ মিডলটান। তুলে-রামমোহনের সম্মুখে বৈষয়িক সুখের প্রলোভন।

ওঁরা সেদিন ভেবেছিলেন রামমোহনকে ধর্মান্তরিক করতে পারলে তাঁদের ধর্ম প্রচারের রথ অব্যাহত গতিতে ছুটে চলবে।

সুতরাং মিডলটান চাইলে রামমোহনকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষা দিতে।

রামমোহনকে কি অত সহজ সুখের লোভ দেখিয়ে বাঁধা যায়?

তার প্রমাণ স্বেচ্ছায় তো তিনি বহু বৈষয়িক সুখের সম্ভাবনা ছেড়ে দিয়েছেন বহুবারই।

রামমোহন জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মের অপরাহ্নে হাজির হলেন এ্যাডামের বাসগৃহে।

রামমোহন তখন উত্তেজিত।

অবাক হলেন এ্যাডাম তার ভয়ও হল রামমোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে।

রামমোহন অনুমতি চাইলেন এ্যাডামের কাছে। এ অনুমতি গায়ের উপরের আচ্ছাদন উন্মোচনে।

আচ্ছাদন উন্মোচন করে হঠাৎ 'জল! জল!' বলে চীৎকার করে উঠলেন তিনি।

জল এল। পান করলেন রামমোহন।

এখন কথঞ্চিৎ শান্ত।

তারপর ধীর কণ্ঠে বললেন, বিশপ মিডলটন আমাকে পদের লোভ দোখয়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বলেছেন। ছি! ছি! এত ছোটলোক আমাকে ভাবল কি করে?

রামমোহন আর কোন দিন মিডলটনের মুখ দেখন নি।

কোলকাতায় আসার পর একটা বছর ফুরিয়ে গেল দেখতে দেখতে।

মানিকতলার বাসায় তিনি আত্মীয় সভা স্থাপন করলেন।

এই সভাই ঘোষণা করল নবজাগরণ।

আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন, জ্ঞান ও ধর্ম প্রচার, লোকমত গঠনের উদ্দেশ্য নিয়েই স্থাপিত এ সভা।

এ সভাই পরিচিত হল ব্রাহ্মসমাজ নামে।

রামমোহন শুধু ধর্ম সংস্কারক নন, তিনি সমাজ সংস্কারকও।

রামমোহনের দৃষ্টি পড়েছিল সমাজের পঞ্চবিধ কুসংস্কারের উপর—জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ।

সতীদাহকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলনের সৃষ্টি করলেন রামমোহন তা সমাজ বিপ্লব বৈ অন্য কিছু নয়।

সমাজ বিপ্লবের সেদিন হয়েছিল সূত্রপাত। আর আজও সেই বিপ্লবের জের টেনে চলা। এর যেন বিরাম নেই। শেষ নেই।

তাই শেষ পর্যন্ত আইন পাশ হয়েছিল আঠার শ' উনত্রিশ সালে। আইন করে শেষ পর্যন্ত রদ করা সম্ভবপর হয়েছিল সতীদাহ প্রথা। রামমোহনের স্বপ্ন, তাঁর সাধনা ব্যর্থ হয় নি। ব্যর্থ হওয়ার নয়।

চেতনার মশাল জ্বালালেন রামমোহন। পথ দেখালেন দেশবাসীকে। বোঝালেন শিক্ষা ব্যতিরেকে দেশের দুর্গতি ও দৈন্যদশার কখনই মোচন হতে পারে না।

জাতির সামাজিক ও নৈতিক বিকাশ প্রয়োজন। রামমোহন বুঝেছিলেন সে কথা। আর এও বুঝেছিলেন তা শুধু মাত্র ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে সম্ভব নয়।

প্রয়োজন অজ্ঞানতা আর কুসংস্কার হতে মুক্তির। কিন্তু এ অভিপ্রেত মুক্তি কি টোল, চতুষ্পাঠি পাঠশালা বা মক্তব এনে দিতে পারে ?

রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন, পারে না।

নতুন যুগের ভোরে চাই নতুন শিক্ষা—চাই ইংরাজী শিক্ষা।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয় থাকবে না এ কথা রামমোহন ভাবতে পারেন নি।

কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষে এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয় স্থাপন করতে হলে যে ? চাই ইংরাজী শিক্ষা।

সুতরাং ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য রামমোহন বড় বেশী উদগ্রীব হয়ে উঠলেন।

নতুন যুগ। এই যুগের বাঙালির সামনে রামমোহন রাখলেন নতুন কথা।

এই মুক্তি যুগের মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন রামমোহন।

না শুধু স্কুল স্থাপন করে, হেয়ার সাহেব বা ডাফ সাহেবকে সাহায্য করে, উইসটেস কেরীকে স্কুল স্থাপনের জন্য জমি দিয়ে, বা ভারত সরকারকে শিক্ষা নীতি সম্পর্কে কিছু থেমোরাণ্ডা দিয়েই তিনি তার কর্তব্যের শেষ ঘোষণা করলেন না।

আসলে শিক্ষা প্রসার প্রচার তাঁর জীবনের ধ্যানে ধারণা হয়ে উঠল।

শিক্ষা বিলাস সামগ্রী নয়, শিক্ষা জাতিকে আপন মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে—আর তা সম্ভব পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই।

ইংরাজদের সঙ্গে জীবনযুদ্ধে লড়ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে আয়ত্ত না করেই এ কী কখনও সম্ভব ?

সম্ভব নয় বলেই রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষানুরাগী উঠেছিলেন আর এ অনুরাগ জাতিকে বাঁচানোর জন্যই—জাতির জীবন রক্ষার জন্যই।

বাংলাদেশে দুর্গতির ভারে জর্জরিত।

কিন্তু ইতিহাস বারংবার রচিত হয়েছে বাংলাদেশেই !

নতুন করে ইতিহাস রচনার দায়িত্ব নিয়ে এলেন সাগর পার হ'তে ডেভিড হেয়ার।

ঘড়ির ব্যবসায়ী ডেভিড হেয়ার এলেন ঘড়ির ব্যবসা করার উদ্দেশ্য নিয়ে। অর্থ উপার্জনও করলেন প্রচুর।

কিন্তু স্বদেশ স্কটল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন না তিনি।

অথচ তিনি যদি অর্থ উপার্জ্জন করেই স্বদেশে পাড়ি জমাতেন কার কি বলার ছিল ? কিন্তু না, অর্থের প্রতি মোহ তাঁর কোনদিন ছিল না।

তাই এদেশে উপার্জিত অর্থে তিনি চাইলেন এদেশের মানুষের মঙ্গল করতে, কল্যাণ করতে।

পরিশেষে তাই দারিদ্র্য বরণ করতে তাঁর দ্বিধা এল না বিন্দুমাত্র।

এদেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের দিকে নজর দিলেন তিনি।

রামমোহন আর হেয়ার উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল হেয়ার কোলকাতায় আসার কিছু দিনের মধ্যে।

রামমোহনের মাণিকতলার বাসায় হেয়ার প্রায়ই আসতেন। শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা হত উভয়ের মধ্যে।

সেই হেয়ার প্রথমে রাজা রামমোহনের কাছে একটা ভাল প্রণালীতে বৃহৎ ইংরাজী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব রাখলেন।

অবশ্য তার আগেই নব্যবঙ্গের দীক্ষাগুরু হেয়ার সাহেব কোলকাতা শহরের সাধারণ হিন্দুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটা ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেছেন। স্কুল সোসাইটীর স্কুল। বর্তমানে যার নাম হেয়ার স্কুল।

হেয়ারই যে ছিলেন সেই স্কুলের প্রাণ।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য হেয়ারের স্বপ্ন সফল হল।

তাঁর প্রভাব' তাঁর ভাবনা-চিন্তারই অনুমোদন জানালেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার জন হাইড ঈষ্ট।

এর পেছনে তৎকালীন প্রধান ব্যক্তিদের চাপ কম ছিল না।

১৮১৬ সালের ১৪ই মে ঈষ্ট সাহেবের সে সভা বসেছিল, তাই প্রমাণ করে শাসকবর্গ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন করে নি—জনমতের চাপেই বাধ্য হয়েছিল।

হ্যাঁ, জনমতের চাপেই সেদিন বাধ্য হয়েছিলেন শাসক সম্প্রদায় ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন ঘটাতে।

হিন্দু কলেজ স্থাপিত হবে।

দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছ হতে চাঁদা আদায় করা হল।

প্রথম দফায় চাঁদা উঠল ১, ১৩,১৫৯ টাকা।

গরানহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে কুড়িজন ছাত্র নিয়ে খোলা হল হিন্দু বিদ্যালয়।

তারপর এ বিদ্যালয় উঠে এল জোড়াসাঁকোয়। সিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ি সেখান থেকে আবার টেরিটি বাজারে।

স্কুলের স্থানান্তরের আর যেন বিরাম নেই। অবশেষে ১৮১৭ খ্রীঃ থেকে ১৮২৪ খ্রীঃ পৌছাল তখন বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব লাভ সম্ভব হল। ১৮২৬ খ্রীঃ পর্যন্ত হিন্দু বিদ্যালয় নামে পরিচিত হলেও হিন্দু কলেজ নামেই পরিচিত হল এর পর হতে।

এ বিদ্যালয়ের পরিচালনা ব্যাপারে রামমোহনের হাত ছিল কম নয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এক লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করলেন শিক্ষা খাতে ব্যয় করার জন্য।

লর্ড আমহার্ষ্ট তখন গভর্ণর জেনারেল।

আমাদের ঘরশত্রু বিভীষণের দলেরও কমতি কোনদিনই ছিল না।

প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ ইংরেজ হোরেস হেম্যাক উইলসন রাধাকান্ত দেবের প্ররোচনায় ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন।

আর একবারও তিনি বিরোধিতা করেছিলেন রামমোহনের এই রাধাকান্তদেবেরই প্ররোচনায়—সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনের সময়।

কোলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হবে।

রামমোহন এ সংবাদ পেলেন।

এত টাকা শিক্ষা খাতে ব্যয় হয়ে অথচ তাঁর দেশবাসী পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক পাবে না। তা কি হয়?

চিন্তা করলেন তিনি।

আর তারপর স্থির করে নিলেন আপন কর্তব্য।

লিখলেন তিনি আমহার্ষ্টকে একখানা সুদীর্ঘ পত্র—ঐতিহাসিক পত্র।

ভারতে ইংরাজী শিক্ষা প্রচার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পত্রের মূল্য খুব কম নয়!

নির্ধারিত হল ভারতের শিক্ষানীতি!

সৃষ্টি হল যুগান্তরের।

যুগান্তর সৃষ্টিকারী রামমোহন তাই অমর।

রামমোহন চেয়েছিলেন সরকার যে টাকা ব্যয় করতে চায় সেই টাকাতেই একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হোক। পাশ্চাত্য প্রণালীতে গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন-শাস্ত্র, শারীরবিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞান শিক্ষার বাহন হবে এ কলেজ।

রামমোহন গভর্ণমেন্টকে চিঠি লিখলেন।

কিন্তু পরমুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ।

তাই হিন্দু কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ পূর্বেই তিনি একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। য়্যাংলো হিন্দু স্কুল।

চেদুয়ার কাছে শুঁড়ি পাড়ায় এ স্কুল বসল।

সেটা আঠারশ' ষোল খ্রীষ্টাব্দের কথা।

কিন্তু স্কুলের নিজস্ব বাড়ি চাই।

ছয় বছর কেটে যেতেই হেদুয়ার কাছে স্কুলের নিজস্ব ভবন তৈরী হল। রামমোহন নিজেই সেই স্কুলের বিপুল ব্যয়ভার বহন করলেন।

মিঃ মোরক্রফট এই স্কুলের অধ্যক্ষ।

ছাত্রদের এ স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হোত।

রামমোহনের এই নতুন স্কুলের ছাত্রসংখ্যা আশিতে গিয়ে পৌছাল। প্রিন্স দ্বারকানাথ পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে এই স্কুলে ভর্তি করে দিলেন।

রামমোহন এ কলেজের কার্যকরী সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য।

কিন্তু রামমোহন কার্যকরী সমিতিতে থাকুন সেকালীন প্রভাবশালী হিন্দুরা তা চাইলেন না। রামমোহনের বিরুদ্ধে অভিযোগ: রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধবাদী।

সভ্যপদ ত্যাগ করলেন রামমোহন।

কালের গর্ভে হারিয়ে গেল দুটি বৎসর।

এল আঠারশ' ছাব্বিশ।

বেদান্ত কলেজ স্থাপন করলেন রামমোহন।

ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন যিনি চেয়েছিলেন মনে প্রাণে তিনি হঠাৎ আবার বৈদান্তিক কলেজ স্থাপন করতে গেলেন কেন?

আসলে বেদান্ত তাঁর বিশ্বাস ছিল, শ্রদ্ধা ছিল, সেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছাত্রদের মধ্যেও জাগাতে চেয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু তিনি জানতেন ইতিহাসের সঙ্গে পা ফেলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষাবিস্তার করতে হলে ইংরাজী শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

স্কটল্যাণ্ড মিশনের জেনারেল এ্যাসেম্ব্লির পক্ষ হতে আলেকজাণ্ডার ডাফ কোলকাতায় এলেন।

রামমোহন আহ্বান জানিয়েছেন ডফেকে।

ডাফ এলেন। চাইলেন হিন্দু পাড়ায় মিশনারী স্কুল স্থাপন করতে।

ঠিক হল ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতে স্কুল বসবে।

রামমোহন নিজেই চেষ্টা করে পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের পরিবার হতে ছয় জন ছাত্র সংগ্রহ করে দিলেন।

বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হল১৮৩০ সালের ১৩ই জুলাই।

রামমোহন হাজির থাকলেন।

দিলেন পরামর্শ বিদ্যালয় পরিচালনা ব্যাপারে ডাফকে, উৎসাহ দিলেন ছাত্রদের।

কিন্তু আবার প্রশ্ন উঠল ছাত্রদের অভিভাবকগণের মধ্যে।

ডাফ বাইবেল বিতরণ করছেন ছাত্রদের মধ্যে।

ছাত্রেরা চঞ্চল, অভিভাবকগণ শঙ্কিত।

রামমোহন জানলেন বিষয়টি।

সরাসরি ছাত্রদের কাছে রামমোহন আপন বক্তব্য রাখলেন, ডাফ বাইবেল বিতরণ করেছেন তোমাদের মধ্যে। সুতরাং তোমরা চঞ্চল হয়ে উঠেছ। প্রশ্ন জেগেছে আজ তোমাদের মনে। কিন্তু বাইবেল পাঠেই কি মানুষ খ্রীষ্টান হয়? হয় না। যদি তাই হত তাহলে হিন্দু শাস্ত্রের পাঠক ডাক্তার উইলসন হিন্দু হলেন না কেন? আমি তো নিজে বহুবার কোরাণ পড়েছি, কিন্তু আমি কি মুসলমান? আমি বাইবেলও পড়েছি। হ্যাঁ অত্যন্ত যত্নের সঙ্গেই। কিন্তু কৈ আমি তো খ্রীষ্টান হইনি! এইতো আমার গলায় যজ্ঞোপবীত রয়েছে। তোমরা বাইবেল পড়, পড়ে নিজেরাই বিচার কর অন্য ধর্মের সঙ্গে তোমাদের পার্থক্য কি? তবেই তো ধর্মবোধ আরও গাঢ় হবে।

মিটে গেল সব গোল।

চলতে লাগল যথারীতি ডাফের স্কুল।

বহুদিনের সাধ রামমোহনের, তিনি ইয়ুরোপ যাবেন। ইংলণ্ড যাবেন।

কিন্তু কেন তাঁর এই ইচ্ছা? কি তাঁর এমন বিশেষ প্রয়োজন যে ইংলণ্ড যেতেই হবে?

না, ব্যক্তিগত প্রয়োজন নয়, দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থেই তিনি এ প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন।

আসলে রামমোহনের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র ছিল ইংলণ্ড——

ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট।

দেশে কোন দাবী উত্থাপন করে যখনই বাধা পেয়েছেন, যখনই তা নাকচ হয়ে গেছে তখনই তিনি দাবী করেছেন পার্লিয়ামেণ্টে।

হয়তো বা কখনও কখনও দাবী নাকচ হয়েছে কিন্তু দাবী গ্রাহ্যও তো হয়েছে।

তাই রামমোহন ভাবতেন য়ুরোপ যেতে পারলে দেশের জন্য তিনি নানাবিধ রাষ্ট্রীয় অধিকার ছিনিয়ে আনতে পারবেন।

অথচ তিমি তো জানতেন সেকালে সমুদ্রযাত্রা হিন্দুদের কাছে ধর্মপরিত্যাগেরই সামিল।

কিন্তু ঐ ভ্রান্ত কুসংস্কার আঁকড়ে পড়ে থাকবার জন্যই তো রামমোহনের জন্ম নয়! বাঁধন ছেঁড়ার সাধনার লিপ্তই তো তিনি হয়েছেন বারবার।

রামমোহন লিখেছেন:

"এই সময়ে য়ুরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য আচার-ব্যবহার, ধর্ম রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিবার জন্য স্বচক্ষে সকল দেখিতে বাসনা হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নতুন সনন্দের বিচার দ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী রাজ্যপাসন ও ভারতবাসিগণের প্রতি গভর্ণমেণ্টের ব্যবহার বহু বৎসরের জন্য স্থিরীকৃত হইবে ও সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কৌন্সিলে আপীল শোনা হইবে বলিয়া আমি ১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে ইংলণ্ড যাত্রা করিলাম।"

ইংলণ্ড যাত্রার পূর্বে রামমোহনের জীবনে ঘটেছিল একটা সুন্দর ঘটনা।

রামমোহন তাঁর জীবনের অর্জিত আধ্যাত্মিক সম্পদ দান করে গিয়েছিলেন একজন বালককে—দিয়েছিলেন তাঁর নব প্রতিষ্ঠিতব্রাহ্ম সমাজের উত্তরাধিকারিত্ব।

সে বালক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই পেয়েছিলেন রামমোহনের আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব।

হয়তো বা রামমোহন দেবেন্দ্রনাথকেই সবচেয়ে যোগ্য মনে করে থাকবেন।

আঠার শ' ত্রিশ সালের পনেরই নভেম্বর।

যাত্রা হল শুরু।

রামমোহন ইংলণ্ডে যাত্রা করলেন।

সঙ্গে পাচক রামরত্ন মুখোপাধ্যায় আর দুইজন ভৃত্য। রামহরি দাস ও

সেথ বকস্থ ।

দ্বাদশবর্ষীয় পালিত পুত্র রাজারাম রায়ও সঙ্গে আছেন, আছেন মাটিন সাহেবের স্ত্যাণ্ডফোর্ট আর্ণট। আর্ণট তখন রামমোহনের একান্তসচিব !

অলবিয়ন জাহাজ যথাসময়েই ইংলণ্ডে উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। এই জাহাজেরই যাত্রী রামমোহন।

পাশপোর্টও তাঁর কাছে।

তবে সেখানে নামের আগে আর একটা নতুন অলংকার জুড়ে দেওয়া হয়েছে। রাজা রামমোহন রায়।

যোগ্য উপাধি—যোগ্য সম্মান।

মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের রাজদূত আজ রামমোহন রায়।

সারাজীবন ধরে স্বজাতি ও স্বদেশের কাছ হতে যে লাঞ্ছনা ও যে নিন্দা পেয়েছেন সেই লাঞ্ছনা-বিষ তিনি নীলকণ্ঠের মত আকণ্ঠ পান করেছেন।

তিনি তো জানতেন সমাজ সংস্কারের সাগর মন্থনে এই লাঞ্ছনা-বিষ, এই নিন্দা-বিষ উত্থিত হবেই। কিন্তু তা আর কতদিনের জন্য। তারপরেই তো উঠে আসবে নয়া সমাজের অমৃত। সেই অমৃতই যে রামমোহনের একান্ত ভাবে আকাঙ্খার সামগ্রী।

এই নীলকণ্ঠ রামমোহন জীবন সন্ধ্যায় পৌঁছে পেলেন জীবন দেবতার অকৃপণ পুরস্কার।

দিল্লীর সিংহাসনচ্যুত ভূতপূর্ব মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ। রামমোহনকে ভূষিত করলেন রাজা উপাধিতে।

রামমোহন আজ ইংলণ্ড চলেছেন এই বাহাদুর শাহের প্রতিনিধি হয়ে বাহাদুর শাহ অর্পিত কাজটুকু শেষ করতে।

কিন্তু শুধু কি তাঁর এই জন্য বিদেশযাত্রা।

রামমোহনের এই যাত্রার পেছনে আরও উদ্দেশ্য ছিল।

তিনি চেয়েছিলেন ইউরোপের আচার ব্যবহার, ধর্ম তথা রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে ; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ ও নতুন শাসন সংস্কারের ফলে ইংলণ্ডে অবস্থান করে ভারতীয়দের জন্য কিছু বিশেষ সুবিধা আদায় করে নিতে, চেয়েছিলেন সতীদাহ নিবারণের আইনের বিরুদ্ধে ধর্মসভায় আপীলের ফলাফল জানতে, প্রয়োজন পড়লে ইংলণ্ড থেকেও আবার নতুন করে আন্দোলন শুরু করতে।

তাই ধর্ম সমাজ আর শিক্ষার সংস্কার করতে গিয়ে ভুলে বসলেন, তাঁরও একটা সংস্কার আছে। দেশ ও সমাজ যেমন রামমোনের কাছে দাবী করে তেমনি তাঁর সাস্কারেরও যে সমান একথা ভুলে গেলেন।

আর তাই এর অনিবার্য পরিণতি নেমে এল সংসারে।

সংসারে সব সুখ শান্তি হল বিনষ্ট।

বাংলার হিন্দু সমাজ আজ রামমোহনকে শত্রু ভাবে।

শত্রু ভাবে বিদেশী পাদ্রী সমাজও।

অর ঘর ?

না, ঘরেও শত্রু বিভীষণের দলের কমতি নেই বিন্দুমাত্র।

মা তারিণী দেবী তো স্বয়ং পুত্র রামমোহন জীবন দুষ্টগ্রহ।

ভাগ্যের কী নিদারুণ পরিহাস !

তা না হলে রামমোহনের ভ্রাতৃপুত্র গোবিন্দপ্রসাদকে সম্মুখে শিখণ্ডী দাঁড়করিয়ে মা তারিণী দেবী বিষয় সমরাঙ্গণে একটার পর একটা মোকদ্দমার বাণ ছুড়ে চলবেনই বা কেন।

রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ তখন বর্ধমান কালেক্টরীর সেরেস্তাদার।

একটা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পড়লেন রাধাপ্রসাদ।

কিন্তু কেন এই মিথ্যা মামলা রাধাপ্রসাদের বিরুদ্ধে !

সে কী পিতাকে শাস্তি দিতে না পেরে বা শায়েস্তা করতে না পেরে বা বণীভূত করতে না পেরে পুত্রের উপরে প্রতিশোধ নেওয়ার একটা চেষ্টা ছাড়া ভিন্ন কিছু !

আসলে তো রাধাপ্রসাদের বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছিল তা মিথ্যাই।

যদি তাই-ই হয় তাহলে রাধাপ্রসাদের বিরুদ্ধে যে মামলা তা রামমোহনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রপ্রসূত ছাড়া আর কি ?

পারিবারিক অশান্তি, বৈশয়িক অশান্তি অথচ নীলকণ্ঠ রামমোহন নির্বিকার এ সবে নেই তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ।

দেশের আর দেশবাসীর কল্যাণ কামনায় যিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছেন সাময়িক অশান্তি কি তাঁর মনের আসল শান্তি কখনও বিঘ্নিত করতে পারে ? বোধহয় পারে না। তা না হলে ওরা নীলকণ্ঠ হয় কি করে ?

অবশ্য একথাও ঠিক নয় রাধাপ্রসাদের জন্য তাঁর ভাবনা ছিল না। ভাবনা ছিল। আর ছিল বলেই পিতা রামমোহন পুত্র রাধা প্রসাদকে মামলার মিথ্যা ষড়যন্ত্র জাল হতে মুক্ত করার জন্য বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

অবশেষে এল সেই শুভদিন।

এল আঠার শ' ছাব্বিশ খ্রীষ্টাব্দ।

নিজামত আদালতের রায় বের হ'ল।

স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করেছে এই আদালত, রাধাপ্রসাদ নির্দোষ।

রামমোহনের জয় হ'ল।

রামমোহনের আর একটা মোকদ্দমায়ও জয় হয়েছিল।

এ মোকদ্দমা মাতা-পুত্রের।

মাতা তারিণী দেবী যে পুত্র রামমোহনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন, সেই মামলায় তারিণী দেবী হেরে গেলেন।

ভুল বুঝতে পারলেন তারিণী দেবী।

কিন্তু ভুল সংশোধনের সময় তিনি পেলেন না। সময় তখন ছিলও না।

সুতরাং অযথা দেশে পড়ে থেকে লাভ কি?

ভগ্ন স্বাস্থ্য তারিণী দেবী একাকী নিঃসম্বল অবস্থায় পুরী চলে এলেন। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো তিনি এখানে কাটিয়ে দিলেন।

আঠার শ' বাইশ খ্রীষ্টাব্দ।

মাতা তারিণী দেবীর মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছাল।

মানসিক যন্ত্রণা, আর্থিক অনটন—এই দুয়ের হাত হতেই তো রেহাই পেলেন তারিণী দেবী।

রামমোহন 'সম্বাদ কৌমুদীতে' মায়ের এই মৃত্যু সংবাদ ছাপিয়েছিলেন।

কিন্তু রামমোহনের সঙ্গে যেন দুর্দৈব ছাড়তে চায় না।

মাধ্যমা স্ত্রী শ্রীমতীর মৃত্যু হল।

রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদের বয়স তখন মাত্র পাঁচ।

রামমোহনের কাছে খবর এসে পৌঁছাল।

স্ত্রী অসুস্থ।

শ্রীমতী দেবীর পীড়া দুরারোগ্য।

রামমোহন চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

কিন্তু তিনি কি করে দেশ আর দেশের মানুষ নিয়ে গড়ে ওঠা বৃহৎ সংসার ফেলে ক্ষুদ্র সংসারের প্রয়োজনে ছুটে যাবেন সে সংসারে তিনি তাঁর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বিরাজমান ?

না, মন কেঁদেছিল ঠিকই। কিন্তু সম্মুখে সেই মুহূর্তে ভয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর কর্তব্য।

মন স্থির করে ফেললেন রামমোহন।

জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদকে পাঠিয়ে দিলেন কৃষ্ণনগরে।

শ্রীমতী দেবী তখন কৃষ্ণনগরই রয়েছেন।

যাওয়ার সময় পুত্রকে জানালেন রামমোহন তাঁর ইচ্ছা, তাঁর ভাবনা-চিন্তার কথা।

বললেন, মায়ের অসুখ বাড়াবাড়ি দেখলে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবে আমাকে। আর যদি দেখ তিনি মারা গেছেন তবে কোনক্রমে কোন প্ররোচনাতেই মায়ের মুখাগ্নি করবে না।

শাস্ত্রে বিশ্বাসী রামমোহন ব্রহ্মজ্ঞানী রামমোহন পুত্রকে অশাস্ত্রীয় কোন আচরণ করতে নিষেধই করেছিলেন।

শ্রীমতীর মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছাল।

রামমোহন শোকার্ত।

দাম্পত্য প্রণয়ের একটা অংশ নিঃশব্দে বিদায় নিল, এ শোক রামমোহনের বুকে বাজাবে বৈকি।

রাধাপ্রসাদের কাছে জানতে পারলেন কোন চিতায় রাধাপ্রসাদের জননী

রামমোহন তো আগে হতেই তাঁর আপন কর্তব্য নির্ধারণ করে এসেছেন।

তাই সহধর্মিণীর চিতার উপর দাম্পত্য প্রণয়ের চিহ্ন হিসেবেই একটা স্তম্ভ নির্মাণ করলেন।

শ্রীমতী দেবী রইলেন রামমোহনের স্মৃতিতে।

পনের বছর ধরে রামমোহন কোলকাতায় বিভিন্ন সংস্কার কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন।

এ ব্রত উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে রামমোহনের ছিল একান্ত একাগ্রচিত্ততা।

কিন্তু বাংলাদেশের রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায় ?

ওদের চোখে রামমোহনের সব আচরণই বাড়াবাড়ি।

ধর্ম নয়, অধর্মকে অবলম্বন করেছেন রামমোহন।

সুতরাং রামমোহনের উপর নেমে এল ওদের ঘৃণা, নেমে এল ওদের বিদ্বেষ আর ষড়যন্ত্র।

ক্রোধে সব সীমারেখা ছাপিয়ে গেল।

তাই বোধহয় তোমাদের রামমোহন হত্যার গুপ্ত ষড়যন্ত্রের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, রামমোহনকে একজন ইংরাজ দেহরক্ষী রাখতে হয়েছিল ?

হ্যাঁ, মিঃ মার্টিনের কথাই বলছি।

যিনি রাজার জীবন রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন যেমন, তেমনিই সেই দায়িত্ব পালন করবারও প্রাণপণ প্রশাস চালিয়েছিলেন।

তাই তো মাণিকতলার বাড়ি হতে সুদূর ইংলণ্ড পর্যন্ত সর্বদাই মিঃ মার্টিনের সঙ্গী হতে হয়েছিলো রামমোহনের।

রামমোহনের বাড়িতে বন্দুক ছোরা এসব অ'নল কে ? বাড়ি রক্ষার জন্য বরকন্দাজের ব্যবস্থাই বা করল কে ? সবই তো মিঃ মার্টিন করলেন।

একজন সমাজ সংস্কারদের যখন দু-দুবার জীবননাশের চেষ্টা করা হল তখন বাধ্য হয়েই তিনি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের নীলকণ্ঠকে বুকে নিয়ে রওনা দিল আলবিয়ান।

লক্ষ্য ইংলণ্ড।

রামমোহনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তাঁর খ্যাতি, তাঁর যশ, তাঁর কর্ম সাধনা।

যাত্রা পথে একটা ঘটনা ঘটল।

হঠাৎ রামমোহনের নজরে পড়ল একটা ফরাসী জাহাজ।

নিজের আবেগ সামলে রাখার ক্ষমতা হল না তাঁর।

জাহাজ থামাতে হুকুম দিলেন রামমোহন।

হাজির হলেন ফরাসী জাহাজে।

ফ্রান্সে বিপ্লবী ত্রিবর্ণ রন্জিত পতাকা উড়ছে জাহাজের মাথায় পত পত শব্দ তুলে।

রামমোহন সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানালেন পতাকাকে।

কেনই বা জানাবেন না। তিনি সারাজীবন ফরাসী বিপ্লব ভক্ত, ভলতেয়ার ভক্ত।

কিন্তু এ কী!

হঠাৎ এমন অশুভ ঘটনা ঘটল কেন?

রামমোহন যে হঠাৎ জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়লেন।

রামমোহন আঘাত পেয়েছেন পায়ে।

উৎসাহের আবেগে নিজের টাল সামলে রাখতে না পারায় এই বিপত্তি ঘটে গেল।

মুখে কিন্তু আঘাত পাওয়ার চিহ্ন নেই।

বরং হাসিমুখে ছুটে আসা সাহায্যকারীদের একজনের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

শারীরিক কষ্টের জন্যে ভ্রূক্ষেপ নেই রামমোহনের বিন্দুমাত্র।

তাই হয় তো পরবর্তীকালে একপ্রকার খনিজ হয়ে কাটাতে গিয়েও তাঁর মনে কোন বিকার আসে নি।

ধন্য স্বাধীনতার পূজারী রামমোহন!

প্রায় পাঁচ মাস কেটে গেল।

আলবিয়ান জাহাজ এসে পৌঁছাল তাঁর ঈপ্সিত বন্দরে। নোঙর করল জাহাজ।

রামমোহন পৌঁছালেন ইংলণ্ড।

রাজার জীবনের এবার আর একটা মোড়। আর একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

ভারতবাসীর পক্ষ হয়ে এবারে তিনি ইংরেজদের কাছে ভারতবাসীর কথা, ভারতবর্ষের কথা শোনাবেন।

তিনি যে সে কথা শোনাতে এসেছেন।

তিনি যে সাম্রাজ্যের রাজধানীতে এসেছেন ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করতে। হঠাৎ ইংলণ্ডে দিন যাপনের খেয়াল খুশী চরিতার্থ করতে তো তাঁর এ আসা নয়।

ইংলণ্ডে রাজনৈতিক জীবনের এক সন্ধিক্ষণে তিনি এসে হাজির হয়েছেন। পুরাতন ইংল্যাণ্ড বিদায় নিচ্ছে নতুনের আগমনে। সেই নতুন ইংলণ্ডে নয় ভারতের প্রতিনিধি এসেছেন। এ প্রতিনিধি রামমোহন।

আঠার'শ একত্রিশ সাল। ৮ই এপ্রিল।

জাহাজ এসে পৌছাল লিভারপুল বন্দরে।

রামমোহন নামলেন।

বন্দর ছেড়ে রওয়ানা দিলেন নগরের দিকে।

আশ্রয় নিলেন একটা হোটেলে।

লিভারপুলের সবাই অবাক' অবাক চমৎকৃত রামমোহনের মত একজন হিন্দুকে দেখে।

খ্রীষ্টান শাস্ত্রেই বা তাঁর কী অগাধ ব্যুত্তপত্তি, কী অগাধ পাণ্ডিত্য এ সবই তো রামমোহনের মধ্যে লক্ষ্য করলেন ওরা

আর ওদের ভাল লাগল রামমোহনকে।

সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক উইলিয়ম রাস্কোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল রামমোহনের।

বন্ধুত্ব অবশ্য পত্র মারফৎ অনেকদিন আগেই স্থাপিত হয়েছিল উভয়ের মধ্যে।

রাস্কো রামমোহনের গুণগ্রাহী।

রামমোহন রাস্কোকে জানালেন তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা।

উইলিয়ামের নাম যে পৃথিবীর সর্বত্র পরিচিত। সেই মহাপুরুষের খ্যাতি শুনেছেন এতকাল। আর আজ রামমোহন পেলেন তাঁর সাক্ষাৎ।

চোখে মুখে রামমোহনের সেই আন্তরিকতার প্রকাশ।

কিন্তু শেষ হল লিভারপুল বাস।

এপ্রিলের শেষেই রামমোহন রওনা হলেন লণ্ডন অভিমুখে।

পথে ম্যাঞ্চেষ্টার নগরে পৌছে তিনি কারখানা দেখতে গেলেন।

সেদিন ভারতীয় রাজাকে দেখার জন্য ম্যাজেষ্টারের পুরুষ নারী বালক শ্রমিক সবাই একযোগে বের হয়ে এসেছিল পথে।

কী জনস্রোত সেদিন ম্যাঞ্চেষ্টারে।

সবাই রাজার কাছে পৌছাতে চায়, করমর্দন করতে চায় রাজাকে, আলিঙ্গনে বাঁধতে চায় তাঁকে।

বাইরে এ বিপুল জনস্রোত রোধ করে সাধ্য কার ?

সেদিন শেষ পর্যন্ত জনস্রোত রোধ করতে সাহায্য নিতে হ'ল পুলিশের, রাজার কিন্তু সকলের কাছে এক প্রশ্ন : ,

সবাই রিফর্ম বিল সম্বন্ধে মন্ত্রীদলের পক্ষ সমর্থন করেছেন তো।

অবশেষে লণ্ডন পৌছালেন রামমোহন।

প্রথম আশ্রয় নিলেন হোটেলে।

তারপর হোটেল ছেড়ে একটা ঘর ভাড়া নিলেন রিজেণ্ট ষ্ট্রীটে।

এ তো শুধু রামমোহনের ভাড়া বাড়ি নয়।

সেদিন এই বাড়ি পেয়েছিল ভারতবাসীর দূত গৃহের মর্যদা, পেয়েছিল দরবার গৃহে সম্মান।

তিনি কি শুধুমাত্র মুঘল সম্রাটের দূত হয়েই এসেছেন?

তা কেন? তিনি যে সারা ভারতের সাংস্কৃতিক তথা রাষ্ট্রনৈতিক দূত হিসাবেই আজ এসেছেন! কোম্পানী হয়তো সে কথা স্বীকার করে নি?

কিন্তু ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট?

হ্যাঁ, পার্লিয়ামেণ্ট রামমোহনকে তেমন মর্যাদায় দিয়েছিলেন সেদিন।

ইংরাজ শাসিত তখন ভারত। ভারত তখন পরাধীন।

এই পরাধীন ভারতের একজন মানুষ কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী, সভ্যতা ও সম্পদের কেন্দ্রভূমি লণ্ডনে পেলেন সমাদার। ভারত সরকার রামমোহনের প্রাপ্ত রাজা উপাধীকে যেমন স্বীকার করেনি, তেমনি মেনে নেয় নি মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের প্রতিনিধি হিসেবে রামমোহনের ইংলণ্ড রওনা হয়ে যাওয়াটাকে।

ভারতস্থ ইংরাজ রাজকর্মচারী, কেন তোমাদের এত কুণ্ঠা?

শাসক হয়ে শাসিতকে কি করে মেনে নেবে? এই দ্বিধায় এ দ্বন্দ্বে বোধহয় তোমরা দোদুল্যমান ছিলে তাই না?

কিন্তু তোমরা যে কতবড় মুর্খের স্বর্গের বাসিন্দা তা বুঝতে পারলে খুব শীগ্‌গির তুল তোমাদের ভাঙল সেদিন, যেদিন দেখল ইংলণ্ডে সর্বত্র রামমোহন সমাদৃত অভিনন্দিত।

রাজা রামমোহন প্রকাশ্য ভোজসভায় আপ্যায়িত হলেন।

আঠার'শ একত্রিশ সালের ছয়ই জুলাই তারিখের কথা

ভোজসভায় আয়োজন করেছিলেন সেদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দই।

রামমোহন সভায় এলেন।

বিপুল অভিনন্দন আর অভ্যর্থনার উত্তরে রামমোহন জানালেন তাঁর মনের বিশেষ ইচ্ছার কথা!

অন্যান্য হিন্দুরা বিলেতের মাটিতে এসে পৌঁছাবে যেদিন আমি সেই দিনের অপেক্ষায় কাল গুনছি।

রিজেন্টষ্ট্রিটের বাড়ীতে রামমোহন খুব বেশীদিন রইলেন না।

বিলাসিতার গা ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য তো তাঁর ইংলণ্ডে আগমন নয়।

সুতরাং খরচবহুল এ বাসা পরিবর্তনের একটা সিদ্ধান্ত নিলেন সুযোগও এসে গেল।

বেড ফোর্ড স্কোয়ারে সাহেবের সহোদয় ভাইদের বাসায় চলে এলেন তিনি।

সুতরাং প্রাসাদোপম অট্টালিকায় জীবন যাপন পরিত্যাগ করে তিনি সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবন যাপন শুরু করলেন।

একটা ঘোড়ার গাড়ি রাখলেন। একজন কোচম্যান ও একজন সহিনকেও রাখতে হয়েছিল। তাদের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোশাকও দিয়েছিলেন।

রামমোহনের মধ্যবিত্ত জীবন যাপন শুরু হল। কিন্তু হলে কি হয়?

লণ্ডনের প্রথম শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই কিন্তু রামমোহনের সংসর্গ প্রার্থী।

ইংলণ্ডে এসেও কিন্তু রাজা একটা নতুন স্পন্দন তুললেন। এ স্পন্দন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যেমন অনুভূত হ'ল তেমনি অনুভূত হ'ল সামাজিক তথা রাজনৈতিক জীবনেও।

'এল্ডার য়্যাণ্ড কোম্পানী' এবং এ্যালেন্স য়্যাণ্ড কোম্পানী নামে দুটি প্রকাশক সংস্থা রামমোহনের দুটি পুস্তক প্রকাশ করলেন। অবশ্য আর কিছুদিন পরে রামমোহনের আর একখানি পুস্তক প্রকাশিত হল—

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাইয়ের কথা।

বিলেতে থাকাকালীন রামমোহনের এটা তৃতীয় বই।

সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় রামমোহন প্রমাণ ও প্রয়োগসহ ভারতে কোম্পানী শাসনের নমুনা তুলে ধরলেন।

টনক নড়ল সিলেক্ট সভাবৃন্দের।

কোম্পানীর সাশন সম্পর্কে তাঁদের যে প্রচলিত বিশ্বাস তার পরিবর্তন হল— আর এ পরিবর্তন সম্ভবপর হল রামমোহনেরই প্রচেষ্টায়।

রামমোহন সেদিন ঘোষণা করেছিলেন, প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারের বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার উপর আজ কোন আস্থা নেই। দায়িত্বপূর্ণ পদে যদি শিক্ষিত তথা বুদ্ধিমান ভারতবাসীকে নিয়োগ করা হয় তা হলে তিনি বিশ্বাস করেন

এমন একটা দিন আসবে, যেদিন অনায়াসেই দেশবাসীগণ অনুরক্ত হয়ে উঠবে সরকারের প্রতি।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হল ১৯৪৭-এর পনেরই আগষ্ট।

কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের একশত বৎসর পূর্বেই তো রামমোহন লণ্ডনে বসবাস করতে করতেই লিখেছিলেন, তাঁর স্বপ্নে কথা।

সেদিন লিপিবদ্ধ হয়েছিল রামমোহনের মনের বাসনা।

'ভারত স্বাধীন হইবে'।

ভারতের স্বাধীনতার সম্ভাবনা করেছিলেন রামমোহন।

আঠার শ' বত্রিশ সাল।

রামমোহন প্যারিস অভিমুখে যাত্রা করলেন।

রামমোহন সঙ্গি হবেন ডেভিস হেয়ারের এক ভাই।

বিপ্লবের পীঠস্থান ফরাসীদেশের পৌঁছেছে আর এক বিপ্লবীর কথা, আর এক বিপ্লবীর যশ, খ্যাতি।

আর এই ফরাসী দেশে যাবেন বলেই রামমোহন ফরাসীভাষা লিখলেন অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে, নিষ্ঠার সঙ্গে।

কিন্তু যখন দেখলেন পাসপোর্ট ছাড়া ফরাসী দেশে যাওয়া যাবে না তখনই তিনি আহত হলেন।

হ্যাঁ, রামমোহনের রাজনৈতিক চেতনায় আঘাত লাগল।

তবুও উপায় নেই।

ফারসী দেশে তাঁকে যেতেই হবে।

যেতেই হবে বিপ্লবের পীঠস্থানে।

সুতরাং বৈদেশিক মন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেছেন, উদ্দেশ্য পাসপোর্ট পাওয়া।

কিন্তু এ কোন্ চিঠি ?

এ কোন্ দূরদৃষ্টি ও অসমান্য প্রতিভার পরিচয় বহন করছে এ চিঠি পরিচয় সমগ্র চিঠি জুড়ে ?

তখন যে কোন মানুষের চিন্তায় ধরা পড়েনি জাতিসংঘ বা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের কথা।

অথচ রামমোহন তখনই নিরপেক্ষ সাধারন জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানলব্ধ

জ্ঞানের সাহায্য প্রমানিত যে মানুষ মাত্রেই একই পরিবারভুক্ত। এই তথ্যকে সম্মুখে রেখেই চেয়েছিলেন সকল দেশের শিক্ষিত মানুষ বিশ্বমানবের মিলনে ক্ষেত্রে যে অন্তরায় সৃষ্টি হবে তা বিদূরিত কারার চেষ্টা করবে।

ফরাসী দেশে আসবার অনুমতি পেয়েছিলেন রামমোহন।

পৌঁছেছিলেন প্যারিসে।

ফরাসী দেশের অধিবাসীরা রামমোহনকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক।

বিস্ময় বিমূঢ় ওরা রামমোহনের পাণ্ডিত্যে, রামমোহনের ব্যক্তিত্বে।

ওরা আজ অবাক মেনেছে রামমোহনের আর্যসৌষ্ঠব মণ্ডিত উন্নতশীর্ষ অথচ বলিষ্ঠ দেহ দেখে।

ফরাসী দেশের বিদগ্ধজন মনোনীত করলেন 'সোভিয়েতে এশিয়ালিকে' সভ্য একাধিকাবার রাজকীয় ভোজসভায় আমন্ত্রিত হলেন' রামমোহন।

এ ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন সম্রাট লুই ফিলিই।

দেখতে দেখতে কেটে গেল চারটি মাস।

এদেশে পণ্ডিত, সাহিত্যিক, কবি রাজনীতিবিদ সবাই রামমোহনকে জানালেন আদর অভর্থনা।

সবাই চান রামমোহনের সান্নিধ্য।

অবশেষে ফুরোল ফরাসী বাসের কাল।

ফিরে এলেন তিনি লণ্ডনে।

আবার কর্মযজ্ঞে আত্মসমর্পণ।

আবার কর্মযোগীর ব্রত উদ্যাপনে আত্মনিয়োগ।

আঠার শ' তেত্রিশের প্রথম ভাগেই রামমোহন ফিরে এসেছিলেন লণ্ডনে।

রামমোহনের সঙ্গে যীশীরই আলপ হয়েছিল।

আলাপ হয়েছিল সমাজতন্ত্রবাদের জনৈক রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে।

ওয়েন চেষ্টা চালালেন রামমোহন যেন সোস্যালিজমের প্রতি আকৃষ্ট হন।

ওয়েনের ধর্মাবিশ্বাসে অসদ্ভাবই ওয়েনের প্রচারিত সোস্যালিজম গ্রহণ করা রামমোহনের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু সমর্থন জানিয়েছিলেন কর্মসূচীকে।

রবার্ট ওয়েনের পুত্র রবার্ট ডেল ওয়েনকে লেখা চিঠিই তার প্রমাণ।

অবশ্য যে সমর্থন জানিয়েছেন তা নয় জানিয়েছেন কোথায় তাঁর মতদ্বৈধ সে কথাও।

ইংরাজীতেই লেখা চিঠি।

সে চিঠির ভাবানুবাদ :

৪৮, বেডফোর্ড স্কোয়ার,
এপ্রিল ১৯, ১৮৩৩

প্রিয় মহাশয়,

গতকাল আপনার ওখানে আপনার সঙ্গে আপনার কোন বন্ধুর সঙ্গে আমার দেখা হল না, গত মঙ্গলবার রাত্রে আপনি যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে লিখিত ভাবে আমি আমার বক্তব্য জানাচ্ছি। আমার বোধহয় আপনি সে বিষয়ে একমত হবেন।

ইংলণ্ড অথবা আমেরিকা অধিবাসীদের সামাজিক, পারিবারিক তথা রাজনৈতিক, কল্যান সাধনের জন্য ধর্মের, বিশেষতঃ সেই ধর্ম, যে ধর্ম, বিশ্বপ্রেম ও উদারতা শেখায়, বিরোধিতা করার প্রয়োজন নেই। লক বা নিউটনের মতো কল্যাণব্রতীরা কি কখনও ধর্মের বিরোধিতা করেছিলেন? না ধর্মে যখন ব্যাভিচার প্রবেশ করার পথ খুঁজছিল তখন সে ব্যাভিচার প্রবেশের পথ রুদ্ধ করেছিলেন তাঁরা। স্বীকার করে নিলাম ধর্মের আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ। স্বাধীন চিন্তাবিদের কাছে প্রামাণ্য করে তোলা যায় না তবু তো একথা সমান সত্য —প্রেম উদারতা সম্পন্ন ধর্মপদ্ধতি আমাদের সুখবৃদ্ধিতে, পারস্পরিক আদান প্রদানে, আশাহীন কামনা ও মনোবৃত্তি দমনে সক্ষম বলেই বিশ্বাসযোগ্য!

আমার দুঃখ এই আপনার উদার পিতা ধর্মবিরোধিতার দ্বারাই তাঁর আপন সাফল্যের অন্তরায় সৃষ্টি করে চলেছেন। আমি বিশ্বাস করি তিনি কিন্তু নিজের অজান্তে খ্রীষ্টধর্মের অনুগামী।

হ্যামিল্টনের লেখা 'ইষ্ট ইণ্ডিজ' গ্রন্থ আপনার কাছে পাঠাবার অনুমতি যদি আমাকে দেন তাহলে দেখতে পাবেন সেই গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠার ৩১ লাইনে আপনার পিতা বর্তমানে যে মতবাদ উপস্থিত করেছেন দু'হাজার বছর আগে ভারতীয় ব্রাহ্মণেরাও কিন্তু প্রায় অনুরূপ মত পোষণ করতে—কিন্তু ঐ মত কখনই ধর্মবর্জিত ছিল না।

আপনার ও আপনার পিতার কর্মসাফল্য আমি দেখতে চাই বলেই এমন সাহসী হলাম। যদি ধৃষ্টতা প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
রামমোহন রায়

পুনশ্চ : আমি ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভীষন কষ্ট পাচ্ছি। কয়েক মিনিট বসা বা কয়েক মাইল আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে।

ফ্রান্স হতে ফিরে এসে রামমোহনের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল পার্লিয়ামেণ্ট ভবনে নিয়মিত যাতায়াত।

রিফর্ম বিল আলোচনা কালে তিনি নিয়মিত হাজির থাকতেন সভাগৃহে।

এ বিলের জন্য তিনি উদ্বিগ্ন, তিনি চিন্তিত।

রিফর্ম বিল পাশ হয়ে গেলে শেষে তিনি ফলাফল জানার জন্য লণ্ডনে অপেক্ষা করবেন না একথা একেবারে নিশ্চিন্ত।

আঠার শ' তেত্রিশ সালের জুলাই মাস।

অগ্রাহ্য হল সতীদাহ নিবারন আইনের বিরুদ্ধে আপীল।

দিল্লীর বাদশাহের জন্য অতিরিক্ত বৃত্তির মঞ্জুরী হল।

এখন শুধু রামমোহনের অপেক্ষা রিফর্ম কি হয়।

তিনি যে শপথ নিয়েছেন বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট রিফর্ম বিল গৃহীত না হলে তিনি ইংলণ্ডের সঙ্গে আর কোন সংস্রব রাখবেন না।

অবশেষে এল আগষ্ট মাস।

রিফর্ম বিল পাশ হল।

কোম্পানী বাণিজ্য অপেক্ষা ভারত শাসনের দিকে বেশী করে মনোযোগ দিলেন।

ফুরোল রামমোহনের লণ্ডনের প্রবাস জীবন যাপন।

রামমোহনের তিন বছর ধরে বিলাত প্রবাসবাসের উৎকৃষ্ট পরিসমাপ্তি।

তাঁর জীবন নাটকের শেষ অঙ্কের প্রাণস্পর্শী দৃশ্য।

পাশ্চাত্যে হল নতুন বোধের উন্মেষ।

যে প্রাচ্য জানি তাদের শাসিত, পদানত, তারা যে মর্যদা, সভ্যতা তথা ধর্ম পরায়ণতার কত মহান রামমোহন যে তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

রামমোহন যেন ভারতের মূর্তি পরিগ্রহ করে অবস্থিত।

কী রাজ দরবার, কি পার্লিয়ামেণ্ট ভবন কী উপাসনা ভবন, কী দার্শনিক বা সাহিত্যক সমাজ, সম্ভ্রান্ত পরিবারই হোক আর ম্যাঞ্চেস্টারের শ্রমিক হোক সর্বত্র রামমোহনের প্রাচ্য সমাজ ও সভ্যতার ধারক ও বাহক।

স্বদেশে ইংলণ্ডের বার্তা প্রচার করেছেন যেমন রামমোহন তেমনি রামমোহন

ইংলণ্ডে ভারতের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার, প্রচার করার ব্রতই যে উদ্‌যাপন করলেন।

ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের বাইরে সমগ্র ইউরোপে, আমেরিকায় সমগ্র মানব জাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও লোকহিতকারী হিসাবে পরিচিত হলেন রামমোহন।

স্পেন, ইতালি, ফ্রান্স, আয়ারল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—যেখানে সংগ্রাম, যেখানে বিপ্লব সেখানেই ওঁরা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীকে—তিনি ভারতের রাজা রামমোহন রায়।

রামমোহন একদিনে ব্রিস্টলে আসার সুযোগ পেলেন।

অথচ অনেকদিন ধরেইতো তিনি এখানে আসার জন্য উদ্‌গ্রীব।

আর উদ্‌গ্রীব হবেই বা না কেন ?

এখানে যে তাঁর পালিত পুত্র রাজারাম রায় রয়েছেন।

রাজা রামমোহন ইংলণ্ডে পৌঁছে পুত্রের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ব্রিস্টলে রেখে গিয়েছিলেন।

আজ লণ্ডনের কাজ ফুরিয়েছে।

আজ অবসর পেয়েছেন তিনি।

সুতরাং আজ যেন একটু বিশ্রামের বড় প্রয়োজন।

আঠার বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন কর্মশেষে একটু বিশ্রাম, একটু শান্তি চান তিনি।

সুতরাং ব্রিস্টল অপেক্ষাকৃত শান্ত ও নির্জন।

রামমোহন ভেবেছিলেন হয়তো বা 'ষ্টেপলটন গ্রোভ' তাঁর জন্য নির্বাসিত ব্রিস্টলের বাসভবন তাঁকে শান্তি দেবে।

তাই ছুটে এলেন শান্তির আশায়।

শান্তি তিনি পেলেন।

কিন্তু এ কোন্ শান্তি তিনি নিজের জন্য সংগ্রহ করে নিলেন ?

আঠার শ' তেত্রিশ সালের সাতাশে সেপ্টেম্বর শুক্রবার।

ব্রিস্টলে রামমোহনের মৃত্যু হল।

চিকিৎসকরা ঘোষণা করলেন :

মানসিক দুশ্চিন্তাই রামমোহনের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল।

বাহাদুর শাহ একদিন রামমোহনকে দূত রূপে পাঠিয়ে যে পারিশ্রমিক দেওয়ার

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে প্রতিশ্রুতি তিনি রাখলেন না।

রামমোহন বঞ্চিত হলেন বাহাদুর শাহের দেওয়া আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি হতে।

আর তাঁর বন্ধু বর্গ।

যাঁদের দায়িত্ব দিয়ে এসেছিলেন রামমোহন নিয়মিত টাকা পাঠানোর জন্য, তাঁরা টাকা পাঠালেন না কেন।

তাঁরা ভুললেন কী করে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য? কী করে ভুললেন তাঁদের সুখ-সুবিধা আদায়ের জন্যই সহায় সম্বলহীন বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন রামমোহন?

হয়তো বা তাই নয়।

তাই রামমোহন অর্থের অনটন হেতু দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন।

রাত্রি দু'টো পঁচিশ মিনিট!

চলে গেল সেই মহান্ হিন্দুর মহৎ আত্মা।

চন্দ্রালোকিত সুন্দর রাত্রির শান্তি প্রহরে প্রতিভার একটি শিখা হঠাৎ নিভে গেল।

মহাপ্রাণের পথে যাত্রা করলেন রামমোহন।

বালক রাজারাম, রামহরি, রামরত্ন, কুমারী হেয়ার—সবাই নীরবে রামমোহনের মৃত্যু শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রত্যক্ষ করলেন ওঁরা—রাজার রাজার মত মৃত্যু!

লক্ষ্য করলেন: একজন বিশ্বজয়ী, তর্কযোদ্ধা, একজন স্বাধীনতার পূজারীর মৃত্যু।

লক্ষ্য করলেন: রামমোহন রায়ের মৃত্যু!

সমগ্র বিশ্বের মুক্তিদূত মারা গেলেন স্বদেশের মাটিতে নয়, দেশের মাটিতে।

হয়তো বা ভগবানেরই অভিপ্রেত।
